বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে অন্তরালের শেখ মুজিব

ডাঃ কালিদাস বৈদ্য

Bangaleer Muktiyuddhe
Antaraler Sheik Mujib

the Liberation war of the Bangalee)

By

Dr. Kalidas Baidya

প্রথম প্রকাশ ঃ কোলকাতা বইমেলা, ২০০৫

প্রকাশক ঃ শ্রী শঙ্কর কর্মকার,
কর্মকার বুক স্টল, ১০৪ রামলাল বাজার,
কোলকাতা - ৭০০ ০৭৮

প্রচ্ছদ ঃ লেখক

প্রাপ্তিস্থান ঃ ১. প্রকাশকের কাছে
২. ফোন নং — ২৪১৫ ৬৫৭০
১৫৯ গরফা মেন রোড,
রামলাল বাজার, কোল - ৭৫

মুদ্রাকর ঃ এ.বি.এ টেক্‌নোলজিস
১১৬/১ রামকৃষ্ণনগর, কোল-৬৩

ফোন ঃ ৯৪৩৩১-৫৮৬৫৩/৯৪৩৩২-০৯৩১৯

উৎসর্গ

আমার

স্বর্গীয় পিতা রাজেন্দ্রনাথ বৈদ্য

ও

স্বর্গীয়া মাতা গুণময়ী বৈদ্যের

পবিত্র স্মৃতিতে

ভূমিকা

কেউ কেউ থাকেন যাঁরা ইতিহাসের মোড় ফেরানোর কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, কিন্তু নিজেরা প্রচারের আলোয় আসেন না। কালিদাস বৈদ্য তেমন একজন ব্যক্তি, যিনি পাকিস্তানের কবল থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার সংগ্রামে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন, মুজিবর রহমানের ঘনিষ্ঠ জন হিসাবে দুরূহ দায়িত্ব বহন করেছেন, ইতিহাসের পালা বদলকে ভিতর থেকে দেখেছেন।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম নিয়ে ঢাকায় যেসব গ্রন্থ রচিত হয়েছে তাতে কালিদাস বৈদ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই বইয়ে তিনি তাঁর নিজের কথা যতটা লিখেছেন তার চেয়ে বেশি পাকিস্তানকে ভেঙে দেওয়ার পরিকল্পনা কীভাবে করা হয়েছিল, দীর্ঘমেয়াদী উদ্যোগ কীভাবে নেওয়া হয়েছিল, শেখ মুজিবর রহমান ঠিক কী চেয়েছিলেন, কোন পথে কীভাবে এগিয়েছিলেন সে সবের অন্তরঙ্গ বিবরণ দিয়েছেন। ওইসব ঘটনার প্রতিটি পর্বের সঙ্গে কালিদাসবাবু জড়িত ছিলেন।

দেশ ভাগের সময় কালিদাস ছিলেন ছাত্র, অন্যদের সঙ্গে কোলকাতায় চলেও এসেছিলেন। কিন্তু ১৯৫০ সালেই তিনি ফিরে গিয়েছিলেন ঢাকায়, পাকিস্তানকে ভেঙে দেওয়ার ব্রত নিয়ে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে তিনি এম.বি.বি.এস. পাশ করেন, ঢাকাতেই ডাক্তারি প্র্যাকটিস শুরু করে ভালো পসার জমিয়ে ফেলেন। কিন্তু তিনি মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র থাকার সময় ছাত্র রাজনীতি সংগঠিত করতে শুরু করেছিলেন, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। মুজিবর রহমানের সঙ্গে তাঁর পরিচয় গড়ে ওঠে তখন থেকেই।

কালিদাসবাবু এই বইয়ে সেইসব কথা লিখেছেন যা বাইরে থেকে কারও পক্ষে জানা সম্ভব নয়। ইতিহাসের গতির সেই বিবরণ তিনি তুলে ধরেছেন যা আগে প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু এই বইয়ে শুধু ইতিহাসের কথাই নেই। আছে মুক্তিযুদ্ধের আগের ও পরের এমন সব কথা যা আমাদের যত্নলালিত ধারণাগুলিকে তীব্রভাবে নাড়া দেবে। যেমন, মুজিবর রহমানের প্রকৃত মনোভাব, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। বাংলাদেশে ইসলামিক সাম্প্রদায়িকতার নিবিড় পরিচয় এই বই থেকে পাওয়া যাবে।

কালিদাসবাবু তাঁর ছাত্রজীবনে গৃহীত সংকল্প ও সংগ্রামের পথ থেকে আজও সরে আসেননি। বাংলাদেশ গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে তা তিনি মনে করেন না। বার্ধক্য ও ভগ্ন স্বাস্থ্য সত্ত্বেও সংকল্প সাধনে তাঁর পরিশ্রমের শেষ নেই। সব যুদ্ধেই হারজিত আছে। বর্তমান বিরুদ্ধ পরিবেশেও জয়ের স্বপ্ন নিয়ে তিনি কাজ করে চলেছেন।

পবিত্রকুমার ঘোষ
সাংবাদিক ও উপদেষ্টা, দৈনিক বর্তমান

লেখকের কথা

নিজচোখে দেখা, নিজকানে শোনা, আর অন্যের লেখা পড়ে ও বিজ্ঞজনদের কথা শুনে আমার মনে যে বিশ্বাস বা মানসিকতা গড়ে ওঠে তার ভিত্তিতে কাজ করার অভিজ্ঞতায় বইখানি লিখেছি। লিখতে গিয়ে দেখতে পাই — রাজশক্তির নিজস্বার্থে তৈরি আইনের বাধা, অন্য দিকে ব্যক্তি মানুষের প্রবর্তিত ধর্মমতের শানিত খড়্গ। তাদেখে লেখকের নির্ভীক কলম থামতে পারে না। সেই নির্ভীক কলম ভয় ভীতি, লাভ ক্ষতি, মান অপমান উপেক্ষা করেই চলবে। তার কাছে ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা সবাই সমান।

পাকিস্তানে হিন্দুদের উপরে চরম অত্যাচার ও নির্যাতন দেখে সেই পাকিস্তান ভেঙ্গে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে স্বাধীন পূর্ব বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখি, সে ভাবে পরিকল্পনাও নেই। আমরা বুঝেছিলাম, বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গ স্বাধীন হলে, সেখানে ইস্‌লামিক জাতীয়তাবাদ থাকবে না। হিন্দু মুসলিম সম-অধিকার নিয়ে সেখানে সবাই বাস করতে পারবে। যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তান ভাগ হলেও বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলা স্বাধীন হলো না। জন্ম নিল তথাকথিত ইসলামবাদী বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা না করে মুজিবের স্বেচ্ছায় গ্রেফতার বরণ ও যুদ্ধকালে বাংলাদেশ সরকার সহ নেতাদের আচরণ দেখে, আমরা বুঝেছিলাম, আমাদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ। তাই যুদ্ধ শেষ হবার আগেই আমরা চোদ্দো জন হিন্দু নেতা একত্রে বসে নতুন করে স্বাধীনতা সংগ্রামের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। পরে Law Continuation order of 1971 জারি করে মুজিব বুঝিয়ে দিলেন যে, তার সরকার পাকিস্তানের Successor সরকার। তাতে সেখানে ইস্‌লামিক জাতীয়তাবাদ স্বীকৃতি পেল। মুছে গেল বাঙালির মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাস।

ধর্ম ও ধর্মমত এক নয়। একজন বিশেষ ব্যক্তির ধর্মীয় মতকে আমরা একটি বিশেষ ধর্মমত বলে জানি। খৃষ্ট, ইস্‌লাম, বৌদ্ধ, শিখ, কম্যুনিষ্ট সহ অনেক ধর্মমত আছে। ইস্‌লামের ধর্মগ্রন্থ কোরাণে আমরা দেখতে পাই ".... অংশীবাদীদের যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদের বন্দী করবে। অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামাজ কায়েম করে, যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ মুক্ত করে দেবে" (৯/৫) — - "তাদের গ্রেপ্তার করবে, যেখানে পাও হত্যা কর, এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব কর না - (৪/৮৯) - - " তাদের সাথে অবিরাম যুদ্ধ কর যতক্ষণ না আল্লার রাজত্ব কায়েম হয় (৮/৩৯)

- - - তাদের গর্দানে আঘাত কর (৪৭/৪)" - - - তাদের হাত, পা কেটে ফেল, শূল বিদ্ধ কর ও হত্যা কর" ইত্যাদি। ভিন্নধর্মী বা অমুসলমানদের খতম করতে আল্লা নিজেই এরূপ অনেক নির্মম আদেশ দিয়েছেন। আমরা দেখতে পাই ৯/৫ নং আয়াতে সন্ত্রাসবাদের নির্দেশ আছে। সেই সন্ত্রাসবাদ আজ আত্মঘাতী সন্ত্রাসবাদের রূপ নিয়েছে। তার ভয়ে আজ বিশ্ব কাঁপছে। এই সন্ত্রাসবাদ সহ আত্মঘাতী সন্ত্রাসবাদের মূল উৎস ধ্বংস করতে যুদ্ধও শুরু হয়েছে। এ যুদ্ধের পরিণতি হবে ভয়াবহ। যুদ্ধের পরেই বোঝা যাবে ধর্ম ও ধর্মমতের তফাৎ।

কোরাণে লিখিত আল্লার আদেশ তামিলের বাস্তব রূপ হিন্দুরা '৭১ সালের মুক্তি যুদ্ধ কালে দেখেছে। তারা দেখেছে প্রায় ত্রিশ লক্ষ নিরীহ হিন্দুকে হত্যা, তাদের বাড়ি-ঘর লুণ্ঠনের পরে তা জ্বালিয়ে দেওয়া, নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ, ধর্মান্তরকরণ, ১ কোটি হিন্দুর ভারতে আশ্রয় গ্রহণ এবং বাংলাদেশ হওয়ার পরে ধর্ম রক্ষার্থে ও প্রাণের ভয়ে প্রায় ২ কোটি হিন্দুর আবার ভারতে আগমন। এই ভাবেই হজরত মুহাম্মদ আরবকে অমুস্লিম শূন্য করেছিলেন। এখনো সেখানে কোন অমুস্লিম নাগরিক হতে পারে না।

এসব করুণ কাহিনী দেখে শুনেও ভারত বা বাংলাদেশের লেখক বা ঐতিহাসিকদের পক্ষে প্রকৃত ইতিহাস লেখা সম্ভব হচ্ছে না। কর্ম জীবনে আমি একজন ব্যতিক্রমী মানুষ, কাজেই আমার লেখা এই বইটি ও ব্যতিক্রম হওয়া স্বাভাবিক। এখানে আমার সামনে আছে আইনের রক্ত চক্ষু আর বাংলাদেশে আছে ধর্মমতের নির্মম শানিত খড়্গ। ইঙ্গিতে লিখেই রুশ্দির জীবন নিয়ে টানাটানি, তস্লিমার নির্বাসন, আর জীবন দিতে হয়েছে আজাদ হুমায়ুন কবিরের।

অতীতে ৪/৫ বার সমূহ মৃত্যুর হাত থেকে দৈববলে বেঁচেছি। শেষ পর্যন্ত মাতৃভূমি ত্যাগ করে ভিখারির বেশে ভারতে আশ্রয় নিয়েছি। এখানে এসে প্রতিকূল পরিবেশেও কাজ করছি। সব কিছু উপেক্ষা করে জীবনের এই বার্দ্ধক্যে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই বইখানা লেখা। বর্তমান পবিত্র (সরকার) যুগের পাঠকবৃন্দ কিভাবে এর মূল্যায়ন করবেন তা আমার অজানা। তবে নির্ভীক লেখক ও ঐতিহাসিকদের উপরে বইটির বিচারের দায়িত্বভার ছেড়ে দিতেছি।

ধর্ম সম্বন্ধে আমার জ্ঞান সীমিত। তবে ধর্মমতের বাস্তব রূপ দেখেছি এবং অপরের কাছে শুনেছি। যার ভিত্তিতে একটি বইতে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আমি দিয়েছি। আরও একটি বইতে মুজিবের মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনা সহ আমার কার্যাবলীও সংক্ষেপে লিখেছি। সে দু' খানা বই শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

দৈনিক বর্তমান পত্রিকার উপদেষ্টা শ্রী পবিত্রকুমার ঘোষ বইটি লিখতে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেন। পরে ভূমিকাও তিনি লিখে দিয়েছেন। সত্যানন্দ দেবায়তনের অধ্যক্ষা শ্রীশ্রী অর্চনাপুরী মা ও মতুয়া ধর্মমতের প্রধান শ্রীশ্রী বীনাপানি মাতা (বড়মা) উভয়েই আশীর্বাদ সহ প্রেরণা দিয়েছেন। তাঁদের সবাইকে জানাচ্ছি আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা। বইয়ের প্রথম ৮০ পৃষ্ঠা এডিট করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রী দিলীপ সরকার প্রুফ দেখে সাহায্য করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আরও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার সহধর্মিণী শ্রীমতি হাসিরানী বৈদ্যকে। তাঁর ত্যাগ, ধৈর্য, সহনশীলতার গুণে, অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আমার ছন্নছাড়া জীবনের বাঁধন হারা অনটনের সংসারটির হাল ধরে ঠিক পথে চালিয়ে নিচ্ছেন। তাঁর সহযোগিতা না পেলে গোপনে ও খোলা ভাবে আমি ঝুঁকিময় কাজ চালাতে পারতাম না। ফলে এ বই লেখাও সম্ভব হতো না। তার কাছে আমি চির ঋণী।

ডাঃ কালিদাস বৈদ্য

সূচীপত্র

পশ্চাৎপট

ভারতের পূর্ব-দক্ষিণ সীমান্তে নদী বিধৌত বাংলার এককালের শস্য ভাণ্ডার বরিশাল জেলা। তার উত্তর পশ্চিমের শেষ প্রান্তে আমাদের ছোট্ট গ্রাম সামন্তগাতি। গ্রামের পূব পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে মধুমতী নদী (আমাদের এলাকায় বলেশ্বর নামে খ্যাত)। এই গ্রামের একটি মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে আমি জন্মেছিলাম ১৯২৮ সালের ১লা মার্চ। বাবা রাজেন্দ্রনাথ বৈদ্য। মা গুণময়ী বৈদ্য।

কৃষিপ্রধান, স্ব-নির্ভর অনুন্নত গ্রাম। শিক্ষার আলো সেখানে প্রবেশ করেনি। আমার ছোট কাকা হরিদাস বৈদ্য গ্রামের প্রথম ম্যাট্রিকুলেট। তিনি চাকরি করতে চলে গিয়েছিলেন কলকাতায়। গোটা অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা ছিল প্রায় সমান সমান। কিন্তু সামন্তগাতি গ্রামের সকলেই ছিল হিন্দু এবং এই হিন্দুদের সকলেই ছিল নমঃ সমাজের অন্তর্গত। ব্যবসার খাতিরে হাটে বাজারে বাস করত কিছু সাহা পরিবার। পাশের উমাজুড়ি ও কুমারখালি গ্রামে উন্নত ও বর্ধিষ্ণু হিন্দুদের বসতি ছিল। কিন্তু তাদের বেশির ভাগই বাস করত শহরে, চাকুরে বা পেশাজীবী হয়ে। একমাত্র দুর্গাপূজার ছুটিতেই তারা বাড়ি ফিরত।

পূর্ব বাংলায় নমঃ সমাজের অধ্যুষিত দুটো অঞ্চল ছিল — উত্তর অঞ্চল ও দক্ষিণ অঞ্চল। ফরিদপুর, খুলনা, যশোহর ও বরিশাল জেলা নিয়ে ছিল দক্ষিণ অঞ্চল। আর ঢাকা জেলাকে কেন্দ্র করে ছিল উত্তর অঞ্চল। ঢাকা শহরকে বাদ দিলে এই উত্তর অঞ্চল পূর্বদিকে ত্রিপুরা থেকে নোয়াখালি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পশ্চিম দিকে তা ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল হয়ে যমুনা নদী পেরিয়ে পাবনা ও রাজশাহী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

দক্ষিণ অঞ্চলে নমঃ সমাজের কেন্দ্রবিন্দু ছিল বরিশাল, ফরিদপুর, যশোহর ও খুলনা জেলার মিলন স্থানটি। গোপালগঞ্জকে কেন্দ্র করে তারই আশপাশ এলাকা নিয়ে জায়গাটি। এই কেন্দ্রবিন্দু ঘেঁষেই আমাদের সামন্তগাতি গ্রাম — দশমহল পরগণার অন্তর্গত। ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার দক্ষিণ পাশে যার অবস্থিতি। বরিশাল জেলার উত্তর-পশ্চিম ও খুলনা জেলার পূর্বের কিছু অঞ্চল নিয়ে বিস্তৃত নমঃ অধ্যুষিত বৃহত্তর দশমহল পরগণার প্রায় কেন্দ্রস্থলে এই গ্রাম সামন্তগাতি। বৃহত্তর দশমহল তখন ছিল বলবীর্যে হিন্দুদের শক্তিশালী এলাকা।

উত্তর অঞ্চলে ঢাকা শহরের চারদিকেই নমঃ সমাজের লোকেরা বসবাস করত। তাই উত্তর অঞ্চলে এই সমাজের মূল ঘাঁটি ছিল ঢাকা জেলার গ্রাম অঞ্চল। বাংলার কোনও শহরেই নমঃ সমাজের তেমন বসবাস ছিল না, কারণ তারা ছিল

প্রধানত কৃষিজীবী ও গ্রামীন কাজকর্মে অভ্যস্ত ও নিযুক্ত।

নমঃ সমাজ ছিল স্বাধীনচিত্ত, বীর, সাহসী ও শক্তিবাদে বিশ্বাসী। পূর্ব বাংলার গ্রামগুলিতে হিন্দু ও মুসলমানরা পাশাপাশি শান্তিতে বাস করত কিন্তু বাংলার প্রধানমন্ত্রী (তখন মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী বলা হত) মুসলিম হওয়ার পর প্রায়ই তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধত। হিন্দু ধর্ম বা হিন্দু সমাজের উপর সামান্যতম আক্রমন হলেই নমঃ সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধভাবে, বীরদর্পে অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ত। সে যুগে তারাই ছিল পূর্ববঙ্গে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতি রক্ষার এক মাত্র সদাজাগ্রত প্রহরী। পশ্চিম বাংলার গোয়ালা ও মাহিষ্য সমাজের মতোই। পূর্ব বাংলার নমঃ সমাজের সর্দাররা হিন্দু ধর্ম ও বর্ধিষ্ণু হিন্দুদের রক্ষা করত। মুসলিম আক্রমণ প্রতিহত করতে তারা ছিল সর্বদাই প্রস্তুত। যুদ্ধে পিছু হটবার শিক্ষা তাদের ছিল না। নমঃ সম্প্রদায় হিন্দু সমাজেরই অনুন্নত অংশ। কিন্তু গোটা পূর্ব বাংলায় তাদের উপরেই ন্যস্ত ছিল হিন্দুদের রক্ষা করার দায়িত্ব। সামাজিক কর্তব্য মনে করে স্বেচ্ছায় এই দায়িত্ব পালন করাই ছিল তাদের জন্মগত ঐতিহ্য ও শিক্ষা। এখানে উল্লেখ করা দরকার, অনুন্নত হলেও নমঃদের ১১ দিন অশৌচের পর শ্রাদ্ধ শান্তি হয়। ব্রাহ্মণদের মতো গয়া গিয়ে ভাত পিণ্ড দেয়। যা বৈদ্য, কায়স্থ সহ অন্যান্যদের নাই। অন্যান্যরা বালির বা ছাতুর পিণ্ড দেয়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য—প্রখ্যাত বৃটিশ ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিদ জন হান্টার নমঃ সম্প্রদায়কে মার্শাল কম্যুনিটি অব বেঙ্গল (বাংলার যোদ্ধার শ্রেণী) বলে আখ্যা দেন। গরীব ও অনুন্নত হলেও তিনি তাদের শৌর্য বীর্য দেখে এ প্রসংশা করেছিলেন।

হিন্দু সমাজের অনুন্নত ও আধা-উন্নত সম্প্রদায়ের লোকেরাও গ্রামাঞ্চলে বসবাস করত, যেমন দেবনাথ, হাঁড়িগড়া পাল, গোয়ালা ঘোষ, কাপালি, পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়, ধোপা, জেলে নাপিত, বারুজীবী, সাহা ইত্যাদি। তারা সংখ্যায় ছিল কম, তা ছাড়া একত্রে এক জায়গায় বাসও করত না। সেই কারণে তাদের মনোবল ও শক্তি ছিল অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু আপদকালে তারা সাধ্যমতো নমঃ সমাজের পাশে এসে দাঁড়াত। জাতপাত বিচার অবশ্যই ছিল। কিন্তু সবাই বাঁধা ছিল এক হিন্দুত্বের বন্ধনে।

মধুমতী নদীটি আমাদের অঞ্চলে বলেশ্বর নাম নিয়ে বরিশাল ও খুলনা জেলার সীমান্ত দিয়ে বয়ে যেত। তার পূর্বপার বরিশাল আর পশ্চিমপার খুলনা। নদীটি গতিপথ পরিবর্ত্তনের ফলে আমাদের গ্রামের পূর্ব পাশ দিয়ে বইতে থাকে। তাতে আমাদের গ্রামটি নদীটির পশ্চিমপারে থেকেও বরিশাল জেলায় পড়ে। পশ্চিম পাশের মূল নদীটী মরে যায়। ফলে বিশাল এক চর জেগেছিল। আমাদের সামন্তগাতি

গ্রামের লোকেরাই তার চার ভাগের তিন ভাগ জমি দখল করে নিয়েছিল। পাশের খুলনা জেলার একটা ইউনিয়নের সব মানুষের মিলিত শক্তিতে বিরোধিতা করা সত্ত্বেও আমাদের গ্রামের লোকেদের চর থেকে হটানো সম্ভব হয়নি। আমাদের পাশের গ্রামটির নাম চর-ডাকাতিয়া বা ডাকাতের চর। কিন্তু সামন্তগাতির বাসিন্দাদের হাতে মারধর খেয়ে শেষপর্যন্ত ডাকাতরা তাদের পেশা ছাড়তে বাধ্য হয়। এই কারণেই আমাদের গ্রামের নাম হয়েছিল সামন্তগাতি। বর্ষাকালে গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া মধুমতী নদী ফুলে ফেঁপে উঠত এবং ভয়ঙ্কর রূপ নিত। সে সময় অপর পারে জমি ভাঙত আর আমাদের পারে জেগে উঠত চর। সেই অন্য পারে ছিল মুসলমানদের বাস, সংগঠিত নমঃ সমাজ এতই শক্তিশালী ছিল যে, নদীর কোলে জমি হারালেও মুসলমানরা এ পারে এসে তাদের জমির চর দখল করার সাহস দেখাত না, এমনকি পাকিস্তান আমলেও না।

স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির দুই তিন বছর আগেকার কথা বলছি। একদিন সামন্তগাতির সব পুরুষ দুই মাইল দূরে কবিগান শুনতে গিয়েছিল। সুযোগ বুঝে ওপারের মুসলমানরা দল বেঁধে দশ পনেরোটি নৌকা নিয়ে আমাদের দিকের চর দখল করতে এল। গ্রামের মেয়েরা অন্য উপায় না দেখে নিজেরাই ঢাল সড়কি হাতে নিয়ে নদীর পারে গিয়ে যুদ্ধে নামল, ভয় পেয়ে মুসলমানরা চম্পট দিল। তবে বাংলাদেশ হবার পর কিছু হিন্দু বিশ্বাসঘাতকের সাহায্যে ও ভীষণ সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে সরকারি শান্তিরক্ষা বাহিনীর প্রচ্ছন্ন মদতে মুসলমানরা ওই চর দখল করে নেয়।

গ্রামে খেলাধুলো, নাচ গান, আনন্দ উৎসব সবই হত। তবে সব থেকে জনপ্রিয় ছিল হাঁড়ির উপর থালা রেখে তা বাজিয়ে ঢাল, সড়কি ও লাঠির খেলা। এই খেলাটি ছিল আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার অঙ্গ। হা-ডু-ডু, দড়িয়াবান্দা, ফুটবল খেলা, ঘোড় দৌড়, ষাড়ের লড়াই ও নৌকার বাইচ হোতো। পূজা পার্বণ ও নবান্ন সহ নানা উৎসবে আনন্দের বন্যা বয়ে যেত। এছাড়াও ছিল মতুয়াদের মহোৎসব, যাত্রাগান, কবিগান, জারিগান, গাজীর গান, নাম কীর্তন, হরিকীর্তন, রয়ানি গান, পদাবলী কীর্তন, ত্রিনাথের মেলা, পুতুল নাচ ও অনেকরকমের গানের আসর বসত। এই সব উৎসব ও গানের আসরে হিন্দু ও মুসলমান সবাই যোগ দিত। কবি গানের কবিয়ালরা ছিল হিন্দু এবং জারিগানের জারিদাররা ছিল মুসলমান।

কবিগান ও জারিগানের আসরে নানা বিষয়ের উপর তর্ক যুদ্ধের সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানদের সম্পর্কেও তর্কযুদ্ধ চলত। কালী ও আলির শক্তি, কৃষ্ণ ও আল্লার

দোষগুণ, হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক, হিন্দু দেব-দেবী, রাজনীতি, সমাজ ইত্যাদি নিয়ে তর্ক যুদ্ধ হত। এক পক্ষ অন্য পক্ষকে ঘায়েল করার চেষ্টা করত। কাব্যরস পরিবেশনের সঙ্গে অরুচিকর আলোচনাও চলত। কিন্তু কাব্যরসে তা শ্রুতিমধুর হতো। তাই উভয় সম্প্রদায় তা উপভোগ করত। কবিয়াল রাজেন সরকার হয়ত কৃষ্ণের পক্ষ নিয়ে হজরৎ মহম্মদকে দস্যু সর্দার, কামুক ও পুত্রবধূ প্রেমিক বলে আক্রমণ করে গেলেন। জবাব দিতে দাঁড়িয়ে নকুল দত্ত হয়ত কৃষ্ণকে লম্পট, চরিত্রহীন ও মামীর প্রেমিক বলে গাল দিলেন। হিন্দু মুসলমান এক সঙ্গে বসে এই সব শুনত। প্রতিবাদ করত না। উপভোগ করত। একদিন এক আসরে কবিয়াল রাজেন সরকার বললেন যে, মুসলমানরা জুতোয় সোজা। সেই আসরে আমিও উপস্থিত ছিলাম। কবিয়ালের যুক্তি ছিল হিন্দুরা যা করে মুসলমানরা করে ঠিক তার উল্টো। কিন্তু জুতোর বেলায় তারা হিন্দুদের মতোই ডান পায়ের জুতো ডান পায়ে ও বাঁ পায়ের জুতো বাঁ পায়েই পরে। তাই জুতোর বেলায় তারা উল্টো নয়, সোজা।

মুসলমানরা ছিল হিন্দুদের সঙ্গে সংখ্যায় সমান সমান। কিন্তু আর্থিক সচ্ছলতা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার দিক দিয়ে নমঃ সমাজের তুলনায় তারা ছিল অনেক পিছিয়ে। এই কারণে তারা নমঃ সমাজকে যথেষ্ট সমীহ করে চলত। এই অঞ্চলের হাট বাজার গড়ে উঠেছিল মূলত নমঃ সমাজের প্রচেষ্টায়, তাদেরই এলাকায়, তাই মাতব্বরি সর্দারি তারাই করত। তাদের হাতেই ছিল গ্রামের বিচার ব্যবস্থা। তারাই ছিল মাতব্বর। পরে যখন ইউনিয়ন বোর্ড এল তখন অধিকাংশ বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নমঃগণই হত।

হিন্দু সমাজের নমঃগণ ছিল অনুন্নত ও শিক্ষায় অনগ্রসর। তা সত্ত্বেও তাদের একক প্রচেষ্টায় দেশ ভাগের আগে অনেক হাইস্কুল ও কলেজ গড়ে উঠেছিল। যেমন বরিশালের মালিখালি, আওড়াবুনিয়া, দীঘিরজান, দীর্ঘা, কুড়িয়ানা, বাটনাতলা, শ্রীরামকাঠি, গোবর্ধন, গিলাতলা, মাদ্রা-ঝালকাঠি ও পূর্ব জলাবাড়ি। ফরিদপুরে ওড়াকান্দি, বোলতলি, সাতপার, সিংগা জলির পার, কদমবাড়ি, কৃষ্ণনগর, রামশীল, ছিলনা, বহুগ্রাম, রামদিয়া ও রঘুনাথপুর। খুলনায় চর বানিয়ারি, দত্তডাঙ্গা, চিতলমারী, খালিশপুর, মাদারতলি, আঁধারমানিক, সাচিয়াদহ, কোলাপাটগাতি। সেই সঙ্গে সুন্দরপুর, বোয়ালিয়া, রংপুর, হুকড়া, বাজুয়া, টাটিবুনিয়া, গিলাতলা, কালেখাঁর বেড়, লক্ষীকাটি। যশোরে মসিয়াহাটি, জয়রাবাদ, পাঁচকাটিয়া- সাতকাটিয়া ইত্যাদি। এ সব জায়গায় গড়ে উঠেছিল হাইস্কুল। ফরিদপুরের গ্রামে হয়েছিল রামদিয়া কলেজ। কিন্তু মুসলমানদের প্রচেষ্টায় কোথাও আমাদের গ্রাম অঞ্চলে কোনো স্কুল কলেজ হয়নি।

শেখ মুজিবের গ্রাম ও তার আশপাশের পাঁচিশ ত্রিশটি গ্রাম ছিল মুসলিম অধ্যুষিত। সেই বিস্তৃত অঞ্চলে কোন হাইস্কুল ছিল না। পাকিস্তান হবার বহু বছর পর একটি মাত্র হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শেখ মুজিবের গ্রামে। তখন মুসলমানদের আর্থিক অবস্থাও ছিল অত্যন্ত করুণ।

মধুমতী নদীর পুবপাড়ে ছয় সাতটি গ্রামে ছিল একচেটিয়া মুসলমানদের বাস। ভোরে পান্তা খেয়ে মুসলমানরা আমাদের এলাকায় হিন্দুর জমিতে কিষাণ খাটতে আসত। তাদের বেশির ভাগেরই নিজস্ব কোনো জমিজমা ছিল না। সারাদিন হিন্দু পাড়ায় কিষাণ খেটে সন্ধ্যায় তারা বাড়ি ফিরে যেত। সে সময় একটাকায় পাওয়া যেত আটটি কিষাণ, তিন পয়সায় পাওয়া যেত এক সের চাল। এখানে পয়সা বলতে পুরনো পয়সা। চৌষট্টি পয়সায় এক টাকা হত। এক সের চাল, এক সের ডাল, এক সের দুধ ও চারটি ডিমের দাম সমান ছিল। পাঁচ পয়সায় পাওয়া যেত আড়াই সের নুন। এক সের চিনির দাম ছিল তিন আনা (ষোল আনায় এক টাকা)। এক বোতল কেরোসিনের দাম ছিল ছয় পয়সা। দশ বারো আনায় পাওয়া যেত এক খানা মাঝারি মিহি ধুতি বা শাড়ি। তিন পয়সায় পাওয়া যেত একখানা পোষ্টকার্ড ও চার পয়সায় একখানা খাম।

জিনিসপত্রের দাম এত কম থাকা সত্ত্বেও কষ্টের মধ্যেই সাধারণ মানুষের সংসারযাত্রা চলত। তবে এত অভাব অনটন থাকলেও চুরি ডাকাতি তেমন হত না। গ্রামে মামলা মোকদ্দমা ছিল না। সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার তারতম্য থাকলেও হিন্দু ও মুসলমান মোটামুটি শান্তিতেই বসবাস করত। তখন সামাজিক বন্ধন ও শাসন ছিল দৃঢ়।

তবে যে সব অঞ্চলে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য ছিল সেখানে তারা মাঝে মাঝে উগ্রভাব দেখাত। কিন্তু চতুর্দিকে হিন্দু সর্দারদের ভয়ে তা বাড়াবাড়ি রূপ নিত না। হিন্দুরা ঠাট্টা করে ঐ উগ্রতাকে 'পিয়াজি রাগ' বলত। নমঃ সমাজের মধ্যে কৌতুক প্রচলিত ছিল — 'মিঞাসাবকে বল ভাই, হাতে একখান লাঠি চাই'। অর্থাৎ একখানা লাঠি দেখলেই মিঞাসাবের রাগ ঠাণ্ডা হয়ে যেত। সে সময় হিন্দু সর্দাররা হাতে একখানা লাঠি নিয়ে চলাফেরা করত। নমঃদের শক্তি বেশি ছিল, তাই রাগ হলে মুসলমানরা তাদের বলত 'চাড়াল'। নমঃরা পাল্টা মুসলমানদের বলত 'নেড়ে'। তবে নমঃদের যে সহনশীলতা ছিল, মুসলমানদের তা ছিল না।

আমাদের প্রথম জীবনে দেখেছি, এক দুই জন হিন্দুর সামনে দশ বারো জন মুসলমানও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারত না। ফজলুল হক বাংলার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার

পর থেকেই পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করে। প্রধানমন্ত্রী হয়ে হক সাহেব প্রকাশ্যে হিন্দুদের বিরুদ্ধে কিছু বললেন না বটে, কিন্তু গ্রামে গ্রামে গিয়ে মুসলমানদের নিয়ে আলাদাভাবে বৈঠক করে তাদের নব জাগরণের ডাক দিলেন। নিজে তাদের সামনে হাজির হয়ে, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে এক হুকায় তামাক খেয়ে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, যেহেতু তিনি প্রধানমন্ত্রী ও ইংরাজশক্তির পার্শ্বচর, তাই গোটা মুসলিম সমাজই রাজার পার্শ্বচরে পরিণত হয়েছে। মুসলমানরাও দেখল যে তাদের ভালোমন্দ দেখতে রাজশক্তি তাদের পাশে আছে।

মুসলিম জাগরণের পরিকল্পনা নিয়েই ফজলুল হক সরকারি টাকায় শুধু মুসলমান ছাত্রছাত্রীদের জন্য কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজ (বর্তমান মৌলানা আজাদ কলেজ), লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজ, বেকার হোস্টেল, কারমাইকেল হোস্টেল, সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল হাইস্কুল, কলকাতা মাদ্রাসা, ঢাকায় ফজলুল হক হল, বরিশালের চাখারে ফজলুল হক কলেজ সহ অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন।

হক সাহেব পিরোজপুরে একটা পাকা মুসলিম হোস্টেল করে দিলেন। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে গড়ে দিলেন শত শত মক্তব ও মাদ্রাসা এবং আরও গড়ার পরিকল্পনা নিলেন। চিতলমারিতে ছিল হক সাহেবের জমিদারি। তিনি বছরে অন্তত একবার সেখানে যেতেন। আমাদের গ্রাম থেকে চিতলমারি মাত্র দু মাইলের পথ। হক সাহেবের পৈত্রিক বাড়ি আমার বাড়ি থেকে পনের ষোলো মাইল। তাঁর কাজকর্মের যে সব কথা শুনেছি ও নিজের চোখে দেখেছি তার ভিত্তিতেই উপরের কথাগুলো লিখলাম।

হিন্দু প্রধান মালিখালি গ্রামে ১৯২২ সালে একটি হাইস্কুল স্থাপিত হয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পেয়ে প্রতি বছরই সেখান থেকে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্ররা ম্যাট্রিক পাশ করে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ লাভ করত। আমাদের অঞ্চলে স্কুলটির খুব সুনাম ছিল। হক সাহেব প্রধানমন্ত্রী হবার পর কিছুদিনের মধ্যেই মালিখালি স্কুলের আধামাইল দূরে মুসলিম এলাকা বাখাজোড়ায় রাতারাতি একটা স্কুল বাড়ি তৈরি করলেন। ওই বাড়ি নির্মাণের সব টাকা হক সাহেব সরকারি তহবিল থেকেই জোগাড় করলেন। স্কুলটির নাম হল জুবলী হাইস্কুল। স্কুল বাড়ি তৈরি হলে হক সাহেব সঙ্গে সঙ্গে তা দেখতে যান। পরের দিন কলকাতায় ফিরেই মালিখালি স্কুলের অনুমোদন কেটে জুবিলী হাইস্কুলকে অনুমোদন দেবার জন্য তিনি নিজেই শিক্ষামন্ত্রীরূপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে সুপারিশ করলেন। কিন্তু মালিখালি স্কুলের পরিচালকবৃন্দসহ সকল এলাকাবাসী প্রতিবাদে সোচ্চার হলে শ্যামাপ্রসাদ

মুখোপাধ্যায়ের তৎপরতায় হক সাহেবের অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। জুবিলী স্কুল আর হতে পারেনি। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, ফজলুল হক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজগুলো এবং মক্তব, মাদ্রাসা ও ছাত্রাবাসগুলো এক একটি ইসলামী শিক্ষা ও প্রচারকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। পরবর্তী কালে প্রাক পাকিস্তানী আন্দোলনে ওইগুলো হয়ে উঠেছিল ধর্মান্ধ পাকিস্তানপন্থী মুসলমান মৌলবাদীদের দুর্গ।

ফজলুল হকের প্রধান মন্ত্রিত্বকালে ব্রিটিশ রাজের ইঙ্গিতে ঋণ-সালিশ বোর্ড গঠনের আইন পাশ হয়েছিল। এই আইনবলে লক্ষ লক্ষ মুসলমান বিনা খেসারতে তাদের বন্ধকী জমি নিজেদের হাতে ফেরৎ পায়। অনুন্নত হিন্দুরাও তাতে উপকৃত হয়। তা ছাড়া মুসলিম যুবকরা সরকারি চাকরি পেতে শুরু করে। এ সবের ফলে মুসলিম জাগরণ বাস্তবায়িত হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক এবং তার সরকারের অন্যান্য মন্ত্রীদের সঙ্গে চলাফেরা করার সুযোগ পেয়ে মুসলমান যুবকদের মনোবল প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেল। তারা হাওয়া পাল্টাবার ডাক দেবার সাহস পেয়ে গেল। হক সাহেবের নিজের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে ইসলামী প্রচারও জোর কদমে চলছিল। তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলেই মুসলমানরা এমন ভাব দেখাতে লাগল যে, তারা দেশের রাজা বাদশা। তারা ভাবতে শুরু করল, শীঘ্রই তারা আবার রাজা হতে চলেছে। তাদের সেরকম কথাই বোঝানো হতে লাগল।

প্রথম জীবনে আমি দেখেছি, আমাদের অঞ্চলে প্রায় সব শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মুসলমানরা ধুতি পরত। আমাদের সঙ্গে যে সব মুসলমান ছাত্ররা পড়াশুনা করত তাদের বেশির ভাগই ধুতি পরত। মুসলমানরা ধুতি পরেই হিন্দু পাড়ায় আসত। হাটে বাজারেও তারা ধুতি পরেই যেত। এমন কি যুদ্ধের সময় কন্ট্রোলের ধুতির পারমিটের জন্য তাদের মধ্যে মারামারি লেগে যেত। সে সময় মুসলমানদের নামের শেষে হিন্দু পদবীও থাকত। যেমন, বিশ্বাস, সরকার, হালদার, বেপারি, মিস্ত্রি, নন্দ, মুখার্জি, মাঝি ইত্যাদি। এ সবই ফজলুল হকের সময় থেকে বদলে যেতে শুরু করেছিল। মুসলমানরা ধুতি পরা ছাড়ল। হিন্দু পদবী নেওয়া বাদ দিল। পাকিস্তান হবার পর এই প্রক্রিয়া পূর্ণতা লাভ করল।

ছাত্র জীবনে দেখেছি, শিক্ষিত মুসলমানরা ধুতি পরে হিন্দু পাড়ায় এসে খেলাধুলা করত, আড্ডা জমাত। তারা হিন্দু বাড়িতে ভাতও খেত, কিন্তু হিন্দুরা তাদের হাতে রান্না খেত না। সেজন্য মুসলমানরা কিছু মনেও করত না। বর্ধিষ্ণু হিন্দুরাও অনুন্নত হিন্দুদের রান্না খেত না। তাদের হাতের জলও তারা খেত না।

ব্রাহ্মণরা কায়স্থদের বাড়িতে জল গ্রহণ করত না। ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা অবশ্য অনুন্নত হিন্দুদের বাড়িতে, পুজো ইত্যাদি করাত, কিন্তু রান্না খেত না। প্রয়োজনে তারা নিজের হাতে রান্না করে খেত। এজন্য কেউ কিছু মনেও করত না।

ফজলুল হক ছিলেন সুচতুর মৌলবাদী মুসলমান। বাইরে তিনি হিন্দু বিরোধী কোনো কথা বলতেন না। তেমন কোনো কাজও করতেন না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনি ইসলামিক জাগরণের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। মহম্মদ আলি জিন্না ছিলেন ফজলুল হকের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী। জিন্নার সঙ্গে ছিল তার ব্যক্তিত্বের লড়াই, কিন্তু ইসলামিক জাগরণের ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনো মতভেদ ছিল না। শোনা যায় তিনি গান্ধীকেও মুসলমান হওয়ার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তবে হক সাহেবের প্রধানমন্ত্রিত্ব ছিল হিন্দুদের সমর্থনের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। তা সত্ত্বেও জিন্নাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবার জন্য মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে হক সাহেব লাহোর (পাকিস্তান) প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। এভাবে তিনি মুসলমানদের কাছে প্রমাণ দিয়েছিলেন যে, ইসলামি চিন্তাধারায় জিন্নার চাইতে কোনো অংশেই তিনি কম নন। এসব সত্ত্বেও হিন্দু সমাজের কাছে তিনি ছিলেন দেবতুল্য মানুষ।

শেষ পর্যন্ত ইংরাজ সরকারের ইচ্ছায় এবং যোগেন মন্ডল সহ কয়েকজন তফসিলি নেতার সমর্থনে ফজলুল হক সরকারের পতন হয়েছিল। '৪২ সালে বাংলায় গঠিত হয়েছিল নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলিম লিগ সরকার। তখন থেকেই বংলার সর্বত্র খোলাখুলিভাবে শুরু হয়েছিল হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ। গ্রামে গ্রামে নমঃ অঞ্চলেও সেই ঢেউ পৌছে গেল। মাঝে মাঝে আক্রমণ চলতে থাকল হিন্দুদের উপর। নমঃরাও প্রতি-আক্রমণ চালিয়ে তার কঠোর জবাব দিতে লাগল। এ ভাবেই বরিশালের কদমবাড়িতে, খুলনার গজালিয়া, বিলডাকাতিয়া, গঙ্গাচন্না, কলাতলা ও বড়বাড়িয়াতে, ফরিদপুরের বাসুড়িয়া, বাসবাড়িয়া, যশোরের খামার ইত্যাদি জায়গায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ (কাজিয়া) হল। তখন ব্রিটিশ শাসন। তাই মুসলিম লিগ সরকার খোলাখুলিভাবে মুসলমানদের সাহায্য করতে পারেনি। তা ছাড়া সব থানাতেই হিন্দু পুলিশের সংখ্যা ছিল বেশি।

হক সাহেবের মন্ত্রিত্বের শেষ দিকে গ্রামের প্রাথমিক স্কুলের পড়া শেষ করে পাঁচ মাইল দূরের চরবড়বাড়িয়া এম. ই. স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলাম। তখন ১৯৪১ সাল। এক আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে পড়াশুনা শুরু করি। কিন্তু দুই মাস পড়ার পর গঙ্গাচন্না ও কলাতলার কাজিয়ায় চার পাঁচ জন মুসলমান মারা গেল। তারপর শান্তিও ফিরল। কিন্তু আমার ঠাকুরমা বেঁকে বসায় চরবড়বাড়িয়ায়

আমি আর পড়তে পারিনি। পরের বছর হিন্দু ও মুসলমানদের যৌথ প্রচেষ্টায় গড়া বরইবুনিয়া এম. ই. স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হলাম। ওই ষষ্ঠ শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি পেলাম। বৃত্তি পেয়ে পিরোজপুর সরকারি হাইস্কুলে ১৯৪৩ সালে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হলাম।

গ্রাম্য জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, হিন্দু ও মুসলমান যুগ যুগ ধরে শান্তিতে একসঙ্গে বাস করলেও মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে কাজিয়া বাধত। তা শুরু হয়েছিল ত্রিশের দশকের শেষের দিকে। তখনও সে কাজিয়া সীমাবদ্ধ থাকত একটি গ্রামের মধ্যে ও মাত্র একদিন সময়ের মধ্যে। হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ গণ্ডগোল দ্রুত মিটিয়ে ফেলতেন। তবে লক্ষ্য করার বিষয় হল, প্রথম আক্রমণ আসত মুসলমানদের পক্ষ থেকে। কিন্তু হিন্দুরা রুখে দাঁড়িয়ে পাল্টা আক্রমণ করলে মুসলমানরা কাজিয়া থামাতে বাধ্য হত। এ আমি প্রতি ক্ষেত্রেই দেখেছি বা শুনেছি।

পাকিস্তানের স্লোগান

আমার শহর জীবন শুরু হয়েছিল পিরোজপুরের ডাক্তার জিতেন সেনের বাড়িতে থেকে। সরকারি হাই স্কুলের হোস্টেলে সীট খালি ছিল না। তাই ডাঃ সেনের বাড়িতে ছিলাম। সেখানে থেকেই পড়াশুনা শুরু করেছিলাম। এক বছর পর হোস্টেলে সীট পেয়ে সেখানে চলে গেলাম। সরকারি হোস্টেল হলেও তা ছিল গোলপাতার ঘর। কিন্তু পাশেই ছিল মুসলমান ছাত্রদের জন্য পাকা হোস্টেল বাড়ি। সেটা করে দিয়েছিলেন ফজলুল হক।

মুসলমান ছাত্ররা মনে করত তারা উচ্চস্তরের জীব। তারা রাজার জাত। এক দিন তিনটি ছাত্র টিনের চোঙা ফুঁকে রাস্তায় রাস্তায় ঘোষণা করল যে, মুসলীম লিগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাসিম পাকিস্তানের দাবিতে সভা করবেন। ওই সভায় দলে দলে যোগ দিতে মুসলমানদের ডাক দেওয়া হচ্ছে।

আমরা তিনজন হিন্দু ছাত্র সেই সভায় গেলাম। অন্ধ আবুল হাসিম ছিলেন বাংলার মুসলিম লিগের সাধারণ সম্পাদক। তবু তাঁর সভায় লোক আসেনি। মাত্র অল্প কয়েকজন শ্রোতার সামনে হাসিম সাহেব দেড় ঘণ্টা বক্তৃতা করলেন। তাঁর মূলকথা ছিল, হিন্দু ও মুসলমান দুটি আলাদা জাতি। একসঙ্গে বাস করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বর্তমান ইংরাজ রাজত্বে তারা একত্রে থাকতে বাধ্য হচ্ছে বটে, তবে ইংরাজ চলে গেলে তারা আর এক সঙ্গে থাকবে না। মুসলমানরা যাতে

স্বাধীনভাবে বাস করতে পারে সেজন্য বাংলা, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, সিন্ধু ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে আলাদা মুসলিম রাষ্ট্র গড়তে হবে। পাকিস্তান হবে সেই স্বাধীন রাষ্ট্র। সেই পাকিস্তান আদায়ের জন্য লড়াইয়ের ডাক দিতেই হাসিম সাহেবের এখানে আসা।

পিরোজপুরের হিন্দুরা ঠাট্টা তামাশা করতে শুরু করল। তারা হেসে হেসে বলতে লাগল মিঞারা একটা ফাঁকিস্তান করবে। ফাঁকিস্তান কি গাছের ফল যে চাইলেই পাওয়া যাবে? সে সময় পিরোজপুরের সত্তর শতাংশ মানুষ ছিল হিন্দু, তাই হিন্দুদের ভয় পাবার কিছু ছিল না। সেই দিনই আমি পাকিস্তান প্রসঙ্গে বক্তব্য প্রথম শুনেছিলাম। সারা বাংলার মুসলিম লিগ নেতার মুখ থেকে তার ব্যাখ্যা শোনারও সৌভাগ্য হল।

এর কয়েক দিন পরে দেখি আট দশ জন মুসলিম যুবক বুশ শার্ট, প্যান্ট পরে রাস্তা দিয়ে 'নারা এ তকবির' 'আল্লা হো আকবর' স্লোগান দিতে দিতে মার্চ করে গেল। পরে জানতে পারলাম যে ঐ যুবকরা ছিল মুসলিম লিগের ন্যাশনাল গার্ডের কর্মী। এর পর থেকে শহরের পথে পথে ন্যাশনাল গার্ডের মিছিল প্রায়ই বেরোত। তাদের সদস্য ও সমর্থকের সংখ্যাও বাড়তে লাগল। মুসলিম লিগ তাদের পোষাক ইত্যাদি দিত। আমার একজন মুসলমান ছাত্র বন্ধু বলল, ইস্পাহানি কোম্পানী সব পোষাক দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে।

পিরোজপুরে ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ সালের মার্চ পর্যন্ত পড়াশুনা করেছি। শহরটি হিন্দুপ্রধান হলেও সেখানে কোনোদিন কংগ্রেস বা হিন্দু মহাসভার সভা হতে দেখিনি। পথসভা, জনসভা কিছুই না। তবে ১৯৪২ সালে গান্ধীজি ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দিলে শত শত ছাত্র ও যুবক বিভিন্ন জায়গায় টেলিগ্রাফের তার কেটেছিল, মিছিলও বের করেছিল। তার ফলে তারা দলে দলে জেলেও গিয়েছিল। আমি পিরোজপুরে গিয়ে দেখেছি তখন অনেক ছাত্র জেলে রয়েছে।

১৯৪৪ সালে গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি এসেছি। কলকাতা থেকে ছোট কাকাও এসেছেন। তিনি ফি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসে বাড়ির আম, জাম, কাঁঠাল, তরমুজ ইত্যাদি খেতে বাড়ি আসতেন। গ্রামের লোকেরা, বিশেষত যুবক সম্প্রদায় কাকাকে ভালোবাসত। তাঁর কথা সবাই মানত। বাড়ি এসে শুনলাম শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর আশীর্বাদে ফরিদপুর জেলায় নমঃ অঞ্চলের রামদিয়া গ্রামে সমাজ সেবক পি. আর. ঠাকুর, চন্দ্রকান্ত বোস এবং রমেন মল্লিকের প্রচেষ্টায় একটি কলেজ হয়েছে। তেমনই একটি কলেজ স্থাপন করতে শ্যামাপ্রসাদ আমাদের বাড়ির কাছে নড়া গ্রামে আসবেন।

তাঁর সঙ্গে আসবেন বর্ধমানের মহারাজ উদয়চাঁদ মহতাব। শুনলাম লড়া গ্রামে কলেজ করতে সাহায্য করছেন হিন্দু মহাসভার জেনারেল সেক্রেটারি এন. সি. চ্যাটার্জী এবং খুলনার জমিদার শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় সহ আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

কলেজ করার জন্য সব থেকে বেশি টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বর্ধমানের মহারাজ উদয়চাঁদ মহতাব। তাই গ্রামের লোকেরা আনন্দে নিজেদের গ্রামের নাম পাল্টে উদয়নগর রাখল। এলাকার সব গ্রামে সাড়া পড়ে গেল। শ্যামাপ্রসাদের সভায় যাবার জন্য গ্রামে গ্রামে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল।

এরই মধ্যে খবর এল যে, শ্যামাপ্রসাদের সভার তিন দিন আগে মন্ত্রী যোগেন মণ্ডল মাটিভাঙায় সভা করবেন। সেইদিন যোগেনবাবুর সভায় যাবার জন্য নদীর পারে দল বেঁধে খেয়া ঘাটে উপস্থিত হলাম। এমন সময় চর ডাকাতিয়া থেকে একজন লোক দৌড়ে এসে খবর দিল যে, মুসলমানরা বড়বাড়িয়া হিন্দুপাড়া আক্রমণ করেছে। সেখানে কাজিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে।

খবর শোনা মাত্র সবাই চিৎকার করে উঠল — আজ আর সভা নয়, চল ঢাল সড়কি নিয়ে রণক্ষেত্রে। সবাই যে যার বাড়ির দিকে ছুটল। দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে সবাই ঢাল সড়কি হাতে নিয়ে গ্রামের পশ্চিম পাশের মাঠে জড়ো হলো। অন্য সব বাড়ির মতো আমাদের বাড়িরও ছোট বড় সবাই ঢাল সড়কি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। এভাবে রণযাত্রায় যাওয়া ছিল নমঃ সমাজের রেওয়াজ। কলকাতার চাকুরে ছোট কাকাও হাতে ঢাল সড়কি নিয়েছেন। আমরা ছোটরা দলবেঁধে তাঁর পিছনে চললাম।

মাঠে পৌঁছে দেখি চারদিক থেকে শত শত মানুষ হাতে ঢাল, সড়কি, উড়া, চ্যাঙ্গা, গুলতিবাঁশ নিয়ে বড়বাড়িয়ার কাজিয়া স্থানের দিকে ছুটে চলেছে। তরমুজ খেতের উপর দিয়ে ছুটছি। সামনের লোকেরা রাম দা দিয়ে তরমুজ ফালি ফালি করে কাটতে কাটতে যাচ্ছিল। আমরা দৌড়ে গিয়ে তা তুলে নিয়ে তেষ্টা মেটাচ্ছিলাম। কাজিয়া হচ্ছিল আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে। কিন্তু মাইল চারেক যেতেই দেখলাম, অস্ত্র হাতে নিয়েই শত শত লোক ফিরে আসছে। তাদের কাছ থেকে শুনলাম, প্রথম আক্রমণ মুসলমানরাই করেছিল। কিন্তু হিন্দুরা পাল্টা আক্রমণ করে বড়বাড়িয়ার মুসলমান পাড়া জ্বালিয়ে দিয়েছে। অন্তত পাঁচ ছয় জন মুসলমান খুন হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছে। তাই অস্ত্র হাতে সেখানে গেলে পুলিশ ধরবে।

এই কথা শুনে আমরা বাড়ি ফিরলাম। এই কাজিয়ার জন্য যোগেন মণ্ডলের সভা আর সেদিন হতে পারল না কিন্তু মুসলিম লিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। চক্রান্ত মাফিকই কাজ হয়েছিল। শ্যামাপ্রসাদের সভা যাতে না হতে পারে সেজন্য যেমন তিনদিন আগে যোগেনবাবুর সভা ডাকা হয়েছিল, তেমনি সামান্য অজুহাতে কাজিয়াও বাধানো হয়েছিল। উত্তেজনা সৃষ্টি করে সেই সুযোগে ১৪৪ ধারা জারি করা হল। ফলে শ্যামাপ্রসাদের সভা বানচাল হয়ে গেল।

কিন্তু নির্দিষ্ট দিন যথাসময়ে দুটি বড় লঞ্চে করে শ্যামাপ্রসাদ, এন. সি. চ্যাটার্জী, উদয়চাঁদ মহতাব, শৈলেন ঘোষ সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এলেন। তাঁরা এসে শুনলেন, এক গ্রামে কাজিয়া হওয়ায় আশেপাশে সব গ্রামে ১৪৪ ধারা জারি হয়েছে। পুলিশ হিন্দু নেতাদের লঞ্চ থেকে নামতে বাধা দিল। কিন্তু মাটিভাঙা বাজারের রঞ্জন বিশ্বাসের বাড়িতে (পরবর্তীকালে 'জয়হিন্দ হাউস') দুপুরে আহারের জন্য তাদের যেতে দেওয়া হয়েছিল।

পরে মন্ত্রী যোগেন মণ্ডলের হুমকিতে উদয়নগরের কলেজটি হল না। তবে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করতে গিয়ে মুসলমানদের একটা গ্রাম জ্বলে ছাই হয়ে গেল। সেই সঙ্গে প্রাণ হারাল পাঁচ ছয় জন মুসলমান। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ফরিদপুরের কদমবাড়িতেও একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মন্ত্রী যোগেন মণ্ডলের বিরোধিতার ফলে সে কলেজটিও আর শেষ পর্যন্ত হতে পারেনি।

যোগেন মণ্ডলের রাজনৈতিক জীবন বিচিত্র। তিনি এক সময় ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসুর প্রিয় জন। সেই সময় তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্বাচিত হয়েছিলেন। ইংরেজ আমলের কলকাতা কর্পোরেশনের তিনিই ছিলেন নমঃ সমাজের প্রথম ও (আজ পর্যন্ত) শেষ কাউন্সিলর। সুভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টায় বরিশালের সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্রে কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী স্বনামধন্য অশ্বিনী কুমার দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র সরল দত্তকে হারিয়ে যোগেন মণ্ডল আইন সভার সদস্য হয়েছিলেন। এ ভাবে সাধরণ আসনে (সংরক্ষিত আসনে নয়) জয়ী হয়ে যোগেন বাবু রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন। ১৯৩৭ সালে এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল সুভাষচন্দ্র বসুর আশীর্বাদে।

ফজলুল হক এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির শ্যামা-হক কোয়ালিশন সরকারে নমঃ সম্প্রদায়ের মন্ত্রী ছিলেন খুলনার মুকুন্দ বিহারী মল্লিক। যোগেনবাবু নিজে মন্ত্রী হবার লোভে এবং অনুন্নত সমাজের আরও কিছু বিধায়ককে মন্ত্রী করার লোভ

দেখিয়ে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা মুসলিম লিগের সঙ্গে হাত মেলালেন। তা দেখেই গভর্নর প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে হক সাহেবকে বরখাস্ত করেন। তারপর নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল মুসলিম লিগ মন্ত্রীসভা। এই সরকার ভাঙাগড়ার খেলায় ওই পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের কয়েকজন বিধায়কের ওপর সবকিছু নির্ভর করছিল। তাই তাঁদের মধ্যে তিন জনকে মন্ত্রিসভায় নিতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা ছিলেন গৌণ। যোগেনবাবুই ছিলেন মূল চাবিকাঠি। যোগেনবাবুর সাহায্য ছাড়া মুসলিম লিগের পক্ষে সরকার গড়া সেদিন সম্ভব ছিল না।

নাজিমুদ্দিন সরকার গঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক প্রচার জোরকদমে শুরু হয়ে গেল। কংগ্রেস চালাচ্ছিল 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন। তার পাল্টা হিসাবে এসেছিল মুসলিম লিগের পাকিস্তান আন্দোলন, যা ছিল জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধী। তাই ব্রিটিশ সরকার মুসলিম লিগকে পুরোপুরি সাহায্য করেছিল।

যোগেন মণ্ডল ছিলেন সুচতুর, সুবক্তা, কিন্তু লোভী। মন্ত্রিত্বের লোভ দেখিয়ে কংগ্রেস থেকে তাঁকে সঙ্গীসহ বের করে আনা হয়েছিল। এর কিছুদিন আগে ডঃ আম্বেদকরকে ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের লেবার মেম্বার (অর্থাৎ কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী) করা হয়েছিল। এই পদ পেয়েই তিনি রাতারাতি 'অল ইণ্ডিয়া সিডিউল্ড কাস্ট ফেডারেশান' গঠন করে ছিলেন। পরে যোগেন বাবুকে করা হলো ফেডারেশনের বাংলা শাখার সভাপতি। এর পর থেকে আম্বেদকর এবং যোগেনবাবু দু'জনই কংগ্রেস ও বর্ণহিন্দুদের বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য রাখতে লাগলেন।

প্রকৃত সত্য হলো ইংরেজ ও মুসলিম লিগ বুঝেছিল যে, পাকিস্তান আদায় করতে হলে হিন্দুদের মধ্যে ভাঙন ধরাতে হবে। এক শ্রেণীর হিন্দুর সমর্থন যোগাড় করা তাদের পক্ষে ছিল অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে, নমঃ সমাজের সমর্থন পেতেই হবে। তাই যোগেনবাবুকে তাদের প্রয়োজন ছিল।

যোগেনবাবু তাঁর কংগ্রেসী ঐতিহ্যের কথা ভুলে গেলেন। হিন্দু সমাজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে এবং সেই বিভেদকে চাঙ্গা করে তুলতে অবিলম্বে তিনি মাঠে নেমে পড়লেন। বর্ণ হিন্দুদের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদগার করতে শুরু করে দিলেন। মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক আক্রমণে ভীত হয়ে বাংলার হিন্দু সমাজ তখন নিজেদের মধ্যেকার উঁচুনিচু ভেদ দূর করতে উদ্যোগী হয়েছিল। 'জলচল' করতে সব জেলায় একত্রে পংক্তি ভোজনের ব্যবস্থা করা হচ্ছিল। হিন্দুদের এই ঐক্যবন্ধনের প্রচেষ্টাকে বানচাল করতে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল ডঃ আম্বেদকর এবং যোগেন মণ্ডলকে।

তাঁরা প্রচার করতে লাগলেন, তফসিলিরা হিন্দু নয়। মুসলমানদের মতোই অ-হিন্দু। তারা এক পৃথক জাতি। মুসলমানদের পাকিস্তানের মতো তারাও চায় 'অচ্ছ্যুতস্থান'।

নাজিমুদ্দিনের মুসলিম লিগ সরকারের আমলে বাংলায় হয়েছিল ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ। 'পঞ্চাশের আকাল' নামে তা কুখ্যাত। সেই ভয়ানক দুর্ভিক্ষে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল। মুসলমানরাই মরেছে বেশি, দলে দলে। তবুও তারা ক্ষুব্ধ হল না। কেননা, তারা মনে করেছিল মুসলমানরাই তো বাংলার রাজা হয়েছে। সরকার যা-ই করুক মুসলিম স্বার্থই রক্ষিত হবে।

পাকিস্তানের পক্ষে প্রচারও বাড়ছিল। কংগ্রেস নেতারা তখন বন্দী হয়ে জেলে রয়েছেন। হাজার হাজার দেশপ্রেমিক যুবকও গ্রেপ্তার হয়েছেন। ইংরেজ সরকার কংগ্রেসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। মুসলমানরা সেই সুযোগকে পুরোপুরি কাজে লাগালো। তারা সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াতে লাগল। হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদের প্রস্তুতি নিলো। সেই সঙ্গে সঙ্গে যোগেন মণ্ডলও পাকিস্তানের পক্ষে ধুয়ো টানলেন।

সেই সময় যোগেনবাবুর বক্তৃতায় স্বাধীনতার ব্যাপারে কোনো কথাই থাকত না। নমঃ প্রধান অঞ্চলে গিয়ে বর্ধিষ্ণু হিন্দুদের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। মুসলমানদের মতো তিনিও বর্ধিষ্ণু হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। ডঃ আম্বেদকরকে অনুসরণ করে তিনিও প্রচার করতে থাকলেন যে, তফসিলি হিন্দুরা হিন্দু নয়, মুসলমানদের মতো তারাও আলাদা জাতি। তিনি বলতেন, বর্ধিষ্ণু হিন্দুরা হিন্দু জাতি আর তফসিলিরা তফসিলি জাতি। সেই সময় ব্রিটিশ মদতে বিজাতীয়তাবাদী কমিউনিস্টরাও ভারতে ভিন্ন ভিন্ন অনেক জাতির অস্তিত্বের তত্ত্ব আমদানী করল। ভারতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান ইত্যাদি মিলিয়ে একটি মাত্র জাতি রয়েছে, এ কথা কমিউনিস্টরা মানত না। তারা ভারতীয় জাতীয়তাবাদেও বিশ্বাস করে না। তাদের বহু জাতির তত্ত্বকে মুসলিম লিগ লুফে নিল। ফলে মুসলিম লিগ, কমিউনিস্ট পার্টি, আম্বেদকর, যোগেন মণ্ডল এবং তাদের সিডিউল্ড্ কাস্ট ফেডারেশনের চেষ্টায় পাকিস্তান আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল। আর পিছন থেকে মদত জোগাল ইংরেজ সরকার।

গোটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জুড়ে জাতীয়তাবাদীরা হলো লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত। স্বাধীনতার সংগ্রামে তারা নিজেদের দিয়েছিল আহুতি। হাজার হাজার কর্মী জেলে গেল। সেই সুযোগে মুসলিম লিগ ও তার দোসররা ফাঁকা মাঠে গোল দিল। এ রকম একটা পরিস্থিতিতেই বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল। তার ঠিক পরেই ঘোষিত হল প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন।

লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান

১৯৪৬ সালের নির্বাচন হয়ে গেল। বাংলার মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট আসনের মধ্যে মাত্র পাঁচটি পেল ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি। বাকি সব আসনই পেল মুসলিম লিগ। তখন দেশ ভাগ হয়নি, কিন্তু পশ্চিম বাংলার প্রায় সব মুসলমানই ভোট দিল মুসলিম লিগকে। সারা ভারতে সিডিউল্ড কাস্ট ফেডারেশনের মাত্র একজন প্রার্থী নির্বাচিত হলেন, তিনি যোগেন মণ্ডল। মুম্বাই থেকে ডঃ বি. আর. আম্বেদকর নির্বাচনে হেরে গেলেন। পরে তিনি বাংলা থেকে কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন মুসলিম লিগের সাহায্যে ও ব্রিটিশরাজের প্রচ্ছন্ন আশীর্বাদে।

নির্বাচনের পর সুরাবর্দির নেতৃত্বে বাংলায় মুসলিম লিগ মন্ত্রিসভা গঠিত হল, যোগেন মণ্ডল সেই মন্ত্রিসভার সদস্য হলেন। অন্য দিকে ইংরেজ ভারত ছেড়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হল। বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তি বিজয়ী হলেও ইংরেজ রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তারা ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে আলোচনার জন্য ক্যাবিনেট মিশন পাঠাল। ক্যাবিনেট মিশন কংগ্রেস ও মুসলিম লিগকে সমান মর্যাদা দিয়ে আলোচনা চালাল, কিন্তু তাদের সুপারিশ কংগ্রেস বা লিগ কেউই গ্রহণ করল না। তবু সরকার গণ-পরিষদের নির্বাচন ঘোষণা করল। নির্বাচনের পর জওহরলাল নেহরুকে করা হল অন্তবর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রিসভা ও গণপরিষদের উপর সংবিধান রচনার ভার ন্যস্ত করল।

মুসলিম লিগ প্রথমে নেহেরু সরকারে যোগ দেয়নি। তারা ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট প্রতিবাদ দিবস পালনের ডাক দিল। বাংলায় তখন সুরাবর্দির নেতৃত্বে মুসলিম লিগ সরকার। তারা প্রতিবাদ দিবসকে ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে-তে পরিবর্তন করল। অর্থাৎ দাঙ্গা দিবস। হাতে ছুরি নিয়ে লিগ রাস্তায় নামল। কলকাতায় রক্তগঙ্গ বইয়ে দিল।

কলকাতার সেই মহা দাঙ্গায় প্রথম দিকে বয়ে গিয়েছিল শুধু হিন্দু রক্তের ধারা। কিন্তু পরে মুসলিম আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল হিন্দু ও শিখের মিলিত শক্তি। এই ঐক্যবদ্ধ শক্তি প্রথমে প্রতিহত করল মুসলিম আক্রমণ, তারপর হানল পাল্টা আঘাত। বহু মুসলমান মারা পড়ল। মুসলিম লিগ এর প্রতিশোধ নিল নোয়াখালিতে। সেখানে হিন্দুদের গণহত্যা করা হল, তাদের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হল, হিন্দু মেয়েদের অপহরণ করা হল এবং হিন্দুদের জোর করে ধর্মান্তরিত করা হল।

নোয়াখালির প্রতিক্রিয়া হল বিহারে। বিশেষত ছাপড়া জেলায়। কংগ্রেসের 'হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই' শ্লোগান সেদিন হিন্দুদের প্রাণ বাঁচাতে পারেনি। তা দেখে সারা ভারতেই হিন্দুরা একতাবদ্ধ হল। প্রথমে তারা মুসলিম আক্রমন রুখে দিল, তারপর সারা দেশ জুড়ে পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি নিল।

ঘটনা স্রোত এভাবে মোড় নিয়েছে লক্ষ্য করে মহম্মদ আলি জিন্না প্রমাদ গুনলেন। ভারতে তখন চল্লিশ কোটি হিন্দু আর দশ কোটি মুসলমান। হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ হলে মুসলমানরা দাঁড়াতে পারবেনা। একথা তিনি বুঝলেন। তাই তিনি মুসলিম লিগের সিদ্ধান্ত বদল করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদানের সিদ্ধান্ত নিলেন।

প্রবল এই সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার মধ্যে সেদিন গণপরিষদের নির্বাচনে ডঃ আম্বেদকরের নির্বাচিত হবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ইংরেজ সরকারের অনুরোধ, জিন্নার আশীর্বাদে, সুরাবর্দির সহযোগিতায় এবং বাংলার মুসলিম লিগের প্রত্যক্ষ মদতে ডঃ আম্বেদকর শেষ পর্যন্ত বাংলা থেকে গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হলেন।

প্রধানমন্ত্রি জওহরলাল নেহেরু তাঁর অন্তর্বর্তী সরকারে তফসিলি সমাজের প্রতিনিধিরূপে জগজীবন রামকে মন্ত্রী করেছিলেন। তা দেখে ডঃ আম্বেদকর লন্ডনে গিয়ে আরও একজন তফসিলিকে মন্ত্রী করার দাবি জানালেন। আম্বেদকরের উপর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কৃতজ্ঞ ছিল। তারা সরকারিভাবে কিছু উচ্চবাচ্য করল না। কিন্তু গোপনে জিন্নাকে অনুরোধ করল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় মুসলিম লিগের তরফ থেকে একজন তফসিলি মন্ত্রী করা হোক। ব্রিটিশের ধারণা ছিল যে, যেহেতু জিন্নার আশীর্বাদে আম্বেদকর গণপরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন তাই তাঁকে মন্ত্রী করতে জিন্না আপত্তি করবেন না। তাই ডঃ আম্বেদকরের নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন তারা বোধ করেনি।

জিন্না ছিলেন চতুর রাজনীতিবিদ। আম্বেদকরকে তিনি সে সুযোগ দিলেন না। তিনি যোগেন মণ্ডলকে মুসলিম লিগের সহযোগী সদস্য করে নিলেন। মুসলিম লিগের কোটায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরূপে যোগেনবাবুর নাম জিন্না অতি দ্রুত ঘোষণা করে দিলেন। কারণ জিন্না জানতেন যে, আম্বেদকরের পূর্ণ আনুগত্য রয়েছে ব্রিটিশ রাজের প্রতি। মুসলিম লিগের প্রতি তাঁর আনুগত্য কম। পক্ষান্তরে যোগেনবাবু ছিলেন পুরোপুরিভাবে মুসলিম লিগের অনুগত। এইভাবে মিঃ জিন্না ব্রিটিশের অনুরোধের সম্মান দিলেন।

লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তানের কোন নাম গন্ধ ছিল না। সেই ঘাটতি পূরণ ও পাকিস্তানকে হাইলাইট করতে হয়তো বা বৃটিশের ইঙ্গিতে ডঃ আম্বেদকর তাড়াতাড়ি

"Thoughts on Pakistan" নামে বইটি লেখেন। এবং পাকিস্তানের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে তিনি তা সমর্থন করলেন। পরে নিজ স্বার্থে বৃটিশ রাজ তাকে শ্রমমন্ত্রী (Labour Executive) করেন। প্রতিদানে অতি তাড়াতাড়ি তিনি তফশিলি জাতি ফেডারেশন গড়ে, সেই সভায়ই তিনি ঘোষণা করলেন, 'তফশিলিরা হিন্দু নয়, তারা আলাদা জাতি।" আর হিন্দু ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধেও তিনি ও তার দল যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। 'কুইট ইন্ডিয়া' ডাকে তফশিলিরা যাতে সাড়া না দেয় তার জন্য রাজশক্তির বলে বলীয়ান হয়ে নব গঠিত ফেডারেশনকে সাথে নিয়ে তিনি ব্যাপক প্রচার চালান।

এসব দেখে মিঃ জিন্না বুঝলেন, বৃটিশ রাজ তার নিজ স্বার্থে ডঃ আম্বেদকরকে মন্ত্রী (Labour Executive) করেছেন। তাই ঝানু রাজনীতিবিদ মিঃ জিন্না ডঃ আম্বেদকরকে সাংসদ করলেও মন্ত্রী না করে তার নিজ স্বার্থেই যোগেন বাবুকে মন্ত্রী করলেন। প্রতিদানে মুসলিম লিগের নির্দেশ মতো ফেডারেশনকে সঙ্গে নিয়ে যোগেন বাবু পাকিস্তানের পক্ষে ও ব্রাহ্মণ্য বাদী হিন্দুদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে মাঠে নামলেন। ভারত ভাগের ভোটে তার দল (ফেডারেশন) পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেয়। বাংলা ভাগের ভোটে সব হিন্দু বাংলা ভাগের পক্ষে ভোট দিলেও তার দল (ফেডারেশন) বিপক্ষে ভোট দেয়। সেদিন বাংলা ভাগ করে পশ্চিম বাংলাকে ছিনিয়ে না আনলে আজ হিন্দুদের বাংলার বাইরে যেতে হতো।

আর সিলেট রেফারেন্ডামে তিনি নিজে ও তার দল (ফেডারেশন) পাকিস্তানের পক্ষে প্রচার চালায়। সেই প্রচারে ছাত্র ফেডারেশনের নেতা নীরোদ রায়, সন্তোষ মল্লিক, কেশব রায়, খগেন বিশ্বাস, হরবিলাস বসু সহ অনেকে সিলেট গিয়ে পাকিস্তানের পক্ষে প্রচার করেন। ফলে মাত্র কয়েক হাজার বেশি ভোট পাকিস্তানের পক্ষে পড়ায় সিলেট পাকিস্তানে চলে যায়। সেই সিলেটের বাসিন্দারা আজ আর ভারতবাসী নন, তারা বাংলাদেশী। সেখানে আজ গ্যাসের অফুরন্ত ভান্ডার।

যোগেনবাবু তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসুর অনুচররূপে। সে সময় তিনি ছিলেন প্রবলভাবে ব্রিটিশ বিরোধী। জিন্না তা জানতেন বলেই আম্বেদকরের চাইতে তাঁকে বেশি পছন্দ করেছিলেন। আম্বেদকর ছিলেন গণপরিষদের সদস্য আর যোগেনবাবু ছিলেন বাংলার বিধানসভার একজন সদস্য মাত্র। তা সত্ত্বেও যোগেনবাবুকেই কেন্দ্রের মন্ত্রী করে দিলেন জিন্না। মুসলিম লিগের সদস্য যোগেনবাবুকে দেওয়া হয়েছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আইনমন্ত্রীর পদ, সরকারে যোগ দিয়েই লিগ নেতারা পাকিস্তান আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে প্রচারে

নেমে পড়ল। যোগেনবাবুকেও তারা পাকিস্তানের সপক্ষে প্রচারে নামিয়ে দিল।

একদিন বাংলার প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দি যোগেনবাবুকে ডেকে বললেন, পূর্ব বাংলার নমঃ সমাজ যদি পাকিস্তানের বিরোধিতা করে তবে পাকিস্তান হবার কোনও সম্ভাবনা থাকবে না। এ কথা শুনেই যোগেনবাবু পাকিস্তানের দাবিতে প্রচার শুরু করে দিলেন এবং খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর, বরিশাল ও ঢাকার বিভিন্ন জনসভায় বক্তৃতা করে বেড়াতে লাগলেন।

বরিশালের পিরোজপুরের এক জনসভায় তার বক্তৃতা আমি নিজে শুনেছি। তফসিলিদের তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে যোগ দিতে স্পষ্ট ভাষায় আহ্বান জানালেন। তিনি বললেন, তফসিলি সমাজ ও মুসলমান সমাজের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উভয় সম্প্রদায়ের খাওয়া দাওয়া শিক্ষাদীক্ষা আচার আচরণও প্রায় একই রকম। এই দুই সম্প্রদায়ের সঙ্গে বর্ধিষ্ণু হিন্দুদের কোনো মিলও নেই, সম্পর্কও নেই।

যোগেনবাবু অত্যন্ত জোরালো ভাষায় বলতে লাগলেন, বর্ধিষ্ণু হিন্দুরাও এত কাল ধরে তফসিলিদের উপর অত্যাচার চালিয়েছে। তারা মুসলমানদের উপরও সমান অত্যাচার করেছে। কুকুর বিড়ালের মর্যাদাও তারা তফসিলি কিংবা মুসলমানদের দেয়নি। এই অত্যাচারের হাত থেকে চিরকালের জন্য মুক্তি পাবার জন্যই তফসিলিদের পাকিস্তান চাইতে হবে।

যোগেনবাবু যখন শহরে ও গ্রামাঞ্চলে এই সব কথা বলে বেড়াচ্ছেন তখন কংগ্রেস 'হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই' এই স্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত করছিল। গান্ধীজি গাইছিলেন 'ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম, সবকো সুমতি দে ভগবান'। তার বিপরীতে মুসলিম লিগের ন্যাশনাল গার্ডের সেনারা 'নারা এ-তকবির', 'আল্লাহো আকবর', 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', 'কানে বিড়ি মুখে পান, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' ইত্যাদি ধ্বনি দিয়ে জেহাদের প্রস্তুতি নিচ্ছিল আর হুমকির ভাষায় কথা বলছিল।

বৈষ্ণববাদী হিন্দুরা ভীত হয়ে পড়ল। ১৯৪৭ সালে পিরোজপুরে সরস্বতী পূজা আগের মতোই হল। কিন্তু প্রতিমা নিরঞ্জনের মিছিলকে বাধা দেওয়া হল। মুসলমানরা বলল, মসজিদের সামনে দিয়ে মিছিল যেতে পারবে না। পরদিন উত্তর অঞ্চলের মনোহর বিশ্বাস, ড্যাগা, সুধন্য হালদার সুরেন বাইন, অক্ষয় সিঙ্গাদান সহ অনেক নমঃ সর্দার খবর পেয়ে পিরোজপুরে হাজির হলেন। তাঁদের হুকুমে বাজনা সহকারে নিরঞ্জন মিছিল বের হল। প্রতিমা বিসর্জনও হল। মুসলমানরা বাধা দিতে সাহস পেল না। এ হল পাকিস্তান হবার কয়েক মাস আগের কথা। এতেই প্রমাণিত

হয় নমঃ সর্দারদের সাহস ও শৌর্য বীর্যের কথা।

যোগেন বাবুর দল সেদিন পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরোধিতা করে গ্রামে গ্রামে সভা করলে পূর্বপাকিস্তান হওয়া সম্ভব ছিল না। পূর্বপাকিস্তান হলেও অন্তত যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর ও বরিশাল জেলা নমঃ সমাজের ঐ সব বীরেরা জীবন বলী দিয়েও পাকিস্তানে পড়তে দিত না।

পূর্ব বাংলার নমঃ সর্দারদের যে শক্তি ও সাহস ছিল, সারা দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েও জওহরলাল নেহেরুর তা ছিল না। তিনি ছিলেন অতিশয় দুর্বল চরিত্রের মানুষ। মাউন্টব্যাটেন খুব সহজেই লোভী জওহরলালকে দেশভাগে রাজি করালেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি পাকিস্তানের দাবি মেনে নিল। স্বয়ং গান্ধী নিজেও দেশভাগ মানলেন এবং ওয়ার্কিং কমিটিকেও তা মানতে বাধ্য করলেন। আমাদের দেশবাসীর মধ্যে অনেকেই এই ধারণা পোষণ করে থাকেন যে, গান্ধী তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত দেশভাগের বিরোধিতা করে গেছেন। একদা গান্ধী বলেছিলেন যে - 'আমার মৃতদেহের উপর দিয়ে' দেশভাগ হবে। বেশিরভাগ মানুষেরই ধারণা যে, মৃত্যু পর্যন্ত গান্ধী তাঁর এই প্রতিজ্ঞায় অটল ছিলেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ১৪/১৫ই আগষ্ট গভীর রাত্রে মাতৃভূমির অঙ্গচ্ছেদ হল। দেশভাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা এল। বিশ্বের মানচিত্রে 'পাকিস্তান' নামে একটি নতুন মুসলিম রাষ্ট্র তার স্থান করে নিল। আর ইসলামিক সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র আরবের অধীনে চলে গেল। তাতে আমাদের জন্মভূমির দেশান্তর হল। আর বাঙালি তার ঘর ছেড়ে আরবের জাতিয়তাবাদী শিবিরে আশ্রয় নিল। তাদের ঠিকানা হল পাকিস্তান, ভারত নয়। সিলেট রেফারেণ্ডামে যোগেনবাবু পাকিস্তানের পক্ষে বক্তব্য রাখেন ও সে ভাবে প্রচার করেন। ফলে অনুন্নত শ্রেণীর দেওয়া অল্প সংখ্যক বেশি ভোটে সিলেট পাকিস্তানে চলে যায়। তাদের দেশও এখন ভারত নয়, পাকিস্তান।

ব্রিটিশ রাজত্বের অবসানে সব দিক দিয়ে লাভবান হল মুসলমানরা। কিন্তু হিন্দুরা পেল না কিছুই। মুসলমানরা পেল ইসলামী রাষ্ট্র, আর অবশিষ্ট খণ্ডদশাপ্রাপ্ত ভূখণ্ড ঘোষিত হল 'ধর্মনিরপেক্ষ' ইন্ডিয়া রাষ্ট্ররূপে। সে রাষ্ট্রে ঘোষিত হল হিন্দু-মুসলমানদের সমান অধিকার। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মুসলমানদের প্রতিটি আবদারের কাছে ভারত মাথা নোয়াল। পক্ষান্তরে হিন্দুরা ন্যায্য দাবি জানালেও তাকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে দাবিয়ে দেওয়া হল। পাকিস্তান আদায়কারি মুসলমানরা ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে সম্মানিত নাগরিকের মর্যাদা পেল, পক্ষান্তরে পাকিস্তানে হিন্দুরা 'হিন্দু' পরিচয় দিতে গেলেই হয়ে গেল সংকীর্ণতাবাদি সাম্প্রদায়িক। স্বাধীন ভারতে মুসলমানরাই কুলিন, হিন্দুরা অচ্ছুৎ। মুসলমানরা পাচ্ছে তোয়াজ আর হিন্দুরা পাচ্ছে নিন্দা, অবজ্ঞা আর বদনাম। দেশ প্রেমিক মাতৃভক্ত শ্যামাপ্রসাদ সাহসী ও বীর হয়েও তার ন্যায্য সম্মান পেলেন না। নেতাজীর বেলায়ও তাই।

ভারত ভাগ হল জন্ম নিল পাকিস্তান

মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা ছিল গোটা বাংলা, গোটা পাঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ, বালুচিস্তান ও উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে পাকিস্তান গঠন করা। কংগ্রেসও তা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। তিনি ব্যাঘ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব পাঞ্জাব ভারতেই থাকবে। কংগ্রেস মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও দেশের প্রায় সব হিন্দু তখন শ্যামাপ্রসাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বলা যায় জিন্না ভারত ভাগ করে পাকিস্তান গড়েছে আর শ্যামাপ্রসাদ সেই পাকিস্তান ভেঙে ভারতের সীমানা বাড়িয়েছেন। জন্মলগ্নে তিনি পূর্ব পাকিস্তানকে ভাগ করে দিলেন। দেশ ভাগের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গের বাঙালিদের দেশান্তর হল — জন্মসূত্রে তারা ছিল বাঙালি বা হিন্দুস্তানী। রাতারাতি তারা সাম্রাজ্যবাদী আরবের অধীনে চলে গেল। ইসলামিক সীমারেখার মধ্যে তারা পাকিস্তানী হয়ে গেল। তখন ভারত তাদের শত্রু, আরব তাদের মিত্র, প্রভু।

পূর্ববঙ্গ, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ, বালুচিস্তান ও উত্তর পশ্চিমসীমান্ত প্রদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা তথা কংগ্রেস সমর্থক সহ হিন্দুরা তাদের নিজভূমেই রাতারাতি পরদেশী ও রাষ্ট্রদ্রোহীরূপে গণ্য হল। যারা বরাবর স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করে এসেছে তারাই পেল নতুন স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাসে ঐ সব জায়গার হিন্দুরা হয়ে গেল জিম্মী অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। কোটি কোটি হিন্দুর কপাল পুড়ল। তাদের বাক্ স্বাধীনতা তো রইলই না, এমন কি জীবনের নিরাপত্তাও নয়।

পাকিস্তান হবার আগে যখন মুসলমানরা মারমুখী হয়ে হিন্দুদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা বাধাচ্ছিল, সে সময় যোগেন মণ্ডল বক্তৃতা দিতেন — মুসলীম লিগ বর্ধিষ্ণু হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ডাক দিয়েছে, তাতে তফসিলিদের ভয়ের কোনো কারণ নেই।

কিন্তু ···দের মুসলমানরা তখন পাকিস্তানের মোহে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। যেখানেই তাদের শক্তি ছিল সেখানেই তারা তফসিলিদেরও আক্রমণ করছিল। কলকাতার মহাদাঙ্গার পর যোগেনবাবু বিবৃতি দিয়েছিলেন যে, ঐ দাঙ্গা বর্ধিষ্ণু হিন্দুদের বিরুদ্ধে, তফসিলিদের বিরুদ্ধে নয়। তাই তফসিলিদের ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। নোয়াখালির দাঙ্গার পরও যোগেনবাবু ঐ একই মর্মে বিবৃতি দিলেন।

সেই সময় এক দিন খুলনা জেলার চিতলমারির এক জনসভায় দাঁড়িয়ে যোগেনবাবু বলতে শুরু করলেন যে, নোয়াখালির দাঙ্গায় তফসিলিদের ওপর কোনো

আক্রমণ হয়নি। তখন ঐ সভাতেই উপস্থিত বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিক্ষক কিরণ ব্রহ্ম উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করে বললেন, যোগেনবাবু ডাহা মিথ্যা কথা বলছেন। নোয়াখালিতে নমঃ গ্রামগুলি লুট করে মুসলমানরা সেসব গ্রামে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। নমঃ সম্প্রদায়ের শত শত মানুষ খুন হয়েছে। মা বোনদের ইজ্জৎ লুণ্ঠিত হয়েছে। কিরণবাবু নোয়াখালিতে গিয়ে স্বচক্ষে সব দেখে এসে বলেছিলেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যোগেন মণ্ডল কিরণ ব্রহ্মকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে পুলিশকে হুকুম দিলেন। সভামঞ্চে দাঁড়িয়েই যোগেন মণ্ডল চিৎকার করে বলতে শুরু করলেন কিরণবাবুর মতো লোকেরা হল দিয়াশলাইয়ের কাঠি। এরা সুযোগ পেলেই বিভেদের আগুনে গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দেবে। মুসলমানরা সে সময় মন্ত্রী যোগেন মণ্ডলকে দিত পীরের সম্মান। অনেক হিন্দুর কাছেও মন্ত্রী যোগেন মণ্ডল ছিলেন দেবতা। কিন্তু মজার কথা হলো কলকাতার সংবাদপত্রগুলি তাকে আখ্যা দিল যোগেন আলি মোল্লা, বিশেষ করে আনন্দবাজার ও যুগান্তর কাগজ এ নামেই তাকে অভিহিত করেছিল।

নিজের মন্ত্রিত্ব বজায় রাখতে যোগেনবাবু বর্ণ হিন্দুদের বিরুদ্ধে তো দাঁড়ালেনই উপরন্তু নিজের নমঃ সমাজকেও সমুদ্রে ছুঁড়ে দিতে দ্বিধা করলেন না। তবুও তিনি শেষ রক্ষা করতে পারেননি। তিনি পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েছিলেন। তবুও প্রাণের ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে ভারতে চলে এসেছিলেন। কলকাতায় পৌঁছে তিনি পাকিস্তানের মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দিয়েছিলেন, কেননা পাকিস্তান যে ইসলামী কোরান ও হাদিসের নির্দেশ মতোই চলবে তা তিনি পাকিস্তানের তৎকালিন রাজধানী করাচীতে বসে বেশ ভালো করেই বুঝেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, হিন্দুরা পাকিস্তানে অবাঞ্ছিত। তারা সবরকম প্রকারে অত্যাচারিত হবে, খুন হবে এবং শেষ পর্যন্ত ধর্মান্তরিত হবে। এর কোনোটাই যোগেনবাবু মেনে নিতে পারেননি। পাকিস্তানকে চরম হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি তার পদত্যাগ পত্র লিখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে, হিন্দুরা চিরকাল তাদের অত্যাচার সহ্য করবে না। প্রত্যাঘাত তারা করবেই এবং সেই চরম প্রত্যাঘাতের দিন শুধু সময়ের অপেক্ষা। তা হলো মৃত্যুর শেষ মুহূর্তে খুনীর স্বীকারোক্তির মতো।

আমাদের বাড়িতেও দেশ ভাগ বিষয়ে আলোচনা চলত। সব দিক ভেবে ঠিক করা হয়েছিল যে, লেখাপড়া আমাকে চালিয়ে যেতেই হবে এবং সেই কারণে আমাকে কলকাতা পাঠানো হবে। পাকিস্তান হবার পাঁচদিন পর, ১৯৪৭ সালের ২০শে আগস্ট কলেজে পড়ার উদ্দেশ্য নিয়ে আমি কলকাতায় চলে এলাম। উঠলাম ছোট কাকার বাড়িতে। পরীক্ষার ফল বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হলাম।

দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গের হাওয়া পুরোপুরি পাল্টে গিয়েছিল। মুসলমানদের উল্লাসে চিৎকারে ফুটে উঠেছিল তাদের মনে জোয়ার আসার মনোভাব। আর হিন্দুদের ওপর নেমে এসেছিল বিষাদের কালো ছায়া। আরবের মতো পাকিস্তানকেও কাফের শূন্য করার পরিকল্পনা রচনা করল মুসলিম নেতৃত্ব এবং সেই পরিকল্পনা মতো শুরু হলো হিন্দুদের ওপর আক্রমণ।

দেশভাগের সময় পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজের মান ছিল খুবই নিচু। হিন্দু সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশ ছিল নমঃ সম্প্রদায়। মুসলমানরা ছিল তাদের থেকেও পিছিয়ে। গোটা পূর্ববঙ্গে একজন মুসলমানও পি. এইচ. ডি. ডিগ্রীর অধিকারী ছিল না। কিন্তু হিন্দু সমাজে তা ছিল ডজন ডজন। কলকাতা থেকে ঢাকায় গেলেন ডঃ শহীদুল্লাহ এবং কুদরত-ই খুদা। আর খুঁজে পাওয়া গেল ডঃ নীলিমা ইব্রাহীমকে। তিনি ছিলেন হিন্দুর মেয়ে, পরে মুসলমান হয়েছিলেন।

কিন্তু সে কালেও পূর্ববঙ্গের নমঃ সমাজে পি এইচ ডি ডিগ্রীধারী বিদ্বানরা ছিলেন, যেমন ফরিদপুরের ওড়াকান্দি গ্রামের ভগবতী ঠাকুর। পূর্ববঙ্গে কোনও মুসলমান এম আর সি পি বা এফ আর সি এস ডাক্তার ছিল না। কিন্তু নমঃ সমাজে তেমন অনেক ডাক্তার ছিলেন। যেমন খুলনার ডাক্তার স্নান মন্ডল, এম আর সি পি। কোনো মুসলমান আই সি এস অফিসারও ছিল না। ছিলেন একমাত্র নমিনেটেড আই সি এস নূরনবী চৌধুরী। তিনি যুদ্ধের সময় সামরিক দপ্তরে অফিসার ছিলেন, সেই কারণে তিনি নমিনেটেড আই সি এস হতে পেরেছিলেন। নমঃ সমাজে আই সি এস অফিসার ছিলেন খুলনার সুকুমার মল্লিক। মুসলমান সমাজের কেউ আই এফ এস(ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস) ছিল না। নমঃ সমাজে আই এফ এস অফিসার ছিলেন ফরিদপুরের লক্ষ্মী নারায়ণ রায়। দক্ষিণবঙ্গে কোনো মুসলমান ব্যারিষ্টার ছিল না। কিন্তু নমঃ সমাজে ব্যারিষ্টার ছিলেন ফরিদপুরের ওড়াকান্দির পি আর ঠাকুর, সুরেশ বিশ্বাস, খুলনার শশিভূষণ মন্ডল এবং বরিশালের ভূবন মন্ডল। এরা সবাই ত্রিশের দশকের প্রথম দিকেই ব্যারিষ্টার হয়েছিলেন। অথচ সমস্ত পূর্ববাংলার মুসলমানদের মধ্যে তখন একজনও ব্যারিষ্টার ছিল না। এ থেকেই বোঝা যায় যে পূর্ববাংলার মুসলমানরা শিক্ষা দীক্ষায় কতখানি পিছিয়ে ছিল।

ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারেও সেই একই অবস্থা ছিল। বড় আকারের ব্যবসা বাণিজ্য দূরের কথা, ছোটোখাটো ব্যবসাতেও মুসলমানদের খুঁজে পাওয়া যেত না। ব্যবসা বাণিজ্যের সবটাই ছিল হিন্দুদের হাতে। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের হাতে নয়টি কাপড়ের কল, চারটি দিয়াশলাই ফ্যাক্টরি, দুইটি চিনির কল, দুইটি গ্লাস ফ্যাক্টরি,

অনেকগুলি পাটের প্রেসিং ও রোলিং মিল, হোসিয়ারি কারখানা, চাল ও সরিষার তেলের বড় বড় মিল, একটা সিমেন্ট কারখানা, অনেক চা বাগান ও আমদানী রপ্তানি কোম্পানি। জমিদারদের প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু। জমির মালিকানার শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ ছিল হিন্দুদের হাতে। সে সময় পূর্ববঙ্গের প্রায় ৩০ শতাংশ ছিল হিন্দু, কিন্তু সম্পদের ৮০ শতাংশ ছিল তাদের হাতে। সাংস্কৃতিক জগতেও মুসলমানদের কোনো অবদান ছিল না। ডাক্তারি, ওকালতি, শিক্ষকতা ইত্যাদির প্রায় সব পেশাই ছিল হিন্দুদের দখলে।

পাকিস্তান হবার মুখে হিন্দু চাকুরিজীবীদের অধিকাংশই ভারতে চলে আসার অপশন দিয়েছিল। বর্ধিষ্ণু হিন্দুরা দাঙ্গা, লুট ও লাঞ্ছনার ভয়ে বিভিন্ন সময়ে দেশত্যাগ করে ভারতে চলে আসে। যেখানে দাঙ্গা হয়নি সেখানেও হুমকি ছিল। সে সব অঞ্চলের হিন্দুরাও দেশত্যাগী হয়েছিল। তাদের ফেলে আসা সমুদয় জমি, বাড়ি, ব্যবসা বাণিজ্য মুসলমানরা দখল করে নেয়।

মুসলমানরা বুঝেছিল যে, অত্যাচার করলে, এমনকি অত্যাচারের ভয় দেখালেও হিন্দুরা প্রতিবাদ করবে না, প্রাণভয়ে পালিয়ে যাবে। তাই তারা হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। তারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করল হিন্দুদের সম্পত্তি দখল করার লোভে এবং হিন্দুদের ফেলে আসা সমস্ত সম্পত্তি দখল করে নিল। হিন্দুরা দলে দলে পূর্ববঙ্গ ছেড়ে চলে আসায় সেখানে তাদের সংখ্যা কমে গেল। এই সংখ্যা শেষ পর্যন্ত তিরিশ শতাংশ থেকে পনেরো শতাংশে এসে দাঁড়ায়। হিন্দুদের দেশত্যাগে পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজে সাধারণভাবে কেউই আপত্তি [illegible] বরং তারা খুশি হয়েছে। এটাই তাদের কাম্য ছিল। হিন্দুশূন্য পূর্ববঙ্গই ছিল মুসলমানদের বাঞ্ছিত।

দেশভাগের পর পূজার ছুটিতে বাড়ি গেলাম। দেখলাম চিতলমারি, মাটিভাঙ্গা ও বাবুগঞ্জ বাজারের সাহা ব্যবসায়ীদের অনেকেই দেশ ছেড়েছেন। এর প্রধান কারণ ছিল, মুসলিম লিগের লোকেরা তাদের কাছে 'পাকিস্তান' বাবদ বিরাট অঙ্কের চাঁদা দাবি করেছিল। এ ছাড়াও তারা আরও অনেকরকম জুলুমবাজি শুরু করেছিল। পিরোজপুরে গিয়ে দেখি সেখানকার হিন্দু উকিল, ডাক্তার, মোক্তার ও ব্যবসায়ীদের অনেকেই ভারতে চলে গিয়েছেন।

ক্লাসের হিন্দু বন্ধুদের খুঁজে পেলাম না। ভাঙা মন নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। প্রতিদিনই হিন্দুদের দেশ ছাড়তে দেখলাম এবং এসব দেখে মনে দারুণ আঘাত পেলাম। প্রতিবিধান করার সামর্থ্য ছিল না, তাই মর্মাহত হলাম আরও বেশি। বুঝলাম গ্রামের শান্তি আর কোনোদিনই ফিরে আসবে না।

তবু তখনও চারদিকে প্রচার চলছিল, দেশভাগ বেশিদিন থাকবে না। পাকিস্তান টিকবে না। নমঃ সমাজের লোকেরা তখনও মনোবল হারায়নি। আমাদের ও আশপাশের নমঃ প্রধান অঞ্চলের লোকদের মনের সাহস অটুট ছিল। তখনও তারা মুসলমানদের বলত — মিঞারা, পাকিস্তান পেয়েছ বলে বেশি লাফালাফি করো না। দরকার হলে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেব। তারা একথা বলার সাহস পেত কারণ তখনও তারা শক্তিশালী ছিল, কিন্তু রাজশক্তির ক্ষমতা কত তখনও তারা বুঝে উঠতে পারেনি। রাজশক্তি যে চরম নির্লজ্জভাবে মুসলমানদের গুন্ডামিকে সাহায্য করতে পারে তা তারা তখনও চিন্তা করতে পারেনি। কিন্তু সেই পরিবেশেও হিন্দুদের ওপর সরাসরি আক্রমণ করার সাহস মুসলমানরা পায়নি। তাই হিন্দুদের জব্দ করার জন্য তারা অন্য এক পরিকল্পনা করল। গন্যমান্য হিন্দু ও হিন্দু সর্দারের বিরুদ্ধে তারা রাষ্ট্রদ্রোহিতা, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদির মিথ্যা অভিযোগ এনে থানায় থানায় অভিযোগ দায়ের করতে শুরু করল। থানার পুলিশ হিন্দুদের থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে অকথ্য মারধোর করা শুরু করল। এই পুলিশি অত্যাচারের ভয়েই অনেক সর্দার ও সমাজনেতা দেশ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিল ও দেশ ত্যাগ করল।

কালশিরা তথা ৫০-এর দাঙ্গা

আমাদের গ্রাম থেকে মাইল তিনেক দূরে ছিল কালশিরা গ্রাম। সেখানকার মুসলমানরা থানায় মিথ্যা অভিযোগ জানাল এবং পুলিশ দেশদ্রোহী কমিউনিষ্টদের ধরার নাম করে গ্রামের হিন্দুদের ধরতে এল। বীরেন ব্রহ্ম সহ অনেককে বেদম পেটালো। তাতে গ্রামের হিন্দুরা বাধা দিল। পুলিশ কাউকেই গ্রেফতার না করেই চলে যেতে বাধ্য হল। কিন্তু তারপর পুলিশকে সামনে রেখে শত শত মুসলমান অতর্কিতে গ্রামে ঢুকে অত্যাচার শুরু করল। গ্রামের মানুষ জীবন পণ করে প্রতি আক্রমণ চালাল। তাতে একজন পুলিশ মারা পড়ল। কয়েকজন পুলিশসহ অনেকে আহত হল এবং তারা ফিরে গেল।

এরপর বিভিন্ন গ্রাম থেকে হাজার হাজার মুসলমান কয়েক ডজন পুলিশ নিয়ে কালশিরার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা কালশিরা গ্রাম লুট করে জ্বালিয়ে দিল, আশপাশের গ্রামেও আক্রমণ চালাল। অমানুষিক অত্যাচার করল। মেয়েদের ইজ্জত লুট করল। হিন্দুরা সে আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে বেশ কয়েকজন মারা পড়ল। অসংখ্য লোক আহত হল ও দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল। গোটা পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে দাঙ্গা হল। তার প্রতিক্রিয়া দেখা গেল পশ্চিমবঙ্গে। এ সময় গুজব রটে গেল যে কলকাতায় ফজলুল হক খুন হয়েছেন। ফলে দাঙ্গা পূর্ববঙ্গে আরও ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ল।

আমি তখন কলকাতায়। পূর্ববঙ্গে দাঙ্গার খবর আমি প্রথমে পেয়েছিলাম কলকাতার খবরের কাগজ পড়ে। তারপর দেখলাম হাজার হাজার উদ্বাস্তু শরণার্থী ট্রেনে করে শিয়ালদহ স্টেশনে আসছে। দাঙ্গার ব্যপকতা ও হিংস্রতার কথা জেনে আমাদের খাওয়া নাওয়া ও ঘুম বন্ধ হয়ে গেল। পড়াশুনা বন্ধ করে স্বেচ্ছাসেবক হয়ে শরণার্থীদের সেবায় লেগে পড়লাম।

সে সময়কার ভয়াবহ দৃশ্যের কথা মনে পড়লে আজও শিউরে উঠি। স্টেশনে ট্রেন ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মৃতদেহগুলি তুলে স্টেশন চত্বরে অপেক্ষমান হিন্দু সৎকার সমিতির গাড়িতে তুলে দেই। আহত ও রোগীদের আশু চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠাতে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দেই। অন্যান্য অসুস্থদের স্টেশনে সাময়িক[illegible] স্থাপিত ফার্স্ট এইড সেন্টারে পৌঁছে দেই। কাশী বিশ্বনাথ সেবা সমিতি, মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটি, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ ও অন্যান্য সেবা সংগঠন স্টেশন চত্বরে সাময়িকভাবে সেবাকেন্দ্র স্থাপন করেছিল। শিয়ালদহ স্টেশনে বিভিন্ন ট্রানজিট ক্যাম্পও স্থাপিত হয়েছিল। যে সব শরণার্থী কয়েকদিন যাবৎ অভুক্ত অবস্থায় স্টেশনে পৌঁছেছে তাদের সঙ্গে সঙ্গে ওই সব ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হত। সে সময় দেখেছিলাম আমাদের অঞ্চলের বহু বর্ধিষ্ণু পরিবারকে সর্বস্ব হারিয়ে শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছতে। একদিন এভাবেই দেখা হয়ে গিয়েছিল আমার দাদু নগরবাসী বিশ্বাসের সঙ্গে।

খুলনা জেলার চিতলমারিতে ছিল তার বাড়ি। আমাদের অঞ্চলের গণ্যমান্য সমাজপতিদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। প্রকৃত জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন আমার দাদু। স্টেশনে আমাকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদলেন। এইখানে বলে রাখা উচিৎ হবে যে, গত অষ্টম শতাব্দী থেকে ভারতের হিন্দুরা মুসলমানদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে আসছে। কিন্তু যে তত্ত্বের দ্বারা মুসলমানরা চালিত, সেই তত্ত্বকে তারা কোনো দিনও জানার চেষ্টা করেনি। তাই আমার দাদুর মতো কোনো হিন্দুই ভাবতে পারে না যে পৃথিবীতে ধর্মের নামে এমন কোনো তত্ত্ব থাকতে পারে যা মানুষকে পশুতে পরিণত করে। তাই সেই পশুদের দ্বারা আক্রান্ত হলে তাদের কাছে তা আকস্মিক মনে হয় এবং দুঃখ পান। হিন্দু স্বভাবতই উদার। তাদের তত্ত্ব শিক্ষা দেয় যে, সকল প্রাণীর মধ্যেই ভগবান আছেন। তাই তারা ভাবেন মুসলমানদের মধ্যেও সেই ভগবান রয়েছেন। কিন্তু তারা জানে না একজন মুসলমানের দৃষ্টিতে প্রতিটি হিন্দু ঘৃণ্য, মূর্তি পূজক এবং নির্দয়ভাবে বধযোগ্য। কিছু কিছু স্বার্থান্বেষী হিন্দু এই বলে পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে যে, সব ধর্মই সমান বা সব ধর্মই মানুষকে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে দেয়। এই সব উদার চিন্তায় বিভোর হিন্দু যখন মুসলমান পশুদের দ্বারা আক্রান্ত হয় তখনই তাদের চৈতন্যের উদয় হয়।

নগরবাসী বিশ্বাস ছিলেন আমার ছোট কাকার পিসশ্বশুর এবং সেই সুবাদে আমার দাদু। তাঁকে বাড়ি নিয়ে গেলাম। রাতে তাঁর ও ছোট কাকার মধ্যে অনেক আলোচনা হয়। আমরা স্থির করলাম যে, কলকাতার নেতাদের সঙ্গে দেখা করে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের দুঃখের কথা জানাতে হবে। এই সব অসহায় মানুষদের জন্য নেতারা কি করতে পারেন এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কি উপদেশ দেন তাও জানতে হবে।

সে সময় ঢাকা-করাচি সরাসরি বিমান সার্ভিস ছিল না। কলকাতা হয়েই যাতায়াত করতে হত। পূর্ববঙ্গে দাঙ্গা চলছে যখন তখন সদ্য সদ্য নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি সই হয়েছে বা হতে চলেছে। তখন আমরা শুনতে পেলাম যে যোগেন মন্ডল ঢাকা যাওয়ার পথে কলকাতায় রাত কাটাচ্ছেন। উঠেছেন পার্ক সার্কাসে সুরাবর্দি হাউসে। আমরা ২৫/৩০ জন ছাত্র গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। বললাম, আপনি মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিন। অরুচিকর ভাষায় তাঁকে গালাগালিও করলাম।

যোগেনবাবু ঢাকায় গেলেন। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের ওপর নির্মম অত্যাচার নিজের চোখে দেখলেন, শুনলেনও অনেক কিছু। পূর্ববঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর বক্তব্যও তিনি রাখলেন। তার ফলে নানা মহল থেকে তাঁকে ভয়ও দেখানো হল। প্রাণের ভয়ে তৎক্ষণাৎ তিনি কলকাতায় চলে এলেন। কলকাতায় বসেই তিনি মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দিলেন। তিনি তার পদত্যাগ পত্র পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলির কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

পূর্ববঙ্গে দাঙ্গা থামল বটে, কিন্তু শরণার্থীর স্রোত বাড়তেই থাকল। সেবার দুর্গাপূজায় আর বাড়ি যাইনি। দাদু, ছোটকাকা, আমি এবং আরও দুজন যোগেনবাবুর সঙ্গে দেখা করলাম। যোগেনবাবু তখন পাকিস্তান ছেড়ে কলকাতায় আশ্রয় নিয়েছেন। যোগেনবাবুর সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র দাদু বাঘের মতো তাঁকে আক্রমণ করলেন। সে দৃশ্য কোনোদিন ভুলতে পারব না। দাদুর তেজবীর্য দেখে সেদিন বুঝেছিলাম যে, কেন গ্রামের লোকেরা তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে।

আমার দাদু ছিলেন গ্রামের স্বল্প শিক্ষিত মানুষ। কিন্তু তাঁর আক্রমণে সেদিন চোখের সামনে সদ্য পদত্যাগকারী পাকিস্তানের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা ঝানু পলিটিশিয়ান যোগেন মন্ডলকে বিধ্বস্ত হতে দেখলাম। তিনি দাদুর একটি প্রশ্নেরও জবাব দিতে পারেননি। দাদুর একটি যুক্তিও তিনি খন্ডন করতে পারেননি। তিনি শুধু বলেছিলেন, এমনটি হবে তা তিনি ভাবতে পারেননি। এতদিন তিনি যা করেছেন তার জন্য তিনি দুঃখিত ও মর্মাহত।

দাদু তখন বলেছিলেন, "আমরা আমাদের ভবিষ্যতের কথা সব নেতাদের সামনে আলোচনা করতে চাই। তার সব ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সময় ও তারিখ ঠিক করে আমাদের জানাবেন। আমরা নেতাদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করব।"

উপরিউক্ত সাক্ষাতের সূত্র ধরেই আমরা একদিন যোগেনবাবুর সঙ্গে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে যাই। তিনি তখন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে আমাদের আধ ঘন্টা কথা হয়েছিল। ডাঃ রায় সেদিন বলেছিলেন "মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমার পক্ষে যতখানি করা সম্ভব তা আমি করব। দিল্লীকেও সব বলব। এই সব অসহায় মানুষদের সব রকম সাহায্য করতে দিল্লীকে অনুরোধ করব।"

আমরা জ্যোতি বসুর কাছেও গিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, এ সমস্যায় আমরা আর কতটুকু করতে পারি? আমাদের হাতে তো আর ক্ষমতা নেই। যা করবার তা ডাঃ বিধান রায়ের সরকার ও দিল্লীর সরকারই করবে।"

হেমন্ত বসুর কাছে গেলাম। তিনি বললেন "আন্দোলন করে পাকিস্তানকে শিক্ষা দিতে হবে।" এজন্য হেমন্তবাবুর লোকেরা একদিন পূর্ব পাকিস্তানগামী ট্রেন অবরোধ করলেন। তারপর আমরা গেলাম ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বাড়ি। পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করে তখন কলকাতায় চলে এসেছিলেন। দাদু তাঁর প্রাথমিক ভাষণে বললেন যে, দুজন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মুখোমুখি হবার সুযোগ পেলাম। একজন আমাদের দুঃখ কষ্টের প্রতিকার করতে না পেরে স্বেচ্ছায় ঘৃণাভরে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে এসেছেন। আর একজন জীবনের ভয়ে করাচীর মন্ত্রিত্ব ছেড়েছেন। যোগনবাবু আজ আমাদের মতোই একজন অসহায় মানুষ। জানি তাঁর করার কিছুই নেই। কিন্তু মুখার্জিবাবু অন্য মানুষ। তিনি সব কিছুই করতে পারেন।

শ্যামাপ্রসাদ বললেন পূর্ববাংলা থেকে যেসব নমঃ পরিবার আসবে প্রতিটি পরিবারকে ৪/৫ কাঠা জমির ওপর একখানি চালাঘর, এক জোড়া বলদ ও একখানা লাঙল দিয়ে সীমান্ত অঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। তাদের বিনামূল্যে ছয় মাসের খাবার দেবার ব্যবস্থাও তিনি করবেন। তবে যারা ইতিমধ্যে ক্যাম্পে স্থান পেয়েছে। তারা থাকবে এর আওতার বাইরে।

শ্যামাপ্রসাদ জোরের সঙ্গে আরও বললেন—"নমঃ সম্প্রদায় হল মার্শাল সম্প্রদায়, তাদের সীমান্তে বসাতে পারলে সীমান্ত নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকবে। নমঃরা শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, যাই হোক না কেন, তাদের দেশপ্রেম, বীরত্ব ও সৎসাহস হিন্দুত্ব ও হিন্দু জাতির রক্ষাকবচ।"

এই পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করার জন্যই শ্যামাপ্রসাদ প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর (পি আর ঠাকুর) কে 'ঠাকুরনগর' নামে এক নয়া বসতি স্থাপন করতে সব রকম সহযোগিতা করেন। এই উদ্দেশ্যে শত শত বিঘা জমি ঠাকুরকে দেওয়া হয়েছিল। তিনি সেখানে বসতি করতে ইচ্ছুক এরকম পরিবারদের মধ্যে সেই জমি বিলি করে দিলেন। কিছুটা জমি নিজের জন্য রেখে সেখানে বাড়ি করে বাস করতে লাগলেন।

পি আর ঠাকুর সেই বাড়ির নাম রেখেছিলেন "The Exile" বা "নির্বাসন ভবন"। ঠাকুরের কথা মতো সীমান্তের দিকেও নমঃ সম্প্রদায়ের লোকেরা বসতি শুরু করে। উকিল মহানন্দ হালদার, অধ্যাপক পরমানন্দ হালদার, প্রধান শিক্ষক চারুমিহির সরকার (ইনি পরবর্তীকালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী হয়েছিলেন), মহেন্দ্র রায়, পূর্ববঙ্গের বিশিষ্ট সমাজপতি ভবানী গাইন সহ প্রমুখ অনেকেই ঠাকুরনগরের আশেপাশে বাড়ি তৈরি করে বসবাস করতে শুরু করেন। অধ্যাপক ও প্রাক্তন এম এল এ মণীন্দ্র বিশ্বাসও সীমান্ত এলাকা হেলেঞ্চায় বাড়ি করেন। বিশিষ্ট সর্দার সুরেন বাইন বাড়ি করেছিলেন একেবারে সীমান্তে, আংড়াইলে। বিশিষ্ট সমাজসেবী রমেন মল্লিকও সীমান্তের বগুলায় বাড়ি করেছেন। অন্য আর একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী চন্দ্রবসুকে সঙ্গে নিয়ে বগুলায় কলেজ স্থাপন করেন।

এরপর থেকে যোগেন মন্ডল শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখলেন না। তিনি নানা অছিলায় কেবলই সময় নিতে লাগলেন। ইতিমধ্যে স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন এসে গেল। শ্যামাপ্রসাদ ও যোগেনবাবু দুজনই নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এর ফলে শ্যামাপ্রসাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী আর বেশি অগ্রসর হওয়া সম্ভব হল না। এ সময়কার একটি ঘটনা আমার খুব মনে আছে। আমরা যেদিন শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম সেদিন চলে আসার সময় শ্যামাপ্রসাদ আমাকে প্রশ্ন করলেন "আচ্ছা খোকা, থাকার জন্য ঘর, চাষের জন্য হাল ও বলদ এবং বসবাস করার জন্য সাহায্য দেব। কিন্তু চাষ করার জমি পাবে কোথায়?" তখন আমার শরীর ছিল তরতাজা আর মন ছিল গরম। আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম, "দেশের জমিজমা যখন ফেলেই আসতে হবে তখন এখানে জমির অভাব হবে না। জমি আমরা খোঁজ করে নিয়ে চাষ করতে পারব।" জবাব শুনে শ্যামাপ্রসাদ খুশি হলেন, আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, এরকম যুবকই আজ হিন্দু সমাজের দরকার।"

কলকাতায় শপথ নিলাম

সে সময় অনেক নেতার সাঙ্গেই আমরা আলোচনা করেছিলাম, কিন্তু কেউই গ্রহণযোগ্য তেমন কোনো সমাধান দিতে পারেননি। কিন্তু পূর্ববঙ্গের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা সর্বত্রই আলোচিত হচ্ছিল। ডায়মন্ডহারবারে রত্নেশ্বরপুর গ্রামে নারায়ণ বিশ্বাসের বিয়েতে আমাদের অঞ্চলের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানেও আমাদের অঞ্চলের নমঃ সমাজের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। ক্রমশ আলোচনা খুব জমে গেল। নারায়ণ বিশ্বাসের সেজ দাদা রঞ্জন বিশ্বাস ছিলেন বরিশাল জেলার মাঠিভাঙা বাজারের একজন ধনী ব্যবসায়ী। পাইকারী ব্যবসা ও নিজের বসবাসের জন্য বিরাট এক টিনের তিনতলা বাড়ি তৈরি করেছিলেন। তিনি বাড়িটির নাম দিয়েছিলেন 'জয়হিন্দ ভবন'।

সেই বাড়ি ও ব্যবসা ফেলে বিশ্বাস পরিবার পশ্চিবঙ্গে এসে ছোটো একটি বাড়ি বানিয়ে ডায়মন্ডহারবারের দক্ষিণ পাশে রত্নেশ্বরপুরে বসবাস করছিলেন। মাঠিভাঙার ব্যবসা ও বাড়ি ফেলে আসার করুণ কাহিণী শোনার ইচ্ছা আমাদের সকলেরই ছিল। ওই কথার সূত্র ধরেই বিয়েবাড়িতে পরের দিন আলোচনা শুরু হয়েছিল।

আলোচনার সময় সবাই নানা সমস্যার কথা তুলল। কিন্তু সমাধান কেউ দিতে পারল না। আমরা যখন কলকাতায় ফিরছি তখন ট্রেনের মধ্যেও সেই একই আলোচনা চলল। সেই ট্রেনে বসেই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমরা পাঁচজন যুবক দেশে ফিরে যাব। পূর্ব পাকিস্তানে গিয়ে সেখানকার পরিবেশ ও পরিস্থিতি বুঝে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করার চেষ্টা চালিয়ে যাব।

আমাদের সেদিনকার সেই সিদ্ধান্তের মধ্যে কোনো খাদ ছিল না। লাভ বা লোভ বা কোনো কিছু পাওয়ার আশা ছিল না। দেশ, সমাজ ও ধর্মের ডাকে সাড়া দিয়েই সেদিনকার সে শপথ আমরা নিয়েছিলাম।

সেদিন আমাদের প্রতিজ্ঞা ছিল পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করে নিজ জন্মভূমিতে সম্মানের সঙ্গে বসবাস করার জন্য সব রকম উপায়ে চেষ্টা করে যাব। মাতৃভূমিতে স্বমর্যাদায় স্বাধীন ভাবে বাস করতে যত রকম ত্যাগ স্বীকার করতে হয় তা করব। তারপরও যদি দেশে বাস করতে না পারি তবে সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে দল বেঁধে দেশ ত্যাগ করব। পরে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই কাজ করে যাব।

এই প্রতিজ্ঞা নিয়েই শেষ পর্যন্ত বরিশাল জেলার বাটনাতলা গ্রামের শ্রী চিত্তরঞ্জন সুতার, কাইলানি গ্রামের শ্রী নিরদ মজুমদার ও সামন্তগাতী গ্রামের আমি

(কালিদাস বৈদ্য) ৫১ সালের শেষ দিকে কলকাতা ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে চলে যাই। আমাদের পরস্পরের বাড়ি ছিল ৫ থেকে ১০ মাইলের দূরত্বে।

ঢাকায় আমাদের কাজ শুরু হল

পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিলেন মহম্মদ আলি জিন্না। তিনি এতকাল বলে এসেছেন যে হিন্দু ও মুসলমান দুটি আলাদা জাতি এবং তাদের উভয়ের পক্ষে এক দেশে এক সঙ্গে বাস করা সম্ভব নয়। এই দ্বিজাতি-তত্ত্বই ছিল পৃথক পাকিস্তান গঠনের মূল ভিত্তি। হিন্দু ও মুসলমানের জন্য পৃথক পৃথক বাসস্থান চাই। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টি হবার তিনদিন আগে ১১ই আগষ্ট সেখানকার গণ পরিষদের প্রথম অধিবেশনে জিন্না এক চমকপ্রদ ভাষণ দিলেন। সবাইকে অবাক করে দিয়ে তিনি ঘোষণা করলেন যে, পাকিস্তানে হিন্দু ও মুসলমানের থাকবে সমান অধিকার, সমান মর্যাদা। তিনি আরও বললেন যে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ধর্মের কোনো স্থান থাকবে না। রাষ্ট্রের পরিচালনায় ধর্মকে টেনে আনলে তা হবে আগুন নিয়ে খেলা করার সামিল।

কিন্তু এই ঘোষণায় ইসলামি মৌলবাদীরা ভয়ানক চটে গেল। তারা জানত যে জিন্নার ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের কোনো স্থান ছিল না। তিনি যে ইসলামের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তিনি মসজিদেও যেতেন না, নামাজও পড়তেন না। রোজা পালন করা তো অনেক দূরের ব্যাপার। উপরন্তু তিনি ছিলেন শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমান। অথচ পাকিস্তানে সুন্নি মুসলমানরাই সংখ্যাগুরু। জিন্নার 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' এর ডাকে মুসলমানরা শিয়া-সুন্নি-কাদিয়ানী ভেদাভেদ ভুলে তাতে সাড়া দিয়েছিল। কারণ তা ছিল ইসলামি জেহাদের ডাক। কিন্তু পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেলের আসন থেকে জিন্না উপরিউক্ত ঘোষণা করায় সুন্নি মুসলমানরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলল।

কোরান নির্দেশ দিয়েছে মুসলমানপ্রধান দেশকে অবশ্যই ইসলামি আইনমতে শাসন করতে হবে। কিন্তু মুসলমানরা বুঝতে পারল যে, জিন্না যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন পাকিস্তানকে ইসলামি রাষ্ট্র ঘোষণা করা যাবে না। তাই বিশেষ করে সুন্নি মুসলমানরা জিন্নার আশু মৃত্যু কামনা করতে লাগল। তাঁর জীবন সংক্ষিপ্ত করার জন্য গোপন পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছিল।

মৃত্যুর পর প্রচার হল জিন্নার হয়েছিল ক্যান্সার। Larry Collins ও Dominique Lapierre তাঁদের Freedom at Midnight গ্রন্থে দাবি করেন যে, জিন্নার টিবি হয়েছিল। তাঁর দুটো ফুসফুসই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। স্বাধীনতার পরে জিন্নার নিজস্ব চিকিৎসক নাকি মন্তব্য করেছিলেন যে, তিনি আর ৬ মাসও বাঁচবেন না।

এ ইতিহাস তাঁর মৃত্যুর পরে লেখা হয়েছে পাকিস্তান সরকারের সংবাদের ভিত্তিতে। তার পরিকল্পিত হত্যাকে গোপন করতে। কিন্তু সেকথা তাঁর মৃত্যুর পূর্বে কেউই জানতেন না। তার হত্যার পরে এই অজুহাত খাড়া করা হল। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলির সঙ্গে তাঁর বিরোধ ও চাপা সংঘর্ষ শুরু হয়ে গিয়েছিল। লিয়াকৎ আলি ছিলেন সুন্নি মুসলমান ও তার বাড়ি ছিল ভারতের উত্তরপ্রদেশে। জিন্না জন্মেছিলেন গুজরাটে। ব্যারিস্টারি করতেন মুম্বাইয়ে। জিন্না ও লিয়াকত ছিলেন ভিন্ন সংস্কৃতির লোক। কিন্তু উভয়েই ছিলেন ক্ষমতালিপ্সু। তাই পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যাবহিত পর থেকেই সে দেশের এই দুই স্রষ্টা ও সর্বোচ্চ নেতার মধ্যে সংঘাত চলছিল পদে পদে।

১৯৪৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর জিন্না মারা গেলেন। পূর্বপাকিস্তানে গুজব রটে যে, তাঁকে বিষ প্রয়োগে মেরে ফেলা হয়েছে এবং লিয়াকৎ আলির গোপন চক্রান্ত অনুসারেই তা করা হয়েছে। তাঁর মৃতদেহকে সম্মান জানাতে কোনো সরকারি উদ্যোগই সেদিন করাচি বিমানবন্দরে ছিল না। উচ্চপদস্থ কোনো সরকারি কর্মচারী বা কোনো রাজনৈতিক নেতাও করাচি বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁর মৃত্যুতে পূর্ববঙ্গেও কোনো শোক জাগেনি; কারণ তিনি ঢাকায় এসে বলেছিলেন যে, পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে জিন্না এই কথা বলেছিলেন। সে সভায় শ্রোতাদের মধ্যের কিছু সংখ্যক ছাত্র সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে তার প্রতিবাদ করে পূর্ববঙ্গে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করে। সে দাবি নাস্যাৎ করে দেওয়ার ফলে জিন্নার প্রতি ক্ষোভ ও অসন্তোষ দানা বেঁধেছিল।

জিন্নার মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি পাকিস্তানকে ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। হিন্দুরা প্রতিবাদ জানাল। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা সর্বশক্তি নিয়ে সংগ্রামে নামার ডাক দিল। কিন্তু হিন্দুদের প্রতিবাদ গ্রাহ্য হল না। পাকিস্তানের গণপরিষদে লিয়াকত আলি ইসলামি শাসনতন্ত্রের মূলতত্ত্ব ও রূপরেখা পেশ করলেন। তার প্রতিবাদে পাকিস্তান কংগ্রেস দাবী করল — যদি পাকিস্তান ইসলামিক রাষ্ট্র হয় তবে পদ্মার দক্ষিণ পার হিন্দুদের জন্য ছেড়ে দিতে হবে।

কিন্তু লিয়াকৎ আলিও অকালে প্রাণ হারালেন। তিনি ছিলেন সুন্নি মুসলমান। শিয়ারা তাকে চিহ্নিত করেছিল জিন্না হত্যার মূল ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে। তা ছাড়া ভারত থেকে গিয়েই তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। এটা পশ্চিম পাঞ্জাবের

মুসলমানরা মেনে নিতে পারেনি। যাই হোক, জনসভায় বক্তৃতা দেবার সময় লিয়াকৎ আলিকে গুলি করে হত্যা করা হয়। তার হত্যার ষড়যন্ত্রকে চাপা দিতে সঙ্গে সঙ্গে তার ঘাতককে গুলি করে মারা হয়। '৫২ সালে।

জিন্নার মৃত্যুর পর পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হয়েছিলেন পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন। কিন্তু লিয়াকৎ আলির মৃত্যুর পর রাষ্ট্রপ্রধানের পদ থেকে নাজিমুদ্দিনকে সরিয়ে দিয়ে পাঞ্জাবের ঝানু ব্যুরোক্র্যাট গোলাম মহম্মদ হলেন পাকিস্তানের পরবর্তী গভর্নর জেনারেল। তিনি নাজিমুদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রী করেছিলেন। তারপরই পাকিস্তানে শুরু হয়ে যায় দাবা খেলার রাজনীতি।

পাঞ্জাবিদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করার চিন্তা প্রথম করেন এই গোলাম মহম্মদ। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীতে পাঞ্জাবিরাই ছিল প্রধান। তারাই ছিল জেনারেল। সামরিক শক্তির বলে বলীয়ান হয়ে পাঞ্জাবিরা পাকিস্তানে সর্বাঙ্গীন আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করল। বাস্তবে রাষ্ট্রক্ষমতা ধীরে ধীরে পাঞ্জাবিদের হাতেই চলে গেল। খুব সহজেই এই কাজ সুসম্পন্ন হল। কারণ পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর মতো আমলা বাহিনীও ছিল পাঞ্জাবি মুসলমানে ভরা ও তাদের প্রাধান্য ছিল সর্বত্র।

পক্ষান্তরে বাঙালিরা ছিল কোনঠাসা। কোনো বড় পদে তারা ছিল না। এই কারণে বাঙালি মুসলমানদের মনে জেগেছিল ক্ষোভ। তা থেকেই এল স্বায়ত্তশাসনের দাবি। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংখ্যাগুরু হয়েও তাদের স্বায়ত্বশাসনের দাবি জানাতে হল, এ এক আশ্চর্য ঘটনা।

পরে প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন নূতনভাবে শাসনতন্ত্রের মূল নীতি প্রকাশ করলেন। তাতে ইসলামি শাসনতন্ত্র অব্যাহত থাকল। কিন্তু পাঞ্জাবিদের আধিপত্য খর্ব করার কিছু প্রস্তাব রাখা হল। এই কারণে গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদ প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে নাজিমুদ্দিনকে তাড়িয়ে দিলেন এবং বাগুড়ার মদম্মদ আলিকে সেই পদে বসালেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি গণপরিষদও ভেঙে দিলেন। গোলাম মহম্মদ শাসনতান্ত্রিক হুকুম জারি করে এক কনভেনশন ডাকলেন। তিনি নিজেই পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়ন করে তা ঐ কনভেনশনকে দিয়ে পাশ করিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন। এটা ১৯৫৫ সালের কথা। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট গভর্নর জেনারেলের আদেশটিকেই খারিজ করে দিল। সুপ্রিম কোর্ট রায় দিল যে, সংবিধান প্রণয়নের জন্য নতুন করে গণপরিষদ গঠন করতে হবে।

এর পর প্রাদেশিক আইনসভাগুলির সদস্যদের ভোটে পাকিস্তানের নয়া

গণপরিষদও ইসলামি শাসনতন্ত্র অনুমোদন করল। অবশেষে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান ইসলামি রাষ্ট্ররূপে ঘোষিত হল। নতুন সেই গণপরিষদে পাকিস্তানের সদস্য ছিলেন মোট ৮০ জন। তাঁদের মধ্যে মুসলিম লিগের ছিলেন ২৩ জন, যুক্তফ্রন্টের ১৬ জন, আওয়ামি লিগের ১৩ জন, কংগ্রেসের ৪ জন, সিডিউল কাস্ট ফেডারেশনের ৩ জন, ইউ পি এফ-এর ২ জন ও অন্যান্য ১৬ জন।

এই রকম পটভূমির শুরুতেই আমরা তিনজন যুবক কলকাতা থেকে ঢাকায় গেলাম। চিত্তরঞ্জন সুতার, নীরদ মজুমদার ও আমি। তখন ১৯৫১ সালের শেষ দিক। নীরদবাবু ও চিত্তরঞ্জন সুতার সমাজসেবার কাজে যোগ দিলেন। আমি ভর্তি হলাম ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের এম বি বি এস-এর প্রথম বর্ষে। আমাদের তিনজনের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চিত্তবাবু ও নীরদবাবু সমাজসেবার মাধ্যমে গণসংযোগ গড়ে তোলার চেষ্টা করতে লাগলেন। আমি নিলাম ছাত্রদের মধ্যে গণসংযোগ গড়ে তোলার কাজ। তখন ঢাকার সীমানা ও বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা ছিল সীমিত। ছাত্ররাই সব বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করত।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে তখন অল্প সংখ্যক হিন্দু ছাত্র ছিল। তা সত্ত্বেও তারা মুসলিম মৌলবাদী ছাত্রদের রুখে দিত। এই কারণে ঐ সব মৌলবাদী মুসলমান ছাত্ররা কোনোদিনও কলেজের ছাত্র ইউনিয়নটি দখল করতে পারেনি। তার ফলে আমি যতদিন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ও মেডিক্যাল অফিসার ছিলাম ততদিন পর্যন্ত ছাত্র ইউনিয়ন আমাদের মতানুসারেই চলত। মৌলবাদীরা যাতে ছাত্র ইউনিয়নের কর্তৃত্ব না পায় সেজন্য আমাদের খুবই সতর্ক থাকতে হত এবং খাটতেও হত। তবে নির্বাচিত ইউনিয়ন আমাদেরই বেশি সমীহ করত। এই কারণে আমরা ঢাকা ছাত্র আন্দোলনের কর্মকর্তা না হলেও ওই আন্দোলনের নেতারা আমাদের কথা ছাড়া চলতে পারত না।

পর্দার আড়ালে থেকেই আমাদের কাজ করতে হত। ঢাকার ছাত্র আন্দোলনের মূল ঘাঁটি ছিল মেডিক্যাল কলেজ। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় থেকেই এটা চলে আসছিল, কারণ মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। আমরা জড়িত ছিলাম যুব লিগের সঙ্গে। একদিকে যুব লিগ ও ছাত্রদলের চাপে ফজলুল হক, শহীদ সুরাবর্দি এবং মওলানা ভাসানি এক হয়ে ২১ দফা দাবির ভিত্তিতে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে পূর্ববঙ্গের বিধানসভার নির্বাচনে নামলেন। সেদিন ঐ তিন নেতার ওপর সব থেকে বেশি চাপ সৃষ্টি করেছিল মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ইউনিয়নসহ ছাত্ররা।

পূর্ববঙ্গের বিধান সভায় নির্বাচন পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ভিত্তিতে হয়েছিল। বিধান সভায় মুসলিম আসন ছিল মোট ২৩৮টি। তার মধ্যে ২২৭ টি পেল যুক্তফ্রন্ট। মুসলিম লিগ পেয়েছিল মাত্র ১০টি আসন আর খিলাফৎ পার্টি পেয়েছিল মাত্র ১টি আসন। হিন্দুদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল ৭২টি আসন। তার মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছিল ২৪ টি আসন, সিডিউল্ড কাষ্ট ফেডারেশন পেয়েছিল ২৭টি। বাকিদের মধ্যে ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ পার্টি ১৩টি, গণতন্ত্রী দল ৩টি, কমিউনিস্ট পার্টি ৪টি ও নির্দল ১টি আসন পেয়েছিল। একমাত্র বিজয়ী ঐ নির্দল প্রার্থী ছিলেন চিত্তরঞ্জন সুতার। হিন্দুরা যুক্তফ্রন্টকেই সর্বত্র সমর্থন করেছিল।

নীরদবাবু এবং আমি চিত্তবাবুকে ভোটে দাঁড়াতে রাজি করিয়েছিলাম। চিত্তবাবু প্রথমে প্রার্থী হতে চাননি। নীরদবাবু বললেন যে, তিনি চিত্তবাবুর কথা যত সহজে হিন্দু সমাজের সামনে বলতে পারবেন চিত্তবাবু নিজে তা পারবেন না। নীরদবাবু সেভাবেই গ্রামে গ্রামে ঘুরে চিত্তবাবুর হয়ে প্রাক নির্বাচনী প্রচার যুদ্ধ চালালেন। আমি অনেক আগে থেকেই হিন্দু ছাত্র মহলে চিত্তবাবুর হয়ে প্রচার করে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিলাম যাতে হিন্দু সমাজের কাছে তিনি গ্রহণযোগ্য হন। এই কাজে আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন বাটনাতলা হাইস্কুলের শিক্ষক নগেন্দ্রনাথ মণ্ডল এবং আরও কয়েকজন।

সে সময় রাজনৈতিক দলের চেয়েও সমাজের বিশেষ বিশেষ লোকের কথা মানুষ বেশি শুনত। ঐ রকম ব্যক্তিরা যদি এক হয়ে কোনো প্রার্থীকে সমর্থন জানাতেন তা হলে সেই প্রার্থী ভোটে জিতে যেতেন। চিত্তবাবুর জন্য এরকম ব্যক্তিদের সমর্থন জোগাড় করেছিলেন নগেন মণ্ডল ও নীরদবাবু। আমি নিয়েছিলাম ছাত্র সমাজের সমর্থন যোগাড় করার ভার।

চিত্তবাবুর সমর্থনে সামাজিক মতামত প্রকাশের সভা বসেছিল পিরোজপুরের চালিতাখালির সতীশ মজুমদারের বাড়িতে। আমি ঢাকার ছাত্রদের সমর্থনের কথা জানাতে কয়েকজন ছাত্র নেতাকে সঙ্গে নিয়ে ঐ সভায় উপস্থিত হয়েছিলাম। চিত্তবাবুর প্রধান বিরোধী প্রার্থী ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ক্ষীরোদ কবিরাজ। নীরদবাবু ও যোগেন ঢালির চেষ্টায় ক্ষীরোদবাবু শেষ পর্যন্ত নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন এবং চিত্তবাবুকে সমর্থন জানালেন। এইভাবে চিত্তবাবুর পথ পরিষ্কার হয়ে গেল।

এভাবে সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েই চিত্তবাবু নির্দল প্রার্থী হয়েও বিপুল ভোটে জিতে গেলেন। চিত্তবাবুর বিরোধী অন্যান্য প্রার্থীদের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক রায়সাহেব ললিত কুমার বল, প্রাক্তন বিধায়ক উপেন্দ্রনাথ এদবর, পূর্ব পাকিস্তান

সিডিউল্ড কাস্ট ফেডারেশনের সভাপতি রাজ কুমার মণ্ডল এবং যোগেন মণ্ডলের শিষ্য হরবিলাস বসু। তাদের প্রত্যেকের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়।

চিত্তবাবুর নিজের গুণ ছিল অনেক। সেইজন্যই তাঁকে প্রার্থী করার কথা আমরা ভেবেছিলাম। তাঁর নিজস্ব গুণ, আমাদের প্রচেষ্টা ও সমাজের সমর্থনের জন্য তিনি নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন। তিনি কৃতিত্বের সঙ্গেই লড়াই করেছিলেন। ভোট যুদ্ধে তাঁকে নিজের টাকা খরচ করতে হয়নি। সমস্ত খরচই সমাজের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বেচ্ছায় বহন করেছিল।

প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের পরই এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল। সে মন্ত্রিভায় কোনো হিন্দুকে নেওয়া হয়নি। সরকার গড়ার দু মাসের মধ্যেই হক সাহেব গিয়েছিলেন কলকাতায়। সেখানে তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে বললেন যে, দুই বাংলার সীমানা তিনি মানেন না। কলকাতার এই প্রকাশ্য সভায় তিনি এই বক্তব্য রেখেছিলেন হিন্দুদের বোকা বানানোর উদ্দেশ্যে। কিন্তু ফজলুল হক কলকাতায় ঐ কথা বলে ঢাকা ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে তাঁকে বরখাস্ত করেছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ইস্কান্দর মির্জা। তিনি সংবিধানের ৯২ (ক) ধারা বলে পূর্ব পাকিস্তানে গভর্নরের শাসন জারি করলেন। এই গভর্নরের শাসন এক বছর বলবৎ ছিল। সুপ্রিম কোর্টের আদেশে ১৯৫৫ সালে পাকিস্তানে নতুন গণপরিষদ গঠিত হবার পরই আবার গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয়। এর পরই পাকিস্তানে বহু পালা বদলের ঘটনা ঘটে।

এই পালা বদলের মধ্যেও হিন্দু নির্যাতন সেখানে থামেনি। রাজশাহী জেলার নাচোলে কৃষক আন্দোলনে গ্রেপ্তার হন কম্যুনিস্ট নেত্রী শ্রীমতি ইলা মিত্র (১৯৪৮) । তার উপরে চলে পুলিশি পাশবিক অত্যাচার। জেলখানায় তার স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ে এবং অন্তিম মুহূর্তে তাঁকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিক্যেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। তখন তাঁর শরীরে রক্তের জরুরি প্রয়োজন হলে মেডিক্যেল কলেজের ছাত্র জ্ঞানবালা, আলমগীর, আমি ও আরও তিনজন হিন্দু ও মুসলমান ছাত্র রক্ত দেই। তাতে তিনি বেঁচে যান। তিনি ছিলেন প্রোফেসর কে এস আলমের চিকিৎসাধীন। পরবর্তীকালে আরও রক্ত দিতে হয়। তখন হিন্দু মুসলমান ছাত্ররা মিলিত ভাবে রক্ত দেয়। পরে প্রোফেসর আলমের একখানা গোপন পত্র নিয়ে এসে আমি কলকাতায় তার স্বামীকে দেই। তাতে লেখা ছিল "শ্রীমতি মিত্রকে বাঁচাতে হলে তাঁকে জেলমুক্ত হয়ে পাকিস্তানের বাইরে যেতে হবে। আপনি ডঃ বিধান রায়কে বলে তার জন্য কলকাতায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করান। আমি সুপারিশ করব

যাতে তিনি কলকাতায় যেতে পারেন।" পরে সেভাবেই তিনি চিকিৎসার জন্য কলকাতা এসে আর ফিরে যাননি।

আর একটি ঘটনা হল দেশপ্রেমিক স্বনাম ধন্য নেতা সতিন সেনের মর্মান্তিক মৃত্যু। ৯২ক ধারা জারি হওয়ার পরে দেশদ্রোহের অপরাধে তাঁকে ১৯৫৪ সালে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর উপরে চলে নারকীয় অত্যাচার। ফলে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে এবং অন্তিম মূহর্তে তাঁকেও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠায়। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অবধারিত মৃত্যু জেনেই মেডিকেল কলেজের ছাত্র বিমল সিংহ ও আমি সব হিন্দু নেতাসহ অনেক মুসলিম নেতাকে খবরটি জানাই। সেদিন কোনো হিন্দু নেতা তাঁকে দেখতে আসার সাহস পাননি। পরের দিন তিনি মারা যান। তবে হাসপাতালে দেখতে না গেলেও শ্মশানে সব হিন্দু নেতাসহ বহু সাধারণ হিন্দুরা খুব বেশি সংখ্যায় যায় ও তাদের শেষ শ্রদ্ধা জানায়। তাঁর কোনো শোক বা স্মরণ সভা হল না কেননা সে সভায় সরকারের বিরুদ্ধে জোরালো ভাষায় প্রতিবাদের বক্তব্য রাখতে হবে। তা বলার সাহস হিন্দুদের ছিল না। এ দুটি ঘটনায় দেখা যায় মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা তখন অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার জন্য হিন্দু মুসলমান একত্রে রক্ত দিল। কিন্তু মুসলিম রাজনীতিবিদরা অসাম্প্রদায়িক হয়ে শ্রী সেনের মৃত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারলেন না।

ইসলামিক পাকিস্তান ও হিন্দু লবি

নতুন গণপরিষদ গঠিত হবার পর পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক, উভয় স্তরের মন্ত্রিসভার অদলবদল শুরু হয়ে যায়। পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন পাঞ্জাবের চৌধুরী মহম্মদ আলি। পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হলেন ফজলুল হকের কে এস পি পার্টির আবু হোসেন সরকার। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পদ নিয়েও সংঘাত বেধেছিল মুসলিম লিগ, কে এস পি ও আওয়ামি লিগের মধ্যে। অনেক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত মুসলিম লিগের চৌধুরী মহম্মদ আলি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলেন এবং তাঁরই আশীর্বাদে ও গভর্নর ফজলুল হকের প্রচেষ্টায় আবু হোসেন সরকার পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী পদ পেলেন।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক, এই দুই মন্ত্রিসভাতেই হিন্দু মন্ত্রীর সংখ্যা ছিল ভালো। তবুও চৌঃ মহম্মদ আলি গণপরিষদে ইসলামি শাসনতন্ত্রের খসড়া পেশ করলেন। তখন ১৯৫৫ সাল।

ঐ খসড়া প্রস্তাব পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু মহলে প্রতিবাদের ঝড় উঠলো কয়েকজন হিন্দু মন্ত্রী সরকার থেকে পদত্যাগও করেছিলেন। বিশেষ করে কংগ্রেসে

মন্ত্রীরা। কিন্তু ইউ পি পি ও সিডিউল্ড কাস্ট ফেডারেশনের কিছু সংখ্যক মন্ত্রী ও সদস্যদের সমর্থনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক, দুই সরকারই টিকে গেল। ফলে পাকিস্তানে ইসলামি শাসনতন্ত্র গৃহীত হল। কিন্তু পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা গেল না। নির্বাচনের ধারাটি মুলতুবি থাকল। পরে সুরাবর্দি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলে যুক্ত নির্বাচনের ধারা পাশ করানো হয়।

হিন্দুরা যদি সেই সময় ঐক্যবদ্ধ থাকত এবং এক সঙ্গে বিরোধিতা করত তবে গণপরিষদে ইসলামি শাসনতন্ত্র গৃহীত হওয়া সম্ভব ছিল না। পক্ষান্তরে মুসলিম লিগ ও অন্যান্য দলের মধ্যে মন্ত্রিত্ব নিয়ে ভীষণ দলাদলি থাকলেও ইসলামি শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে সব মুসলমান সদস্যই ছিল এক কাট্টা। তারা হিন্দুদের মন্ত্রিত্বের পদ দিয়ে ও অন্যান্য লোভ দেখিয়ে ভোলালেন। এই কৌশলে তাঁরা ইসলামি শাসনতন্ত্র পাশ করিয়ে নিলেন।

যোগেন মণ্ডলের আমল থেকেই পূর্ববঙ্গের হিন্দু সমাজে ফাটল ধরেছিল। হিন্দু সমাজে বর্ধিষ্ণু ও অনুন্নতদের মধ্যে ভেদ ছিল। দীর্ঘদিন ধরেই বর্ধিষ্ণু হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রচার চালানো হচ্ছিল তফসিলি হিন্দুদের মধ্যে। ফলে দুই বর্ণের মিলন সেতু প্রায় ভেঙ্গে পড়েছিল। চিত্তরঞ্জন সুতার বিধানসভার সদস্য হবেই দুই বর্ণকে মিলিত করে একসঙ্গে চলার ডাক দিলেন। চিত্তবাবুর সুবিধা ছিল তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের বাঁধনে বাঁধা ছিলেন না। নির্বাচনে নির্দল প্রার্থী হিসাবেই তিনি বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছিলেন। কাজেই ঐ মিলনের ডাক দেওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল।

ঢাকার হিন্দু ছাত্রসমাজ চিত্তবাবুকে সমস্ত রকম সমর্থন ও সাহায্য দিতে এগিয়ে এসেছিল। ফলে চিত্তবাবুও একটা শক্ত ভিত পেয়ে গেলেন। তাঁর নিজের অনেক গুণ ছিল। তিনি সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে গুছিয়ে কাজ করতে পারতেন। তিনি পারতপক্ষে ঢাকায় বেশিদিন বাস করতেন না। বিধানসভার অধিবেশনে যোগ দিতে বা অন্য কোনো জরুরি কাজেই ঢাকায় আসতেন। বরিশাল জেলার বাটনতলা গ্রামের বাড়িতেই তিনি বাস করতেন।

চিত্তবাবুর অবর্তমানে ঢাকায় সমস্ত যোগাযোগ আমাকেই করতে হত। আমি ও চিত্তবাবু এক সঙ্গে বসে আলোচনা করে একমত হয়ে কাজ করতাম। আমাদের কারও কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল না, তাই মতের অমিলও হত না। এক মত হয়েই আমরা ভাবী কর্মসূচি স্থির করতাম। চিত্তবাবু ছিলেন জনগণের স্বীকৃত প্রতিনিধি আর আমি ছিলাম তাঁর একজন একান্ত সমকর্মী বন্ধু।

বয়সে চিত্তবাবু আমার থেকে এক-দুই বছরের বড় ছিলেন, কিন্তু আমাদের

চিন্তাধারা, কর্মধারা ও জীবনধারা ছিল একই। কলকাতা থেকে আমরা একই উদ্দেশ্যে এবং একই ভাবধারা নিয়ে একসঙ্গে পূর্ববঙ্গে গিয়েছিলাম। বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন হলে আমি বরিশালের বাটনতলা গ্রামে চিত্তবাবুর বাড়িতে চলে যেতাম। সেখানে নীরদবাবু, আমি, আরও কয়েকজন এবং চিত্তবাবু একসঙ্গে আলোচনা করতাম। ভবিষ্যত কর্মসূচী স্থির করতাম এবং অন্যান্য জরুরি সিদ্ধান্ত নিতাম। এই সময়ে আমাদের কাঁধে দুটো প্রধান দায়িত্ব এসে পড়েছিল। প্রথম দায়িত্ব হল সব হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করা। দ্বিতীয় দায়িত্ব হল পাকিস্তানের সংবিধানে হিন্দুর স্বার্থ সুরক্ষিত করা।

এই দুই দায়িত্ব পালনের পথে বহু অন্তরায় ছিল। প্রথমত পূর্ববঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায় ছিল রক্ষণশীল। তাই উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মিলন ঘটানো ছিল খুবই কঠিন কাজ। দ্বিতীয়ত্র হিন্দুদের মধ্যে ছিল রাজনৈতিক অজ্ঞতা ও ব্যক্তিস্বার্থ। এই রক্ষণশীলতা ও ব্যক্তিস্বার্থের কারণেই হিন্দুরা অনেক সুযোগ পেয়েও তাকে গ্রহণ করতে পারেনি, কাজে লাগাতে পারেনি। তা দেখে আমরা শুধু অবাক হতাম তাই নয়, দুঃখও পেতাম প্রচুর।

হিন্দুর চরম দুর্দিনের সময়ও আমরা দেখেছি যে, যুগান্তর পার্টি তথা কংগ্রেস ও প্রোগ্রেসিভ পার্টি তথা অনুশীলন সমিতি কখনও একসঙ্গে বসত না। সিডিউল কাস্ট ফেডারেশনও একা থাকত। কিন্তু চিত্তবাবুর নেতৃত্বে ছাত্রসমাজ তাদের একত্রে বসার জন্য চাপ দিতে শুরু করল। তার ফলে মাঝে মধ্যে তারা একত্রে বসতে শুরু করল। কিন্তু ব্যক্তিস্বার্থ ও পার্টিস্বার্থ এত প্রবল ছিল যে তাকে দমিয়ে রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হত না। তা সত্ত্বেও বহু চেষ্টার পর আমরা মাঝে মাঝে একত্রে বসাতে পেরেছিলাম। তাতে প্রথম দিকে কিছু কাজ হয়েছে বটে, তবে শেষরক্ষা হয়নি।

হিন্দুদের একজন সুপরিচিত নেতা ছিলেন কামিনী কুমার দত্ত। মন্ত্রিত্ব পদে টিকে থাকার জন্য তিনি মুসলমানদের তোষণ করে বক্তৃতা দিতেন। তিনি বলতেন যে, ইসলামের অর্থ হল শান্তি, তাই ইসলামি পাকিস্তান হল শান্তির পাকিস্তান। 'ইসলাম' একটি আরবী শব্দ এবং দুটো অর্থ হয়, শান্তি ও আত্মসমর্পণ। যেখানে মুসলমানরা সংখ্যালঘু সেখানে তারা ইসলামকে শান্তি বলে চালাতে চায়। কিন্তু যেই তাদের সংখ্যা বেড়ে যায় তখন ইসলাম আর শান্তি থাকেনা, আল্লার কাছে আত্মসমর্পন হয়ে যায়। অর্থাৎ কোনো বিধর্মীকে তখন বেঁচে থাকতে হলে আল্লার কাছে আত্মসমর্পন করতে হবে বা সোজা বাংলায় মুসলমান হতে হবে। এর সঙ্গে তিনি আরও বলতেন যে, 'পাক' শব্দের অর্থ হলো পবিত্র, তাই পাকিস্তানের অর্থ

হল পবিত্র স্থান। সেই পবিত্র ও শান্তির পাকিস্তানে হিন্দুদের ভয়ের কোনো কারণ থাকতে পারে না।

প্রাক পরাধীনতার আমলে কামিনীবাবু ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী ও কংগ্রেস নেতা। বহুবার তিনি জেলও খেটেছিলেন। কিন্তু মন্ত্রিত্বের লোভে তিনি তাঁর সেই ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিলেন। ইসলামি শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের এক জোরদার সমর্থক হয়ে গেলেন।

এ রকমই আর এক হিন্দু নেতা ছিলেন প্রভাস লাহিড়ী। আবু হোসেনের সরকারে মন্ত্রী হবার জন্য তিনি লালায়িত ছিলেন। ঐ সরকারকে সমর্থন করার জন্য তিনি যুক্তি দিলেন যে, কোলকাতা দাঙ্গার নায়ক সুরাবর্দির আওয়ামি লিগকে সমর্থন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আবু হোসেনের সরকারের মন্ত্রী হয়ে তিনি ইসলামিক শাসনতন্ত্র পাশ করতে সাহায্য করলেন।

যে সংগ্রামের শপথ নিয়ে আমরা কলকাতা থেকে ঢাকার গিয়েছিলাম, অচিরেই সে সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের কম্পাউণ্ডের মধ্যে একটি ব্যারাকের তিনটি ঘরে আমরা দশ বারোজন হিন্দু ছাত্র থাকতাম। হঠাৎ একদিন সকালে একদল উদ্ধত শ্রমিক এসে সেই ঘরগুলোর চাল খুলতে শুরু করল। আমরা বারণ করলাম, কিন্তু তারা আমল দিল না। তারা বলল যে, অধ্যক্ষের হুকুমেই তারা কাজ করছে, তাই কারও বাধা তারা মানবে না। তারা বলল, পারিশ্রমিক নিয়েই কতৃপক্ষের হুকুমে তারা কাজ করবে।

শেষ পর্যন্ত আমাদের হুমকিতে তারা ঘর ভাঙা বন্ধ করল। আমরা অধ্যক্ষ এ কে এম ওয়াহেদ সাহেবকে গিয়ে সব বললাম। ওয়াহেদ সাহেব দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গ থেকে ঢাকায় এসে মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। তিনি কলেজের সেক্রেটারি, ক্লার্ক ও আর্দালিকে সঙ্গে করে আমাদের হোস্টেলে এলেন। এসেই আমাদের ধমক দিতে শুরু করলেন। আমরা সবিনয়ে অত্যন্ত নম্রভাবে বললাম হোস্টেল ভেঙে দিলে আমরা কোথায় থাকব সেই ব্যবস্থা আগে করে তারপর ঘর ভাঙুন। জবাবে তিনি পরিষ্কার ভাবে বললেন — সে সব আমি দেখতে পারব না। তোমাদের ব্যবস্থা তোমাদেরই করে নিতে হবে। ওখানে নার্সদের থাকার ঘর হবে।

আমরা বললাম সে সুযোগ আমাদের নেই। তিনি তখন আদেশ দিয়ে বললেন "তোমরা কালীবাড়িতে চলে যাও।" আমরা জবাব দিলাম — পাশের হোস্টেলের মুসলমান ছাত্ররা যেদিন মসজিদে গিয়ে বাস করবে, আমরাও সেদিন কালীবাড়িতে চলে যাব। জবাব শুনে অধ্যক্ষ বেশ চটে গিয়ে বললেন — "মনে রেখো, you

are not the deserving elements of Pakistan" অন্য ছাত্ররা চুপ করে থাকল, কিন্তু আমি অধ্যক্ষের মুখের ওপর বললাম — No sir, we are the deserving elements of Pakistan as we are the sons of the soil of East Bengal. But you are not the deserving element here as you have come from India.

এই জবাব শোনার পর অধ্যক্ষ আর একটি কথাও না বলে চুপচাপ কলেজের অফিসে ফিরে গেলেন। বিকালে তিনি খবর পাঠালেন যে, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হস্টেলে সাময়িকভাবে আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে তিনি আমাদের পাকা ব্যবস্থা করে দেবেন। এই আশ্বাস পেয়ে আমরা ঘর ছাড়লাম।

১৯৫৮ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন রেফায়েতুল্লা সাহেব। তিনি হোস্টেলের হিন্দু ছাত্রদের একটি চিঠি দিয়ে জানালেন যে, মুসলিম ছেলেরা হিন্দু ব্লকে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠানে আপত্তি জানিয়েছে। তাই এবার ওখানে আর সরস্বতী পূজা করতে দেওয়া হবে না। হোস্টেলের বাইরে কোথাও তাদের পূজার ব্যবস্থা করতে হবে।

সে সময়ে আমি হোস্টেলের আবাসিক ছিলাম না। হোস্টেলের পাশেই ঢাকা জগন্নাথ হলের প্রভোষ্ট ডঃ জি.সি দেবের বাড়িতে থাকতাম। খবর পেয়ে হোস্টেলে গেলাম। সবাই বসে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে হস্টেলেই পূজা হবে, নয় তো পূজা হবে মেডিক্যাল কলেজে। এ ব্যাপারে অধ্যক্ষের সঙ্গেও কথা বললাম। আমরা তাঁকে বললাম যে, কোনো মুসলমান ছাত্রই সরস্বতী পূজায় বাধা দেবে না, কেন না প্রতি বছরই হিন্দু ও মুসলমান ছাত্ররা এক হয়ে পূজার আনন্দ উপভোগ করে। অধ্যক্ষ তবুও অনুমতি দিলেন না। আমরা তখন বললাম যে, তা হলে কলেজ কম্পাউণ্ডে পূজা করতে দিন। তিনি বললেন — "হোস্টেলে তোমাদের ব্লকেই বাধা আসছে। কলেজে তো আরও বেশি বাধা দেবে"।

জবাবে আমরা বললাম—হাসপাতালের ওপরের একটা ঘরকে মসজিদ করা হয়েছে এবং প্রতিদিন ও প্রতি শুক্রবার সেখানে অনেকে নামাজ পড়ছে, আর আমরা পূজা করতে পারব না? পূজা আমরা করবই। কলেজের নতুন অডিটোরিয়ামে পূজা করেই এটা উদ্বোধন করব। দেখব কারা বাধা দেয়।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের মত নিয়ে ওই কলেজেই শেষ পর্যন্ত সরস্বতী পূজা হল। সে পূজায় নাটকের অভিনয় হয়েছিল এবং বেশ কয়েকজন মুসলমান ছাত্রছাত্রীও তাতে অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু কেউ কোনো বাধা দেয়নি।

এই সব ঘটনার কয়েক বছর আগেই হিন্দু ছাত্ররা মেডিক্যাল কলেজে একটা হিন্দু লবি গঠন করেছিল। পরে তা ধীরে ধীরে জগন্নাথ হল ও ঢাকা হলে প্রসারিত হল। ক্রমে গোটা ঢাকা শহরেই এই লবি কাজ শুরু করে দিল।

চিত্তবাবুকে পেয়ে হিন্দু ছাত্রদের ওই লবি শক্তিশালী হয়েছিল। চিত্তবাবু ও আমি ওই লবির সঙ্গে পরামর্শ করেই সব কাজ করতাম। এই ভাবে চিত্তবাবুকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানে গড়ে উঠেছিল শক্তিশালী এক হিন্দু লবি।

এই হিন্দু ছাত্র লবির সঙ্গে যুক্ত হয়ে চিত্তবাবু নিজেও সাহস ও শক্তি পেয়েছিলেন। তাঁর বয়স তখন ২৫/২৬ বছর। তিনি ছিলেন বিধান সভার সর্ব কনিষ্ঠ সদস্য। যেমন সাহসী, তেমনই সহজ সরল, যুক্তিবাদী ও সত্যবাদী। একজন সত্যনিষ্ঠ রাজনৈতিক ব্যক্তি ছিলেন তিনি। দৃষ্টি ছিল তাঁর সুদূরপ্রসারী। অল্প সময়ের মধ্যেই চিত্তবাবু সুনাম অর্জন করেছিলেন। ত্যাগ ও তিতিক্ষা ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। তিনি বলতেন, যার টাকাকড়ি, গাড়ি, বাড়ি, টেলিফোন ও নারী থাকে সে জনগনের কথা ভুলে যায়। তখন চিত্তবাবু বিয়ে করেননি। আর এসব কিছুই তার ছিল না।

সে সময়ে ভারত ও বাংলাদেশ ভাগ হওয়ার পরও 'পূর্ববঙ্গ' নামটি সরকারিভাবে প্রচলিত ছিল। ফজলুল হকই উদ্যোগ নিয়েছিলেন 'পূর্ববঙ্গ' শব্দটি সম্পূর্ণ বাতিল করে 'পূর্বপাকিস্তান' শব্দটি সর্বতোভাবে বলবৎ করতে। তিনিই উদ্যোগ নিয়েছিলেন ইসলামি রাষ্ট্র পাকিস্তানে যাতে মুসলমান ছাড়া আর কেউ রাষ্ট্রপ্রধান না হতে পারে সংবিধানে সেই ব্যবস্থা পাকা করতে। তিনি এই সব অপচেষ্টা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদে হিন্দু লবি গর্জে উঠেছিল। সে প্রতিবাদে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন সুতার। আবু হোসেন সরকারের পতনের দাবিতে জনগণও মুখর হয়েছিল। কেন্দ্রের ও প্রদেশের দুই সরকারই টিকে ছিল হিন্দুদের সমর্থনের ওপর। হিন্দু লবি হিন্দু মন্ত্রীদের চাপ দিল মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেবার জন্য। জবাবে মন্ত্রী কামিনীকুমার দত্ত বলেছিলেন—ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থ শান্তির রাষ্ট্র; জিম্মির অর্থ পবিত্র আমানত। ইসলামের দৃষ্টিতে অ-মুসলমানরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, জিম্মি ও কাফের। কোনো মুসলমান শাসিত রাষ্ট্রে বিশেষ কর (জিজিয়া) এর বদলে যাদের সীমিতকাল বেঁচে থাকার অধিকার দেওয়া হয় তারা জিম্মি। জিম্মিদের কাছ থেকে গৃহীত সেই কর এবং নানা উৎপীড়নের দ্বারা লব্ধ অর্থই হল পবিত্র আমানত। পক্ষান্তরে কাফেরদের সামনে মাত্র দুটো রাস্তা খোলা আছে— হয় মৃত্যু, নয় ইসলাম গ্রহণ। পাকিস্তানে হিন্দুরা "জিম্মি" বলে গণ্য হত।

মন্ত্রী এ. কে. দাস আমাকে বলেছিলেন—কালিদাস, আমি আসামে ও পাকিস্তানে পাঁচবার মন্ত্রী হবার আমন্ত্রণ পেয়েছি এবং চার বার মন্ত্রী হয়েছি। তোমার মতো এভাবে ধমক দিয়ে আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে মন্ত্রিত্ব ছাড়ার কথা বলতে সাহস পায়নি। মন্ত্রী মধুসূদন সরকার বলেছিলেন যে, যদি সব হিন্দু মন্ত্রী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে তাহলে তিনিও ইস্তফা দেবেন। মন্ত্রী প্রভাস লাহিড়ি বলেছিলেন —'আমি কিছুতেই কলকাতা দাঙ্গার নায়ক সুরাবর্দির আওয়ামি লিগকে সমর্থন করতে পারব না। অর্থাৎ আবু হোসেন সরকারকে ফেলে দিয়ে বিকল্প সরকার গড়তে তিনি সাহায্য করবেন না। যদি সেদিন সব হিন্দু মন্ত্রীরা মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করত তাহলে 'ইসলামি রাষ্ট্র' পাশ হত না।

মন্ত্রী শরৎ মজুমদারের কাছে গেলাম। তিনি বললেন যে, তিনি মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দেবেন এবং কংগ্রেসের সব মন্ত্রীই পদত্যাগ করবেন। এইসব কথাবার্তা যখন চলছে তখন পতনোন্মুখ আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রী মোস্তাক গাউসল হক শরৎ বাবুর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। তিনি শরৎ বাবুকে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করতে বারণ করলেন। আমি ছাত্রদের তরফ থেকে তখন হক সাহেবের মুখের উপর বলেছিলাম—যে, ইসলামি রাষ্ট্রে হিন্দুরা জিম্মি হয়ে থাকবে, শরৎ বাবু মন্ত্রিত্বের লোভে তেমন এক রাষ্ট্রের জন্য সংবিধান করতে সাহায্য করবেন? এ কথা আপনারা চিন্তা করেন কি করে? মোস্তাক গাউসল হক উত্তর দিয়েছিলেন — হিন্দুদের ভয়ের কোনো কারণ নেই, কারণ ইসলামের মানে শান্তি আর জিম্মি মানে পবিত্র আমানত।

জানি না কোথা থেকে সেদিন শক্তি ও সাহস পেয়েছিলাম। শরৎবাবুর সামনেই হক সাহেবকে বললাম you shut up । আমরা জিম্মি হয়ে বাস করব না। আমরা স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হয়েই বাস করব। আপনাদের দয়ার উপর নির্ভর করে বাস করতে চাই না।

মন্ত্রী মোস্তাক গাউসল হক শরৎবাবুর সামনে নিজের সম্মান বাঁচাতে সেদিন বলেছিলেন—হিন্দু যুবকদের মনোবল দেখে আমি খুব খুশি হলাম।

এই মনোবল এমনিতে আসেনি। তার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল। হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করতে দিনরাত খাটতে হয়েছিল। হিন্দুদের মধ্যে দলাদলি, ভাগাভাগি, এমন কি নোংরামিও দেখেছি। মন্ত্রিত্বের লোভে হিন্দু নেতারা অনেকেই ছিলেন পাগল। অথচ প্রাদেশিক সরকারে দশজন মন্ত্রীর মধ্যে চারজন ছিলেন হিন্দু। কেন্দ্রীয় সরকারেও ১০ জনের মধ্যে তিনজন হিন্দু মন্ত্রী ছিলেন। তাঁদের হাতেই ছিল সরকার ভাঙাগড়ার চাবিকাঠি।

অপর দিকে ইসলামি শাসনতন্ত্র বলবৎ করার ব্যাপারে মুসলমান মন্ত্রীরা সবাই ছিলেন একাট্টা। এই একতার বলেই তাঁরা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা পাশ করিয়ে নিলেন—(১) পূর্ববঙ্গের নাম হবে পূর্বপাকিস্তান, (২) মুসলমান ছাড়া অন্য কেউ পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবে না, এবং (৩) পাকিস্তান হবে একটি ইসলামি রাষ্ট্র। আমরা ছাত্ররা তা রুখে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম। ফলে পড়াশুনারও অনেক ক্ষতি হয়েছিল। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারিনি। তাতে দুঃখ পেয়েছি, কিন্তু ভেঙে পড়িনি। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সেই সময় পাকিস্তানে বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে ছাত্ররাই রাজনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করত।

শেখ মুজিবর রহমান

ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে মুজিবর রহমানের জন্ম। টুঙ্গিপাড়া আমাদের বাড়ি থেকে ৬/৭ মাইল উত্তরে। আমাদের মতো সাধারণ এক কৃষক পরিবারেই তাঁর জন্ম। তাঁর বাবার নাম লাল মিঞা। তিনি ছিলেন গোপালগঞ্জ কোর্টের একজন পেশকার এবং টুঙ্গিপাড়ার প্রথম ম্যাট্রিকুলেট। মুজিবদের পরিবারে ছিল অনেক লোক এবং সেই কারণে তারাই গ্রামের মুসলমান সমাজের ওপর সর্দারি, মাতব্বরি করত;

টুঙ্গিপাড়ার পাশেই পাটগাতি গ্রাম। সেখানে নমঃ সমাজভুক্ত মণ্ডলবাড়ি ছিল ধন-মান ও শিক্ষায় দীক্ষায় অনেক উন্নত। মণ্ডলরা ছিল তালুকদার। তাদের যেমন ছিল প্রচুর জমিজমা তেমনি অসংখ্য প্রজা। অঞ্চলের হিন্দু, মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই তাদের বিশেষ সমীহ করত। তাদের মতো একটা পরিবার ঐ অঞ্চলে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল না বললেই হয়।

টুঙ্গিপাড়া গ্রামের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ছোট্ট একটি নদী। তার পূর্ব উত্তর পারে হিন্দু এবং পশ্চিম দক্ষিন পারে ছিল মুসলমানদের বাস , গ্রামে প্রচার আছে যে, চার পাঁচ পুরুষ আগে তারা নমঃ সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোনো কারণে সমাজচ্যুত হয়ে তারা ইসলাম ধর্ম্মমত গ্রহণ করে। পূর্বে হিন্দু সমাজের বিচার ব্যবস্থা ছিল কঠোর। সমাজের নেতারা সমাজ বিরোধী বা ব্যভিচারীদের কঠোর সাজা দিত। বিশেষ বিশেষ অপরাধের ক্ষেত্রে তারা ধোপা নাপিত এমন কি ব্রাহ্মণও বন্ধ করে দিত। অনেকে শাস্তি মকুবের চেষ্টা করত এবং অপেক্ষা করত। অনেকে আবার রাগের চোটে কিংবা ভয় বা লোভের বশবর্তী হয়ে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মমত গ্রহণ করত । আজ যেমন অনেক হিন্দু ব্যক্তিগত সুখ সুবিধা ও লোভের

বশবর্তী হয়ে কমুনিষ্ট ধর্মমত গ্রহণ করছে।

এভাবে একবার ইসলাম গ্রহণ করলে তা থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয় না। কোনো মুসলমান ধর্মত্যাগ করলে তাকে হত্যা করার নির্দেশ কোরাণ হাদিসে আছে। পক্ষান্তরে সমাজ থেকে একবার বেরিয়ে গেলে হিন্দু সমাজ তাকে ক্ষমা করে সমাজভুক্ত করেনি।

যাই হোক, কোনো না কোনো কারণে মুজিবরের পূর্বপুরুষরা একদিন মুসলমান হয়েছিল এবং তখন থেকেই তারা হিন্দু সমাজ তথা নমঃ সমাজকে জাতশত্রু বলে মনে করতে শুরু করে। সেদিন কেবল একটা পরিবারই মুসলমান হয়নি, গ্রামের পর গ্রাম মুসলমান হয়েছে। প্রমাণস্বরূপ আজ দেখা যায় ঐ অঞ্চলের প্রায় ২৫/৩০ টি গ্রাম বা পাড়ায় একচেটিয়া মুসলমান বসতি রয়েছে। শোনা যায় যে, কোনো একজন হিন্দু নেতাকে কোনো বিশেষ অপরাধের শাস্তি হিসাবে সমাজচ্যুত করার ফলে তার কথামতো বহু হিন্দু পরিবার এক সঙ্গে মুসলমান হয়েছে। এভাবেই একদিন টুঙ্গিপাড়া ও তার পাশের শ্রীরামকান্দি ডেমাডাঙ্গা গ্রামের সকল হিন্দু মুসলমান হয়েছিল। মুসলমান হয়ে তারা গ্রামের হিন্দু নামও বদল করে ফেলেছে। শ্রীরামকান্দি আজ ছেরামকান্দি হয়েছে। যেমন ঢাকার মহাকালী আজ মহাখালী হয়েছে।

আমাদের অঞ্চলের সমস্ত মুসলমানই যে এককালে নমঃ সমাজের লোক তা খুবই স্পষ্ট। এখানকার মুসলমানদের আচার ব্যবহার, খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা, কথাবার্তা, এমন কি মানসিকতাও নমঃ সমাজের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিলে যায়। অনেক মিল থাকা সত্ত্বেও ধর্মান্তরিত ঐ সব মুসলমানদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ছিল অনেক কম। কমপক্ষে ২৫/৩০ টা গ্রাম মুসলমান অধ্যুষিত হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান হওয়ার পূর্বেই সেখানে একটাও হাইস্কুল গড়ে ওঠেনি। পক্ষান্তরে নমঃপ্রধান হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে গড়ে উঠেছিল অনেক হাইস্কুল। শিক্ষাদীক্ষায় মুসলমানদের অনীহার কারণও ইসলামের শিক্ষা। শিক্ষাদীক্ষা ও নৈতিক দিক দিয়ে উন্নত সৎ মানুষ গড়ার কোনো প্রেরণা ইসলামে নেই। ইসলাম মানুষকে সম্পদ সৃষ্টিতে কোনো প্রেরণা যোগায় না। ইসলামের শিক্ষা হল জেহাদ করে পরের সম্পদ ঘরে আনতে হবে। চুরি, ডাকাতিতেই ইসলামের প্রেরণা। ইসলামি মতে ইসলাম হল শ্রেষ্ঠ পথ। এই পথের পথিক বলে একজন মুসলমান পাহাড় প্রমাণ পাপ করলেও সৃষ্টিকর্তার ক্ষমা পাবে। পরলোকে জান্নাত (স্বর্গ) বাসী হবে।

শোনা যায় কলকাতার মহা-নিধন দাঙ্গায় মুজিব নিজ হাতে ছোরা নিয়ে

রাস্তায় নেমেছিলেন — দাঙ্গায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। মুজিব ব্যক্তিগত ভাবে সুরাবর্দির মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। কাজেই গুরু যে দাঙ্গা আরম্ভ করেছিলেন তাতে শিষ্য যোগ দেবে তাতে আর আশ্চর্য কি? তবে দাঙ্গায় হিন্দু খুন করার শিক্ষা মুজিব তাঁর গ্রাম থেকেই পেয়েছিলেন। কারণ আমাদের অঞ্চলে হিন্দু মুসলমানে সংঘর্ষ বাঁধলে ছেরামকান্দি, ডেমাডাঙ্গা ও টুঙ্গিপাড়ার মুসলমানরাই মুসলমানদের নেতৃত্ব দিত।

আগে কিছু কিছু অঞ্চলে মাঝে মাঝে দাঙ্গা হলেও তা ব্যাপক রূপ নিত না। ব্যাপক দাঙ্গা শুরু হয় মুসলিম নেতৃত্বে বাংলার সরকার গড়ার পর থেকেই। পুলিশের খাতায়ও ঐ অঞ্চল 'দাঙ্গা প্রবণ' (Riot Prone) বলে লিপিবদ্ধ আছে। বাংলায় মুসলমান প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগেই মুসলমানরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। তাদের জাতশত্রু নমঃদের বিরুদ্ধে নতুন করে আক্রমণ করতে সাহস পায়। অতীতের প্রতিশোধ নেবার চেষ্টায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী নমঃদের প্রতি আক্রমণের ধাক্কায় প্রতিবারই তারা পিছু হঠতে বাধ্য হয়।

তখন দেখা যেত যে, মুসলমানরা কাজিয়া (দাঙ্গা) করতে অগ্রসর হলে তাদের মধ্যে এক দল বস্তা সঙ্গে নিয়ে যেত। উদ্দেশ্য, সুযোগ পেলেই লুট করা এবং লুটের মাল বস্তা ভর্তি করা। কারণ জেহাদের সারকথা হলো বিধর্মীদের আক্রমণ কর, খুন কর, শূলবিদ্ধ কর, হাত পা কেটে দাও। তবে মুসলমান হতে রাজি হলে ক্ষমা করে দিও। অন্যথায় তাদের ঘর বাড়ি লুট কর, জ্বালিয়ে দাও। তাদের মেয়েদের ওপর অত্যাচার চালাও। এইভাবে এক ভয়াবহ সন্ত্রাসের পরিস্থিতি তৈরি কর, যা দেখে বা শুনে অন্যরা ভয় পেয়ে মুসলমান হয়।

যেহেতু জেহাদের আদেশ কোরানে লিপিবদ্ধ আছে তাই জেহাদের কথা মুসলমানরা আগে থেকেই জানত। কিন্তু রাজশক্তি সহায় না থাকায় জেহাদের ডাক দিতে ভয় পেত। তাই মুসলমান প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মনোবল বেড়ে গেল। পাকিস্তান দাবির সময় তার গতি বৃদ্ধি পায় এবং পাকিস্তান সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তা এক ঝড়ের রূপ নেয়। সেই ঝড়ের ভয়াবহ রূপ দেখেই হিন্দুরা তাদের সহায় সম্পদ ত্যাগ করে প্রাণভয়ে দলে দলে দেশ ত্যাগ করতে শুরু করে আর মুসলমানরা তাদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তি দখল করতে থাকে। সেই আনন্দে তারা ছড়া বাধে—

জিন্না আনল পাকিস্তান, গান্ধি গেল মারা,
হিন্দু গেল হিন্দুস্থান, চাঁড়াল পড়ল ধরা।

এই ছড়ায় 'চাঁড়াল' বলতে যে নমঃ সমাজকে লক্ষ্য করা হয়েছে তা বলাই

বাহুল্য।

এরকম এক পরিবেশের সূচনায় মুজিবের জন্ম হয়েছে। প্রথম জীবনে গ্রামে থেকেছেন। পরে গোপালগঞ্জ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতার ইসলামিয়া (বর্তমান মৌলানা আজাদ) কলেজে ভর্তি হন। আর থাকেন বেকার ছাত্রাবাসে। সেই সময় এই কলেজটি সহ কয়েকটি ছাত্রাবাস ও কলকাতা মাদ্রাসা ছিল ইসলামি শিক্ষা ও প্রচারের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। এই সব প্রতিষ্ঠানের সমস্ত ছাত্রই ছিল মুসলিম লিগের সংগ্রামী সেনা। এই ভাবে কলেজ শিক্ষার সাথে মাদ্রাসায় ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এবং প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দির কাছে রাজনৈতিক শিক্ষা পেয়ে মুজিব গড়ে উঠলেন ইসলামের এক নির্ভীক সেনাপতি রূপে।

এভাবে ইসলামের সেনাপতি রূপেই তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে নামলেন এবং ১৯৪৬ সালের ১৬ ই আগষ্টের নৃশংস কলকাতার দাঙ্গায় নেতৃত্ব দিলেন। পাকিস্তান সংগ্রামের তিনিই হলেন পূর্বাঞ্চলের প্রধান সৈনিক। সুরাবর্দির প্রধান সেনাপতি ও ডান হাত শেখ মুজিব। সেই সঙ্গে মুসলিম ছাত্র লিগের একজন অন্যতম নেতা। যখন স্বাধীনতা আন্দোলনে হাজার হাজার হিন্দু যুবক হাসিমুখে প্রাণ দিচ্ছিল, হাজার হাজার হিন্দু দেশপ্রেমিক কারা অন্তরালে কাঁদছিল এবং হাজার হাজার আহত পঙ্গু যুবক মৃত্যুর দিন গুনছিল, তখন যুবক শেখ মুজিব স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ না দিয়ে হিন্দুর বিরুদ্ধে জেহাদের পরিকল্পনায় ব্যস্ত ছিলেন। এভাবে জেহাদের ডাক দিয়ে হিন্দুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। আর ব্রিটিশের সঙ্গে সেই ঘৃণ্য দেশভাগ চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন।

কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে সেই বীর, দেশভক্ত ও দেশপ্রেমিক হিন্দু যুবকদেরকে শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে মাথা নত করতে হল। সুরাবর্দির আধা রাজশক্তি ও শেখ মুজিবদের পেশীশক্তির কাছে বশ্যতা স্বীকার করে লজ্জাজনক দেশভাগ চুক্তি তাদের মেনে নিতে হল। সেই সঙ্গে পূর্ববাংলার হিন্দু স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা তাদের নিজ দেশে পরবাসী হয়ে গেল। যে মাতৃভূমির জন্য তারা এতকাল সংগ্রাম করেছে, সেই মাতৃভূমিতেই তারা বিদেশি বলে গণ্য হল। রাষ্ট্রদ্রোহী রূপে চিহ্নিত হল। শুধু তাই নয়, মিথ্যা দেশদ্রোহিতার অপরাধে অনেককে জেলও খাটতে হল। শেষ পর্যন্ত প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে ভারতে চলে আসতে হল।

এভাবে পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দুর দল সর্বসান্ত হল। অপর দিকে পূর্বাঞ্চলের যে সব মুসলমান নেতারা পাকিস্তানের দাবিতে সংগ্রাম করেছিলেন সেই সুরাবর্দি, আবুল হাসেম, মৌলানা ভাসানী ও মুজিবরের দলও সাময়িকভাবে বঞ্চিত হল। যে

রাজশক্তি লাভ করার আশায় তাঁরা সংগ্রাম করেছিলেন, সেই পাকিস্তানের রাজশক্তি তারা হাতে পেলেন না। জিন্নার আশীর্বাদে রাজশক্তির দখল নিল সুরাবর্দির বিরোধী শক্তি। নাজিমুদ্দিন, নুরুল আমিন ও আক্রাম খানের দল।

সুরাবর্দি ও তাঁর দলবল রাজশক্তি তো পেলই না, উপরন্তু তাদের জীবনে নেমে এল এক ঘোরতর দুর্দিন। বাংলার প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী ও মুসলিম লিগের কার্যকরী নেতা সুরাবর্দি ও সেক্রেটারী জেনারেল আবুল হাসেম ছিলেন পশ্চিমবাংলার মানুষ। কাজেই পূর্ববাংলার সাধারণ মুসলমানদের সঙ্গে তাঁদের কোনো গভীর যোগাযোগ ছিল না। তাই পূর্ববঙ্গে কিছু করার ক্ষমতাও তাদের ছিল না। পক্ষান্তরে নাজিমুদ্দিন ছিলেন পূর্ববাংলার মানুষ। তাই জনসমর্থন ছিল তাঁর পক্ষে। বিরোধ এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছাল যে, সুরাবর্দি ঢাকায় গেলে ঢাকার বাদামতলী স্টীমার ঘাটে তাকে নামতেই দেওয়া হল না। বাধ্য হয়ে সুরাবর্দিকে সেই স্টীমারেই খুলনা হয়ে কলকাতায় ফিরতে হল। পরে তিনি করাচি গিয়ে বাস করতে শুরু করেন এবং সেখানকার মুহাজিরদের নিয়ে একটা ছোট সংগঠন গড়ার চেষ্টা করেন ও গড়েন।

অপর দিকে পূর্ব বাংলার লোক হবার কারণে রাজশক্তির মদত না থাকলেও শেখ মুজিব সেখানকার সাধারণ মানুষদের সমর্থন পেলেন এবং মুসলিম ছাত্র লিগের নেতা হয়ে বসলেন। ভাসানীও রাজশক্তির আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হলেন। তাই আসাম থেকে ঢাকায় ফিরেই তিনি সরকার বিরোধী বক্তব্য রাখতে শুরু করলেন। তাঁর বক্তব্যের সার কথা ছিল—শরিয়ৎ মতে দেশ চালাতে হবে আর পূর্ববঙ্গকে পাকিস্তান সরকার বঞ্চিত করে চলেছে, তার প্রতিবাদ করতে হবে। এরপর ১৯৪৮ সালে ভাসানী পূর্ববাংলা আওয়ামি মুসলীম লিগ গঠন করেন। তিনি নিজে এই নতুন দলের সভাপতি হলেন আর সামসুল হক হলেন সাধারণ সম্পদক। শুধু সরকারি মুসলিম লিগের বিরোধিতা করার জন্যই তিনি এই নতুন দল গঠন করেছিলেন। এই দলও ছিল মুসলিম লিগের মতোই সাম্প্রদায়িক। শরিয়তি শাসন চালু করার ব্যাপারেও দুই দল ছিল একমত।

শেখ মুজিবের ছিল বলিষ্ঠ শারীরিক গঠন, সুউচ্চ কণ্ঠস্বর, বাকচাতুর্য, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং সর্বোপরি সরকার বিরোধী ভূমিকা নেবার সাহস। সুরাবর্দির কাছ থেকে তিনি যে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক শিক্ষা পেয়েছিলেন তা আগেই বলা হয়েছে। এই সব গুণের ফলেই তিনি ছাত্রদের নেতা হতে পেরেছিলেন। সত্যি কথা বলতে, সুরাবর্দির কাছ থেকে তিনি যে কূট-নীতির শিক্ষা পেয়েছিলেন, তার ফলেই তিনি সামসুল হককে সরিয়ে নিজে পূর্ববঙ্গ আওয়ামি মুসলিম লিগের

সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন। সে অতীত ইতিহাসও খুব শ্রুতিমধুর নয়। ইসলাম ধর্মের প্রতি গভীর বিশ্বাস থাকলেও ব্যবহারিক জীবনে মুজিব ছিলেন দ্বৈত স্বভাবের মানুষ।

মুজিবের প্রচেষ্টার ফলেই পরে সুরাবর্দি আওয়ামি মুসলিম লিগে যোগ দিলেন। পরে পাকিস্তানে আওয়ামি লিগ গড়ে তোলেন এবং নিজে তার সভাপতি হন। সেই সময় এই আওয়ামি মুসলিম লিগই ছিল পূর্ববঙ্গের একমাত্র বিরোধী মুসলিম দল। এরপর ১৯৫১ সালে কমিউনিস্ট পার্টির মদতে অসাম্প্রদায়িক ও অরাজনৈতিক যুব লিগ গঠিত হয়। এছাড়া অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল বলতে ছিল কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি ও গণসমিতি। সমস্ত অসাম্প্রদায়িক দলেরই নেতা ছিলেন হিন্দু।

১৯৫২ সালে যুব লিগ ও কমিউনিস্ট পার্টির মদতে গঠিত হল পূর্ববঙ্গ ছাত্র ইউনিয়ন। এই ছাত্র ইউনিয়নের বক্তব্য ছিল সম্পূর্ণভাবে অসাম্প্রদায়িক ও অরাজনৈতিক। আমি এই যুব লিগ ও ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য হয়েই কাজ শুরু করি। এই যুব লিগ ও ছাত্র ইউনিয়ন গঠন করার সময় শেখ মুজিব যত রকম ভাবে পারা যায় এর বিরোধিতা করেন। এর কারণ হল তিনি ছিলেন ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ইসলামি ভাবধারা ও সংস্কৃতিতে উদ্বুদ্ধ। ইসলাম ভিত্তিক সংগ্রামে ছিল তার অগাধ বিশ্বাস, কারণ এই ইসলামি পথে জেহাদ করেই তিনি পাকিস্তান আদায় করেছেন। সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িকতার উপর প্রতিষ্ঠিত সেই পাকিস্তানে কেউ কোনো অসাম্প্রদায়িক সংগঠন গড়ে তুলবে বা অসাম্প্রদায়িক বক্তব্য রাখবে তা ছিল তাঁর কাছে অসহ্য।

সে সময় পাকিস্তান সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনি ঘোষণা করে। ফলে কমিউনিস্ট নেতারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, পার্টির কর্মীরা আওয়ামি মুসলিম লিগে যোগ দিয়ে কাজ করে যাবে। কিন্তু কমিউনিস্ট নেতা হাজী দানেশ পার্টির এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানালেন এবং পূর্ববাংলা গণতন্ত্রী দল গঠন করলেন। ১৯৫৩ সালে এই নতুন দল আত্মপ্রকাশ করে। হাজী দানেশের যুক্তি ছিল— কমিউনিস্টরা কোনো মতেই আওয়ামি মুসলিম লিগের মতো একটি সাম্প্রদায়িক দলের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে পারে না, তার বদলে নতুন একটি দল গড়ে কাজ করলেই বেশি ভালো হবে। এই গণতন্ত্রী দলই হল পাকিস্তানের প্রথম অসাম্প্রদায়িক দল, যা মুসলিম নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল। পরে ১৯৫৭ সালে পূর্ববঙ্গ গণতন্ত্রী দল, কমিউনিস্ট পার্টি, আওয়ামি লিগের কিছু সংখ্যক নেতা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের

বিরোধী দলগুলির বিশেষ বিশেষ সদস্যদের নিয়ে গঠিত হল অসাম্প্রদায়িক ন্যাশানাল আওয়ামি পার্টি (ন্যাপ)। মৌলানা ভাসানী হলেন এই নতুন দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি। দলের পশ্চিম পাকিস্তান শাখার সভাপতি হন সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফফর খান।

এই ন্যাপ দল গঠন করার সময়ও মুজিব বাধা দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা চালান। ঢাকার রূপমহল সিনেমার মঞ্চে যখন পার্টির প্রথম অধিবেশন বসল মুজিবের গুণ্ডা বাহিনী তখন সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেই সংঘর্ষে অনেক সদস্য আহত হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের বিশিষ্ট নেতা ইফতিয়ার উদ্দিনের হাতের হাড় ভেঙে যায়। এখানে বলে রাখা বিশেষ প্রয়োজন যে, যখন এই ঘটনা ঘটে তখন পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামি লিগের সরকার ক্ষমতায় ছিল এবং মুজিব ছিলেন সেই সরকারের একজন বিশিষ্ট মন্ত্রী। এখানে এটাও বিশেষ ভাবে বলে রাখা প্রয়োজন যে, এর আগে আওয়ামি মুসলিম লিগের নেতারা তাঁদের দলকে একটি অসাম্প্রদায়িক দল বলে ঘোষণা করেন। মুসলিম শব্দটা বাদ দিয়ে দলের নতুন নামকরণ করা হয় পাকিস্তান আওয়ামি লিগ। কিন্তু প্রশ্ন হল, কি এমন ঘটনা ঘটল যাতে করে মুসলিম নেতারা এত উদার হয়ে পড়লেন? দলকে অসাম্প্রদায়িক ঘোষণা করে কেন নতুন নাম রাখলেন?

দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জাতীয় পরিষদের হিন্দু সদস্যরা ও হিন্দু লবির নেতারা যে পাকিস্তানে ইসলামি শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করা ঠেকাতে পারেননি তা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু আর একটা ব্যাপারে তাঁরা সফল হলেন। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে হিন্দু মুসলিম যৌথ ভোটের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করতে তাঁরা সক্ষম হলেন। ফলে বাধ্য হয়ে সাম্প্রদায়িক আওয়ামি মুসলিম লিগকে নামে অসাম্প্রদায়িক আওয়ামি লিগ হতে হল। এতদিনের ঘোষিত ইসলাম নীতিকে উপেক্ষা করে দলকে অসাম্প্রদায়িক ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত অনেক মৌলবাদী মুসলমানই তখন মেনে নিতে পারেনি। ইসলাম পন্থী অনেক মুসলমান সদস্যই চরমভাবে এর বিরোধিতা করে।

সেই সব সদস্যদের বাগে আনতে সুরাবর্দি পার্টির সভায় এক তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। তাঁর সেই বক্তৃতার মূল কথা ছিল এই যে, হিন্দুদের ভোট পেতে হলে দলকে অসাম্প্রদায়িক ঘোষণা করা ছাড়া কোনো পথ নেই। তিনি বোঝালেন যে এর ফলে হিন্দুদের কাছ থেকে ভয়ের কোনো সম্ভাবনা নেই। কারণ হিন্দুরা যদি আলাদা দল তৈরি করে নির্বাচনে লড়ে এবং যেখানে হিন্দুর সংখ্যা সর্বাধিক সেখানেও তারা মুসলমানদের সমর্থন না পেলে ভোটে জিততে পারবে না। তখন তাদের নেতারা, তাদের ব্যক্তিস্বার্থেই হোক আর সমষ্টির স্বার্থেই হোক, শেষ পর্যন্ত শক্তিশালী

আওয়ামি লিগে যোগ দেবেন। একমাত্র আওয়ামি লিগ ছাড়া আর সব বড় দলই সাম্প্রদায়িক। তাই তারা আওয়ামি লিগ ছাড়া আর কোনো দলে যোগ দেবে না। আর একবার আওয়ামি লিগের আওতায় এসে পড়লে মুসলমানরাই তাদের নিয়ন্ত্রন করবে। তখন সংখ্যা অনুপাতে তাদের যত জনের নমিনেশন পাওয়ার কথা তার দশ ভাগের এক ভাগকে নমিনেশন দিলেও তাদের বলার কিছু থাকবে না।

এসব ঘটনার কিছু দিনের মধ্যেই সারা দেশে সামরিক আইন জারি হল এবং তা অনেক দিন ধরে চলল। তারপর বেশ কিছুদিন চলল বেসিক ডেমোক্রেসি বা বুনিয়াদী গনতন্ত্রের শাসন। তারপর ১৯৭০ সালে এসে গেল যৌথ ভোটের মাধ্যমে প্রথম সাধারণ নির্বাচন। গুরু সুরাবর্দির কৌশল অনুসরণ করেই শিষ্য মুজিবর রহমান হিন্দু প্রার্থীদের নমিনেশন দিলেন। সংখ্যানুপাতে জাতীয় পরিষদে ৩৬ জন হিন্দুর নমিনেশন পাওয়ার কথা। মুজিব সেখানে একজন মাত্র হিন্দুকে নমিনেশন দিলেন। প্রদেশিক পরিষদের বেলাতেও তাই। যেখানে ৬৬ জন হিন্দুর নমিনেশন পাওয়ার কথা সেখানে নমিনেশন দেওয়া হল মাত্র ■ জনকে।

এরপর বাংলাদেশ স্বাধীন হলে, ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিব মোট ৩০৯ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৮ জন হিন্দুকে নমিনেশন দিলেন। বুঝিয়ে দিলেন যে, হিন্দুদের প্রতি এর থেকে বেশি দয়া দেখানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। হিন্দুদের প্রতি দয়া দেখানোর ব্যাপারে মেয়ে শেখ হাসিনা বর্তমানে আরও এক ধাপ উপরে উঠেছেন। গত ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে তিনি মাত্র ৬ জন হিন্দুকে নমিনেশন দেবার উদারতা দেখালেন। তাও সেই ৬ জন হিন্দুকে বেছে বেছে এমন সব জায়গায় নমিনেশন দিলেন যেখান থেকে জেতার কোনো সম্ভাবনা নেই। যে গোপালগঞ্জ মহকুমায় হিন্দুর সংখ্যা এখনও অনেক বেশি, সেখানে তিনি হিন্দুর বদলে দু জন মুসলমান দাঁড় করালেন। তাঁর এক নিকট আত্মীয়কে এবং নিজে দাঁড়ালেন যাতে সহজে জিতে আসতে পারেন।

এ ব্যাপারে একটা বিশেষ নির্বাচন কেন্দ্রের কথা উল্লেখ করা উচিত হবে। খুলনার বৈঠাঘাটা কেন্দ্রে এখনও হিন্দুর সংখ্যা অনেক বেশি আছে। নিরাপদে জিতে আসার জন্য শেখ হাসিনা সেই বৈঠাঘাটায় নিজে দাঁড়ালেন। সেখানকার যোগ্য প্রার্থী ছিলেন সমাজসেবী পঞ্চানন বিশ্বাস। তাঁকে তিনি কথা দিলেন যে তিনি নির্বাচনে জিতলে গোপালগঞ্জের কেন্দ্রটি নিজে রেখে দেবেন এবং উপনির্বাচনে পঞ্চানন বাবুকে বৈঠাঘাটায় নমিনেশন দেবেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, উপ নির্বচনে পঞ্চানন বিশ্বাসের বদলে একজন মুসলমানকে বৈঠাঘাটায় নমিনেশন দিলেন। এই

বিশ্বাসঘাতকতায় ক্ষুব্ধ হয়ে পঞ্চানন বাবু শেখ হাসিনাকে চ্যালেঞ্জ জানালেন এবং একজন নির্দল প্রার্থী হয়ে নির্বাচিত হয়ে জাতীয় পরিষদের সদস্য হলেন। পরে অবশ্য চাপে পড়ে পঞ্চানন বাবুকে আবার আওয়ামি লিগে ফিরে আসতে হয়।

শেখ মুজিবের প্রথম ও মধ্যজীবন সাম্প্রদায়িক ইসলামি ধারাতেই কেটেছে। তাঁর রাজনৈতিক দল আওয়ামি লিগের ভিত্তিও ছিল সাম্প্রদায়িক। পরে শুধু মাত্র রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্যই 'মুসলিম' শব্দটা বর্জন করে দলকে একটা অসাম্প্রদায়িক মোড়ক দেওয়া হয়েছে। কাজেই শেখ মুজিবের মনোভাব অসাম্প্রদায়িক হবার ফলে আওয়ামি লিগকে অসাম্প্রদায়িক বলে ঘোষণা করা হয়েছে এরকম ধারণা করা হবে মারাত্মক ভুল। শেখ মুজিব যে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত একজন ঘোরতর সাম্প্রদায়িক মুসলমান ছিলেন এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। এই সাম্প্রদায়িক মনোভাবের কারণেই শেখ মুজিব ইসলামি শাসনতন্ত্রে একটা অসাম্প্রদায়িক রূপ দিতে তাঁর নিজের অথবা তাঁর পার্টির তরফ থেকে বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টা কখনও দেখা যায়নি। ৭৩ সালে বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র নামে মাত্র অসাম্প্রদায়িক করতে বাধ্য হলেও পরবর্তীকালে একদলীয় শাসনে পরিণত করেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে হিন্দুরা দল বেঁধে একজোটে আওয়ামি লিগকে ভোট দিয়ে জয়ী করে। পরে স্বাধীনতা যুদ্ধে সমস্ত ক্ষয় ক্ষতির প্রায় সবটাই হিন্দুদের ওপর দিয়ে যায়। কিন্তু হিন্দুর এই নিঃস্বার্থ সমর্থনের কি প্রতিদান শেখ মুজিব দিলেন ? ১৯৭৩ এর নির্বাচনে তিনি মাত্র ৮ জন হিন্দুকে আওয়ামি লিগের নমিনেশন দিলেন। অথচ সংখ্যানুপাতে অন্ততপক্ষে ৬০ জন হিন্দুর নমিনেশন পাওয়া উচিত ছিল। এই একটি ঘটনা থেকে তাঁর সাম্প্রদায়িক মনোভাব বা সাম্প্রদায়িক ইসলামি চরিত্র অতি নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলে রাখা যুক্তিযুক্ত হবে। পাকিস্তান হওয়ার পরে বিভিন্ন সময় দাঙ্গা হয়েছে এবং হিন্দুদের ওপর চরম ও নৃশংস অত্যাচার হয়েছে। কিন্তু শেখ মুজিব এজন্য কোনো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেননি বা হিন্দুদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করেননি। সেই সব অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোনো নিন্দাও তাঁর মুখ থেকে কোনো দিন উচ্চারিত হয়নি।

আরও আগে, ১৯৫৮ সালে পাক সামরিক বাহিনী কুখ্যাত সি. ডি. ও বা "Closed door operation" চালাবার নামে হিন্দুদের ওপর চরম অত্যাচার শুরু করে। হিন্দু কোনো নেতাই সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে সাহস পায় না। কিন্তু প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য চিত্তরঞ্জন সুতার এই জঘন্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে

তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে পরিষদে তাঁর বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের আওয়ামি লিগ সরকারের কাছেও অত্যাচার বন্ধ করার জন্য আকুল আবেদন জানান।

কিন্তু সে করুণ আবেদন পরিষদের আওয়ামি লিগ সদস্য আবদুল খালেকের মনে দাগ কাটলেও মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান ও বিশিষ্ট মন্ত্রী শেখ মুজিবের মনে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়। উপরন্তু মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান তাচ্ছিল্যের সাথে বলেন যে, চিত্তবাবুর বক্তব্য চা'এর দোকানের আড্ডার গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। সবই চিত্তবাবুর বানানো গল্প। তিনি আরও বলেছিলেন যে, বিশ্বের দরবারে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সুনাম নষ্ট করার মতলবেই চিত্তবাবু ঐ সব গল্প তৈরি করেছেন। অথবা কারও ইঙ্গিতে চিত্তবাবু ঐ ধরণের বক্তব্য রেখেছেন। সব শেষে আওয়ামি লিগের মনোনীত স্পীকার আবদুল হাকিম সাহেব আরও এক ধাপ এগিয়ে বললেন, "যে আগুন চিত্তবাবু আজ পরিষদে জ্বালালেন সে আগুনে একদিন তাঁকে পুড়ে মরতে হবে।"

তবে একথা সত্য যে, ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার সময় মুজিব শক্ত ভাষায় তার প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু তার চেয়েও দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ জানাতে ছাত্র-জনতা ও অন্যান্য নেতারা তখন রাস্তায় নেমেছিলেন। এখানে এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, এই দাঙ্গার অনেক আগে তাঁর সাথে চিত্তবাবু ও আমার কথা হয় যে, পূর্ববঙ্গের সমস্ত হিন্দু তাঁর নেতৃত্ব স্বীকার করে তাঁর অধীনে পূর্ববাংলার স্বায়ত্ত শাসনের আন্দোলনে যোগ দেবে। আমরা তাঁকে এই প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলাম যে, স্বায়ত্ত শাসনের আন্দোলনে সমস্ত হিন্দু যাতে তাঁর পাশে দাঁড়ায় তার জন্য আমরা সব রকম প্রচেষ্টা চালাব। এই প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও যখন প্রতিদিন হাজার হাজার হিন্দু ঢাকার ভারতীয় দূতাবাসের সামনে ভারতে যাবার মাইগ্রেশনের জন্য লাইন দিত তা দেখেও মুজিব হিন্দুদের দেশত্যাগ বন্ধ করার কোনো প্রচেষ্টা করেননি। এজন্য কোনও বেদনাও প্রকাশ করেননি।

দেশত্যাগের সে দৃশ্য ছিল বড়ই করুণ ও বেদনাদায়ক। সে করুণ দৃশ্য অন্যান্য মুসলমানের মতো শেখ মুজিবের মনেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি। এইভাবে প্রায় ২৫/৩০ লক্ষ হিন্দু দেশত্যাগ করল। অথচ কোনো মুসলমান রাজনৈতিক নেতা, সমাজকর্মী, এমন কি মানবিক সংস্থার কোনো মুসলমানও কোনো প্রতিবাদ করেননি বা বেদনা প্রকাশ করেননি। এটা লক্ষ্য করে আমরা তখন বিস্মিত হয়েছি। এই সুজলা সুফলা বাংলায় যে মানবতার এতখানি অবনতি ঘটবে তা

কোনোদিন ভাবতে পারিনি।

এদিকে সামরিক শাসনের দিন ঘনিয়ে আসছিল। পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু নেতারা বুঝতে না পারলেও পাকিস্তানের শাসক মহল বুঝতে পেরেছিলেন যে, হিন্দুদের হাতে শাসন ক্ষমতার ভারসাম্য চলে গিয়েছে। তাই হিন্দুদের ক্ষমতা খর্ব করার জন্যই সামরিক শাসন অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছিল। ক্লোজ ডোর অপারেশন ছিল এই সামরিক শাসনের পূর্বপ্রস্তুতি।

প্রাদেশিক পরিষদে তাঁর মুলতুবী প্রস্তাবের সপক্ষে বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে চিত্তবাবু হিন্দু সমাজের যে করুণ চিত্র তুলে ধরেছিলেন, কোনো মুসলমান নেতার হৃদয় তা স্পর্শ করতে পারেনি তা ঠিক। কিন্তু হিন্দু নেতারাও সেই সময় তাদের কর্তব্য করেননি। যদি লোভী বড় বড় হিন্দু নেতারা যদি সেদিন তাঁদের ব্যক্তি স্বার্থ কিছুটা ত্যাগ করতেন, যদি হিন্দু সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করতেন, তবে পরবর্তীকালের ভয়াবহ করুণ ইতিহাস সৃষ্টি হত না।

সব থেকে বড় কথা হল এর মধ্যেও আমরা যেটুকু হিন্দু ঐক্য গড়ে তুলতে পেরেছিলাম সেটাও কিছু কম ছিল না। কিন্তু এত দিনের সাধনার ফলে যেটুকু আশা ভরসা গড়ে তুলেছিলাম, সামরিক শাসনের কলে তা সবই বিলীন হয়ে গেল। পূর্ববঙ্গের হিন্দুর সামনে নেমে এল এক গভীর অন্ধকার।

আয়ুবের উত্থান ও সামরিক শাসন

১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা রদ করে সারা দেশে জরুরি অবস্থা জারি করলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশের অনেক রাজনৈতিক নেতাকে এবং বিশেষ করে প্রায় সকল হিন্দু নেতাকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠান হল। কিন্তু বিশ দিনের মাথায়, ২৭ শে অক্টোবর, ইস্কান্দার মির্জাকে তাড়িয়ে পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি আয়ুব খান দেশে সামরিক আইন জারি করলেন। তিনি শাসনতন্ত্র বাতিল ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সকল মন্ত্রিপরিষদ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আইন পরিষদও ভেঙে দিলেন। সমস্ত রাজনৈতিক দল বে-আইনি ঘোষিত হল। দেশে সুশাসনের নামে শুরু হল রাজনৈতিক নেতাদের উপর অত্যাচার। অপছন্দের কিছু কিছু মুসলমান নেতা এবং প্রায় সব হিন্দু নেতাকে ধরে জেলে নিয়ে গিয়ে শুরু হল তাদের ওপর দৈহিক অত্যাচার।

এই মিলিটারি শাসনকালে অত্যাচারের ভয়াবহ বাস্তব রূপ দেখে যে সব হিন্দু নেতা জেলের বাইরে আত্মগোপন করে ছিলেন তারা সবাই দেশত্যাগ করলেন।

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরও অনেক নেতা দেশত্যাগ করলেন। বিশেষ পরিকল্পনা করেই সামরিক সরকার এই অত্যাচার চালিয়েছিল। এভাবে ভয় দেখিয়ে হিন্দুদের তাড়িয়ে পাকিস্তানকে তারা আরবের মতো কাফের শূন্য করতে চেয়েছিল। এভাবে জনসংখ্যা কমিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যার সাথে পূর্বপাকিস্তানের জনসংখ্যার একটা সমতা আনাও ওদের উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দুদের তাড়াতে পারলেই চাকরি, ব্যবসা বাণিজ্য সহ সর্বক্ষেত্রে মুসলমানদের সুযোগ বাড়বে।

এই সময়, অন্যান্য হিন্দু নেতার সঙ্গে চিত্তবাবুকেও জেলে যেতে হল। তবে বছর খানেকর মধ্যেই চিত্তবাবু সহ অনেক হিন্দু নেতা মুক্তি পেলেন। কারণ ঐ এক বছরের মধ্যেই আয়ুব খান তাঁর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন।

জেল থেকে ছাড়া পেয়েও চিত্তবাবু ঢাকা যেতে পারলেন না। কারণ তাঁর ওপর নির্দেশ ছিল যে থানার বাইরে তিনি যেতে পারবেন না। এই কারণে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আমাকেই ঘন ঘন তাঁর গ্রামের বাড়িতে যেতে হত। আমি তাঁকে ঢাকা সহ দেশের সব জায়গার রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিশেষ করে ছাত্র মহলের ও হিন্দুদের মানসিক অবস্থার কথা জানাতাম। আমরা উভয়েই তখন এই মত পোষণ করতে বাধ্য হই যে, ইসলামি রাষ্ট্র মানেই একনায়ক তন্ত্রের দেশ। গণতন্ত্রের সেখানে কোনো স্থান নেই। শাসনকর্তা যিনি, তিনিই খলিফা। আর তার মুখের কথাই শেষ কথা। গণতন্ত্র সেখানে অচল। এভাবেই পয়গম্বর মদিনায় রাজত্ব করে গেছেন, আর সেই দৃষ্টান্তই মুসলমানরা অনুসরণ করে চলেছে।

অনেক আলোচনার পর আমরা দুজনে এই সিদ্ধান্তে এলাম যে, সামরিক শাসন জারি করে আয়ুব খান যখন তাঁর কর্তৃত্ব একবার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন, সেই কর্তৃত্ব তিনি সহজে ছাড়বেন না। তাই শীঘ্র আবার গণতন্ত্র ফিরে আসবে এ আশা করা বৃথা। এই সময়ে গোপনে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ব শাসনের দাবিকে শক্তিশালী করতে হবে এবং তার জন্য প্রাণপন চেষ্টা চালাতে হবে। আমরা এতদিনে বুঝতে পেরেছিলাম যে, পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক মহল কখনোই পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসন দেবে না। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা যেহেতু পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে বেশি, তাই দাবি উপেক্ষিত হলে তাদের মধ্যে তিক্ততা বেড়ে যাবে। ফলে স্বায়ত্ব শাসনের আন্দোলনই শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ নেবে।

অপর দিকে, পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই যে স্বায়ত্ব শাসনের দাবি শুরু হয় পূর্ব পাকিস্তানের নেতারা তা কোনো দিনই প্রত্যাহার করেননি। তাই যত দিন যাবে

এ দাবি ততই শক্তিশালী হতে থাকবে। বাস্তবিক পক্ষে এই দাবি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গ ত এবং লাহোর প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে, মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে ভারতের পূর্বে ও পশ্চিমে দুটো পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করা হবে। এর ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গ কে স্বাধীন করার কথা আমি চিত্তবাবুকে বলি। তাতে তিনি মনে প্রাণে একমত হন। তারপরই দুজনে মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার শপথ নেই।

অবশ্য আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের কবল থেকে পূর্ববঙ্গকে মুক্ত করা। পূর্ববঙ্গকে স্বাধীন করা। কিন্তু সে কথা বলার তখনও সময় হয়নি। আমরা পূর্ববঙ্গকে স্বাধীন করার কথা ভাবছি তা কাউকে জানতে দেওয়াও ছিল ঝুঁকির কাজ। কারণ শাসক মহল একবার তা জানতে পারলে আমাদের রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করবে। আর আমাদের ওপর নেমে আসবে কঠোর শাস্তি। আমরা প্রতিজ্ঞা করলাম যে, এই মূল উদ্দেশ্যের কথা শুধু আমাদের দুজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে আর প্রকাশ্যে থাকবে স্বায়ত্ব শাসনের দাবি। এর পর থেকেই আমরা অন্যান্য নেতাদের সাথে স্বায়ত্ব শাসন আদায়ের উদ্দেশ্যে কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করার ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করতে শুরু করি।

ঢাকার হিন্দু লবির সদস্যদের কাছে যখন আমরা স্বায়ত্ব শাসন আদায়ের পরিকল্পনার কথা বললাম, তখন তারা খুব খুশি মনে তা গ্রহণ করল। এ ব্যাপারে একটা ঘটনার কথা আমার বিশেষভাবে মনে আছে। একদিন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট আহম্মদ জামান (ইনি ৬২ সালে আয়ুব বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন) এবং আরও কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে যখন আমি এ ব্যাপারে আলেচনা করলাম তখন তাঁরা খুবই উৎসাহ দেখালেন। যখন আমি আরও একটু খুলে বললাম যে কিছু সংখ্যক নেতা নাকি স্বায়ত্ব শাসনের দাবিকে সামনে রেখে নির্দিষ্ট বিশেষ কর্মসূচী সহ আন্দোলনের ডাক দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে, অনেকে স্বাধীনতার কথাও ভাবছে তখন তাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করে বললেন যে পাকিস্তান সরকার কখনোই পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসন মেনে নেবে না। কাজেই স্বায়ত্ব শাসনের নয় একেবারে স্বাধীনতার ডাক দেওয়াই যুক্তিযুক্ত হবে। কারণ তা হলে তারা ভয় পেয়ে স্বায়ত্ব শাসন দিলেও দিয়ে দিতে পারে। আর তা না দিলে শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাকই দিতে হবে। সেই সুযোগেই স্বাধীনতার আলোচনা শুরু হল। অর্থাৎ গোপনে শুরু হল স্বাধীনতার প্রচার। সেই মিলিটারী শাসনে মানুষের মধ্যেও তার প্রচার চলতে থাকল গোপনে।

অত্যন্ত মামুলি কথাবার্তার মতোই তাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছিলাম,

ফলে তাদের মনোভাবও তারা আমার কাছে গোপন করল না। এভাবেই শুরু হয়ে গেল দেশ জুড়ে স্বায়ত্ত শাসনের আড়ালে স্বাধীনতার আলোচনা। এই আলোচনার মধ্যে দিয়েই অনেকের মনে স্বাধীনতার আবেগ দানা বাঁধল। তারা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে শুরু করল। অত্যন্ত গোপনে কিছু কিছু প্রস্তুতিও তারা নিতে শুরু করে দিল। তার জন্য সংগঠিত হতে থাকল।

বিশেষ চাতুরীর সঙ্গে এই সময় আমরা একটা প্রচার শুরু করি। প্রচার করতে থাকি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের কিনে নিতে সরকার এক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। তাদের সি এস পি (Civil Service of Pakistan) বা ঐ জাতীয় কোনো চাকুরির লোভ দেখিয়ে সরকার ছাত্র আন্দোলনে ফাটল ধরাতে চায়। পূর্বে অনেকেই এই টোপের শিকার হয়েছেন এরকম ইতিহাস আছে। তাই ঢাকার ছাত্র আন্দোলনের শক্তিকেন্দ্র বা প্রধান কার্যালয় মেডিক্যাল কলেজেই থাকা উচিত, কারণ মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র সরকারি চাকুরির মুখাপেক্ষী নয়।

পূর্বের কিছু কিছু ঘটনায় 'ঢাকা ইউনিভারসিটি স্টুডেন্ট ইউনিয়ন' বা DACSU এর প্রতি ঢাকার ছাত্ররা অখুশি ছিল। ফলে ঢাকার ছাত্র শক্তির কেন্দ্র বিন্দু অঘোষিতভাবে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে চলে আসে। তার উপর ভাষা আন্দোলনের সময় মেডিক্যাল কলেজের সামনে ছাত্ররাই ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল এবং সব থেকে বেশি রক্ত ঝরেছিল মেডিক্যাল কলেজের সামনে। এর ফলেই '১৯৬২ সালের আয়ুব বিরোধী ব্যাপক গণআন্দোলনের সিদ্ধান্ত মেডিক্যাল কলেজ থেকে নেওয়া হয় এবং গোপনে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররাই তাতে নেতৃত্ব দেয়। আমি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলাম বলেই আমার উদ্দেশ্য ছিল ছাত্র আন্দোলনের অঘোষিত কেন্দ্র যাতে মেডিক্যাল কলেজেই থাকে।

আজও মনে পড়ে সেদিনকার সেই আয়ুব বিরোধী গণ বিস্ফোরণের কথা। আচমকা সেই গণ বিস্ফোরণে ঢাকার মাটি কেঁপে উঠেছিল। যে দুর্দান্ত প্রতাপশালী আয়ুবের ভয়ে মানুষ টু শব্দ করার সাহস পেত না সেই আয়ুবের বিরুদ্ধে সারা দেশের মানুষ গণবিদ্রোহে ফেটে পড়ল। পর্দার অন্তরালে থেকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের হিন্দু ছাত্রদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই যে তা সম্ভব হয়েছিল কেউই তা জানতে পারল না। সারা দেশ জুড়ে স্লোগান উঠল—মিলিটারি শাসন তুলে নাও, গণতন্ত্র ফিরিয়ে দাও। পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসন দিতে হবে ইত্যাদি। জনতা সেদিন ঢাকা শহরের সমস্ত আয়ুবের ফটো ভেঙে ফেলেছিল (তখন প্রত্যেক ঘরে, দোকানে, অফিসে আয়ুবের ফটো রাখা বাধ্যতামূলক ছিল)। এই গণ আন্দোলনে

কোনো রাজনৈতিক দলের কোনো ভূমিকাই ছিল না। অত্যাচারিত ও বঞ্চিত মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই সেদিন রাস্তায় নেমেছিল। আন্দোলনের তীব্রতায় ভয় পেয়ে গেল সামরিক শাসক গোষ্ঠী। সীমিত গণতন্ত্রের (Basic Democracy) শাসনতন্ত্র প্রবর্তন ও সামরিক শাসন তুলে নেবার প্রতিশ্রুতি দিতে হল জনতাকে শান্ত করার জন্য। যে রাজনৈতিক তৎপরতা এতদিন দমিয়ে রাখা হয়েছিল, এই ঘোষণার পর তা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। রাজনৈতিক দলগুলি আবার তৎপর হল। এই ঘোষণার ভিত্তিতে ১৯৬২ সালে পাকিস্তানে আবার ইসলামিক শাসনতন্ত্র ঘোষিত হল—যার ভিত্তি হলো বেসিক ডেমোক্রেসি।

বেসিক ডেমোক্রেসি

শুরুতেই এই বেসিক ডেমোক্রেসি বা সীমিত গণতন্ত্রের মূল চরিত্র সম্বন্ধে দু চারটি কথা বলে নেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই সীমিত গণতন্ত্রের ধোঁকাবাজি সামনে রেখেই আয়ুব খান আরও সুদীর্ঘ ৮ বছর তাঁর একনায়কতন্ত্রের শাসন চালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন। বেসিক ডেমোক্রেসি পদ্ধতিই তার একনায়কতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থার মূল শক্তি হিসাবে কাজ করেছে।

আয়ুব খান ছিলেন পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি। সামরিক শাসন জারি করে তিনি নিজেকে চিফ-মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বা প্রধান সামরিক শাসক বলে ঘোষণা করলেন। এর আগে দেশের লোক সামরিক শাসন এবং একনায়কতন্ত্রী শাসন চোখে দেখেনি। ফলে আয়ুবের উত্থান ও তাঁর এই সব ঘোষণা দেশের লোকের মনে অতিশয় ভীতির সঞ্চার করল।

এই ভীতি অমূলক ছিল না। অচিরেই আয়ুব দেশে আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার নামে অপছন্দের মানুষ, রাজনৈতিক নেতা বা বুদ্ধিজীবীদের ওপর এবং বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর চরম অত্যাচার শুরু করে দিলেন। দেশের সর্বত্র এক ভয়াবহ আতঙ্কের পরিস্থিতি কায়েম হল। বিশেষ করে রাজনৈতিক কাজকর্ম বন্ধ করার জন্য ই বি ডি ও (Ebeted Body Disqualification Order) নামে এক আদেশ জারি করে নেতাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হল। এই আইনে বলা হল যে, শাস্তিপ্রাপ্ত কোনো নেতা ভবিষ্যতে পাঁচ বা দশ বছর কোনো জন প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে না। বিচার হবে সামরিক আদালতে।

রাষ্ট্র ক্ষমতা হাতে নিয়েই আয়ুব খান ইউনিয়ন বোর্ডগুলোর নতুন নাম দিয়েছিলেন ইউনিয়ন কাউন্সিল। এই ইউনিয়ন কাউন্সিলের নির্বাচিত সদস্যদের

আস্থা ভোট নিয়েই আয়ুব রাজত্ব চালাতে থাকেন। ইউনিয়ন কাউন্সিলারদের আস্থা ভোটে নির্বাচনের দ্বারা তিনি নিজের জবর দখল করা ক্ষমতাকে একটা গণতন্ত্রের মোড়ক দিলেন এবং আইনত সিদ্ধ করলেন।

১৯৬২ সালের উপরিউক্ত শাসনতন্ত্রে বলা হয় যে, ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যরা ভোট দিয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদগুলির সদস্যদের নির্বাচিত করবে। ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের বলা হবে বেসিক ডেমোক্র্যাট। পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৪০,০০০ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ৪০,০০০ বেসিক ডেমোক্র্যাট সারা দেশের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবে। কাজেই সাধারণ নাগরিকদের আর ভোট দেবার প্রয়োজন থাকবে না। প্রেসিডেন্ট বা গভর্ণর পরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকেই তাঁর ইচ্ছেমত মন্ত্রিসভা গঠন করবেন। তবে তাঁরা ইচ্ছা করলে অন্য যে কোনো ব্যক্তিকে মন্ত্রিসভার সদস্য নিয়োগ করতে পারবেন। মন্ত্রীরা পরিষদের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে না। তারা দায়বদ্ধ থাকবে প্রেসিডেন্ট বা গভর্নরের কাছে। এইভাবে দেশের মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়ে সমস্ত ক্ষমতা পাকিস্তানের ৮০,০০০ ডেমোক্র্যাটের হাতে তুলে দেওয়া হল। এই সময় ই. বি. ডি. ও আইনটি তুলে নেওয়া হল এবং রাজনৈতিক শাস্তি প্রাপ্তদের শাস্তি মুকুব করে দেওয়া হল। রাজনৈতিক দলগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার অধিকারও রাজনৈতিক নেতাদের ফিরিয়ে দেওয়া হল। ফলে ঐ সীমিত গণতন্ত্রের পদ্ধতিকে স্বীকার করে নিয়ে তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে সক্ষম হবেন। বেসিক ডেমোক্র্যাটদের নির্বাচিত সদস্য দ্বারা সরকার গড়ার এই পদ্ধতিকেই নাম দেওয়া হল বেসিক ডেমোক্রেসি। এভাবে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের সদস্যরা (MNA) আইয়ুবের ইসলামিক শাসনতন্ত্রকে অনুমোদন দিলেন।

এই বেসিক ডেমোক্রেসির শাসনতন্ত্রনীতি ঘোষিত হবার পরই পূর্বপাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলির নয়জন নেতা একত্রে বসে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, যতদিন না তারা পূর্বের পূর্ণ গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে পারছেন, ততদিন দলগত বা ব্যক্তিগত, যে ভাবেই হোক না কেন, আয়ুব খানের বেসিক ডেমোক্রেসি মেনে নিয়ে তাঁরা তাতে কোনো রকমভাবে অংশগ্রহণ করবেন না এবং ভোটে দাঁড়াবেন না। এই নয় নেতার বিবৃতির ভিত্তিতে পরে আওয়ামি লিগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, ন্যাপ, জামাতী ইসলাম এবং আরও কয়েকটি দল এক হয়ে সুরাবর্দির নেতৃত্বে এন ডি এফ (National Democratic Front) বা জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করে।

যে নয়জন নেতা এক সঙ্গে বসে আয়ুবের নীতির বিরোধিতা করেছিলেন

তাঁরা হলেন পূর্ব বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন, আতাউর রহমান খান, আবু হোসেন সরকার এবং প্রাক্তন মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী, ইউসুফ আলি, মামুদ আলি, মুজিবর রহমান, আজিজুল হক এবং প্রাক্তন জাতীয় পরিষদ সদস্য পীর মোসলে উদ্দীন বা দুদু মিএরা।

উপরিউক্ত নয় নেতার বিবৃতি এবং তার ভিত্তিতে এন ডি এফ গঠন করেও কিন্তু আয়ুবের শক্তিকে দুর্বল করা যায়নি। এর প্রধান কারণ ছিল ঐ ৮০,০০০ বেসিক ডেমোক্র্যাট এবং তাদের আয়ুব সরকারের প্রতি আনুগত্য ও সমর্থন। এই সমর্থনের পিছনে ক্ষমতা ও অর্থের ভূমিকাই ছিল মুখ্য। প্রথমত ঐ ৮০,০০০ সদস্য বিশিষ্ট ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত ঐ সময় 'ওয়ার্কস প্রোগামের, নামে আমেরিকা থেকে শত শত কোটি টাকা আসত তাও ঐ চেয়ারম্যানের হাত দিয়েই খরচ করা হত।

সেই টাকার কোনো অডিট হত না। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে ঐ সব সদস্যরা ও তাদের চেয়ারম্যান কেন আয়ুবের পক্ষে কাজ করতে শুরু করেছিল। এই কারণেই ১৯৬২ ও ১৯৬৫ এর নির্বাচনে যে সব রাজনৈতিক নেতারা নির্দল হয়ে নির্বাচনে লড়লেন, তাদের প্রায় সকলেই পরাজিত হলেন, আয়ুব মনোনীত মুসলিম লিগের সদস্যরাই সর্বত্র জয়লাভ করল।

১৯৬২ সালের নির্বাচনে পূর্ববঙ্গে ৪০,০০০ বেসিক ডেমোক্র্যাটের মধ্যে ৫০০০ হিন্দু নির্বাচিত হয়েছিল। পরে ৬৭ সালের নির্বাচনে ৫০০০ এর মত হিন্দু নির্বাচিত হয়েছিল আর উভয় নির্বাচনেই প্রাদেশিক পরিষদে ৫ জন করে হিন্দু নির্বাচিত হয় কিন্তু কেন্দ্রীয় পরিষদে কোনো হিন্দু নির্বাচিত হয়নি। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ফরিদপুর জেলার ভবানী বিশ্বাস প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু তাতে হিন্দুদের বিশেষ কোনো উপকার হয়নি। ১৯৬৪ সালের ব্যাপক ভয়াবহ দাঙ্গার পর ভবানীবাবু বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন যে দাঙ্গা ব্যাপক হয়নি এবং হিন্দুদের ভীত হবার তেমন কোনো কারণ নেই। তিনি আরও বলেন যে, সরকার কঠোর হাতে দাঙ্গা দমন করেছে। ফলে তাতে হিন্দুর বিশেষ ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

তবে তিনি হিন্দুর কোনো উপকারই করেননি তা বলা চলে না। ঢাকার অ্যাডভোকেট সুধাংশু হালদারের ভাই সুভাষ হালদার তৃতীয় বিভাগে এইচ এস সি পাশ করেও ভবানীবাবুর চেষ্টায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হবার সুযোগ পায় এবং যথা সময়ে ডাক্তারি পাশ করে ডাক্তার হয়।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রাদেশিক সরকারে ভবানীবাবু মন্ত্রী থাকলেও কেন্দ্রীয় সরকারে কোনো হিন্দু মন্ত্রী আয়ুব আমলে ছিল না। অথচ একটা বিরাট সংখ্যক হিন্দু পাকিস্তানে বাস করত।

গোপালগঞ্জের দাঙ্গা

আয়ুব খানের সামরিক শাসনের একটি অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুদের বিতাড়িত করে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে জনসংখ্যার সমতা আনয়ন করা। কারণ তা করতে পারলে পূর্ব পাকিস্তান সংখ্যাগরিষ্ঠের ফলে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। তাই সামরিক শাসনের প্রথম চার বছর ধরে পূর্ববাংলার হিন্দুদের উপর চলেছিল অকথ্য অত্যাচার। কিন্তু তা সত্ত্বেও খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর ও বরিশালের হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে হিন্দুর সংখ্যা তেমন একটা কমল না। তাই হিন্দুদের উপর চরম আঘাত হানার জন্য এক পরিকল্পনা পাক সরকার নেয়। তার মূল উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণবঙ্গ থেকে হিন্দুদের দলে দলে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করা।

এই পরিকল্পনা অনুসারেই ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার হাটবাড়িয়া গ্রামে দাঙ্গা বাধানো হয়। সাজানো একটা সামান্য অজুহাতে মুসলমানরা অতর্কিতে হিন্দুদের আক্রমণ করে। ওদিন কোনো এক মুসলমানের গরুতে হিন্দুর ক্ষেতের ধানের চারা খাচ্ছিল। গরুর মালিক কাছে থেকেও গরুকে ফিরিয়ে নেবার কোনো চেষ্টা করে না। এই নিয়ে কথা কাটাকাটি শুরু হয় এবং মুসলমানরা জমির মালিককে বেদম মারধর করে। হিন্দুরা তাকে বাঁচাতে গেলেই দুই দলের মধ্যে মারামারি শুরু হয়ে যায়।

মুসলমানরা আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। তারা দল বেঁধে গ্রাম আক্রমণ করে। বাঁচার তাগিদে হিন্দুরাও রুখে দাঁড়ায় এবং প্রতি আক্রমণে বেশ কয়েকজন মুসলমান ঘায়েল হয়। সাময়িক ভাবে মুসলমানরা তখন পিছিয়ে যায়। পরে তারা আবার আক্রমণ করবে সে খবর পেয়ে রাতের মধ্যেই হিন্দুরা ঘোড়ায় চড়ে সব জায়গায় খবর পৌছে দেয়। ফলে হাজার হাজার হিন্দু গ্রাম রক্ষার জন্য সেখানে জড়ো হয়।

এদিকে, পাকিস্তান হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুদের হাতে মার খেয়ে মুসলমানদের মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহা প্রবল হয়ে ওঠে। অচিরেই তারা হিন্দুগ্রামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হিন্দুরাও প্রাণপণ করে তাদের বাধা দেয় এবং প্রতি আক্রমণ চালায়। ফলে বেশ কয়েকজন মুসলমান মারা পড়ে এবং বহু আহত হয়। মুসলমানরা ফিরে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু বিকালের দিকে একদল পুলিশকে সামনে রেখে তারা আবার আক্রমণ

চালায়। প্রথম দিকে হিন্দু বীরেরা বাধা দিতে এগিয়ে যায় এবং পুলিশের গুলিতে দু-এক জন মারা যায় এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়। ফলে তারা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়। সেই সুযোগে মুসলমানরা গ্রামে ঢুকে লুটপাট করতে থাকে। মেয়েদের ওপর অত্যাচার চালায় এবং ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়।

এ ভাবে পুলিশকে সরাসরি মুসলমানদের পক্ষ নিয়ে দাঙ্গায় অংশ নিতে দেখে হিন্দুরা হতবাক হয়ে পড়ে। বাঁচার জন্য সাহায্যের আশায় ঢাকা ছুটে যায় তারা। তখনকার আয়ুবের হিন্দু বিদ্বেষী নীতির ফলে তেমন বিশেষ কোনো হিন্দু নেতাই ঢাকায় ছিলেন না। তখন আর কোনো উপায় না দেখে জগন্নাথ হলের ছাত্র ধীরেন হালদার কে বললাম এবং তাঁকে সঙ্গে করে ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ হক সাহেবের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেলাম। গোপালগঞ্জের দাঙ্গার কথা তাকে সংক্ষেপে জানালাম। তাঁর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করলাম। তাঁদের কাছে খবর ছিল আগের দিন সকালেই হিন্দুদের সামনে দাঁড়াতে না পেরে মুসলমানরা ফিরে গেছে এবং দাঙ্গাও বন্ধ হয়ে গেছে।

খুব ধীর স্থির ভাবে তিনি আমাদের কথা শুনলেন এবং বললেন, ওটা হিন্দু সমাজের শক্ত ঘাঁটি। ওখানে মুসলমানরা কোনোদিনই দাঙ্গায় জয়ী হতে পারেনি। পুলিশের খাতায় ঐ অঞ্চলটি দাঙ্গা প্রবণ এলাকা বলে চিহ্নিত। ভয়ের আর কোনো কারণ নেই। গতকালই দাঙ্গা থেমে গেছে। আর সব থেকে বড় কথা হল, পদ্মবিলার কাজিয়ার পরে মুসলমানরা ঐ অঞ্চলে দাঙ্গা করার সাহস পায়নি। পাকিস্তান সৃষ্টির পরও ঐ অঞ্চলে কোনো দাঙ্গা হয়নি। অথচ পূর্ববাংলার প্রায় সব অঞ্চলেই কোথাও না কোথাও দাঙ্গা হয়েছে। তবে আকস্মিকভাবে বৃহত্তর দশ মহলের কালশিরা থেকে পঞ্চাশ সালের বৃহত্তম দাঙ্গা শুরু হয়েছিল।

আমরা তখন তাকে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বললাম গতকাল সকালের দিকে মুসলমানরা পিছিয়ে গেলেও বিকালের দিকে তারা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে আবার আক্রমণ চালায়। তারা লুটপাট করে এবং ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিতে থাকে। প্রথম দিকে তিনি আমাদের কথা বিশ্বাস করতেই চাইলেন না। তখন আমরা তাঁকে অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বলি — আপনি শান্তিরক্ষী প্রশাসনের প্রধান। তাই খোলাখুলিভাবে আপনার কাছে জানাতে চাই যে আমাদের কথা সম্পূর্ণ সত্য। এবার আপনি বলুন যে আমরা মানসম্মান, ধন সম্পত্তি ও জীবন নিয়ে শান্তিতে বসবাস করতে পারব কি না? আপনি পুলিশ ফিরিয়ে আনুন, নয়ত তাদের নিরপেক্ষ থাকতে বলুন। পুলিশ যদি সত্যিই নিরপেক্ষ থাকে তবে আমরা আমাদের শক্তিতেই বাস করব।

নয়ত যুদ্ধ করে মরব। তবুও মাতৃভূমি ত্যাগ করব না।

শেষ পর্যন্ত তার পি. এর কাছে আমাদের কথার সত্যতা জেনেই তিনি গোপালগঞ্জের পুলিশ অফিসার ও ফরিদপুরের এস পি কে রেডিও গ্রামে দাঙ্গা থামাতে আদেশ দেন এবং দরকার হলে গুলি চালাবার নির্দেশও দেন। তাতে দাঙ্গা থেমে যায়।

পদ্মবিলার কাজিয়া

এই সময়ে আই জি হক সাহেব পদ্মবিলার কাজিয়ার প্রসঙ্গ তুললেন। তাই সে সম্বন্ধে আমাদেরও কিছু বলতে হল। বর্তমান পাঠকদের এ ঘটনা জেনে রাখার কিছুটা প্রয়োজন আছে।

বিখ্যাত পদ্মবিলার ঘটনার কোনো লিখিত বিবরণ নেই। ঐ অঞ্চলের বয়স্ক মানুষজনের মুখে মুখে এ ঘটনার বিবরণ চলে আসছে। এ সম্বন্ধে কিছু ছড়াও ঐ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে প্রচলিত আছে।

সেটা ১৯২৩ সালের ঘটনা। ফরিদপুর জেলার ওড়াকান্দি গ্রামের কাছেই পদ্মবিল নামে একটি বিল ছিল। তার পাশের গ্রামের নাম ছিল পদ্মবিলা। সেই গ্রামে শুধু হিন্দুরাই বসবাস করত। পাশের গ্রামে ছিল মুসলমানদের বাস। ঘটনার সূত্রপাত হয় বিলের মাছ ধরা নিয়ে কয়েকজন হিন্দু ও কয়েকজন মুসলমানের কথা কাটাকাটির মধ্য দিয়ে। পরে তা মারামারির রূপ নেয় এবং মুসলমানরাই বেশি মার খায়। ফলে পরের দিন তারা হিন্দু গ্রাম আক্রমণের পরিকল্পনা করে এবং প্রস্তুতি নেয়।

এই খবর শুনে ওড়াকান্দির শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। পরের দিন খবর এল যে, কাজিয়া করার জন্য মুসলমানরা প্রচুর সংখ্যায় বিলের কাছে জড়ো হয়েছে এবং যে কোন সময় তারা হিন্দু গ্রামে আক্রমণ করতে পারে। সেদিন ছিল মতুয়া ধর্ম্মমতের প্রবর্তক শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মদিন। ঐ দিন ওড়াকান্দিতে বারুণীর স্নান ও মেলা বসত। কাজেই মতুয়া সম্প্রদায়ের বহু হিন্দু সেদিন ওড়াকান্দিতে জড়ো হয়েছিল। শ্রীশ্রী ঠাকুর তখন মতুয়া হিন্দুদের মুসলমানদের ওপর বীরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ার আদেশ দিলেন।

সেদিন যে সব হিন্দু বীরেরা ঠাকুরের কাছে হিন্দুদের সুরক্ষার প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন, ঠাকুর তাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন একটি করে লাঠি। লাঠি হাতে দিয়ে ঠাকুর বলেছিলেন—এই লাঠি এত কাল হিন্দুদের রক্ষা করেছে। আজও তা

হিন্দুদের রক্ষা করবে। তিনি নেতাদের উদ্বুদ্ধ করতে বলেছিলেন ডঙ্কার বাদ্যে যে "যুদ্ধ জয় যুদ্ধ জয়' বাণী ধ্বনিত হচ্ছে তা তো তোমরা নিজ কানেই শুনতে পাচ্ছ। তারপর শ্রীশ্রী ঠাকুর হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন—আজ থেকে এই ডঙ্কার নাম হল জয়ডঙ্কা।"

ঠাকুরের আদেশ পেয়েই সেদিন হাজার হাজার মতুয়া রণহুঙ্কারে ওড়াকান্দির আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলল। তাড়াতাড়ি বারুণীর পুন্যস্নান সেরে সড়কির মাথায় লাল নিশান উড়িয়ে জয়ডঙ্কা ও কাঁসি বাজিয়ে, কপালে লাল সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে, শিঙ্গা ফুঁকাতে ফুঁকাতে রণযাত্রা করল। দুপক্ষেই হাজার হাজার মানুষ সামনা সামনি দাঁড়িয়ে। মতুয়াদের রণসাজ দেখে মুসলমানরা একটু থমকে গেল। পরক্ষণেই 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিয়ে তারা প্রথম আক্রমণ করল। মতুয়ারাও সঙ্গে সঙ্গে 'জয় হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুর' জয় মা কালী বলে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের চরম প্রত্যাঘাতে মুসলমানদের ব্যূহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। হিন্দুরা তখন চরমভাবে ক্ষিপ্ত। মুসলমানদের নাগালের মধ্যে পেয়ে তাদের হত্যা করতে থাকল। পরাজিত মুসলমানদের দল পালাতে শুরু করল। মতুয়ারা পিছু ধাওয়া করে অনেককে হত্যা করল আর বাকিদের তাদের গ্রাম পর্যন্ত ধাওয়া করে নিয়ে গেল। কিন্তু গ্রামে ঢুকে হিন্দুরা কোনো অত্যাচার করেনি। কোনো ঘরে আগুনও দেয়নি।

এই বিখ্যাত পদ্মবিলার কাজিয়ায় সেদিন কত মুসলমান মারা গিয়েছিল কোনো সরকারী রিপোর্টে তার হিসাব নেই। আর অনেক দিন আগের ঘটনা বলে সঠিক সংখ্যা বলার মতো কোনো লোকও আজ জীবিত নেই। প্রচলিত ছড়া ইত্যাদিতে প্রচার হয়ে আসছে যে সেদিনকার সে কাজিয়ায় হাজার হাজার মুসলমান মারা গিয়েছিল। তবে এসব প্রচলিত লোককথা থেকে সহজেই অনুমান করা চলে যে এক বিরাট সংখ্যক মুসলমান সেদিনের পদ্মবিলার কাজিয়ায় মারা গিয়েছিল।

মুসলমানদের তাদের গ্রাম পর্যন্ত তাড়িয়ে দিয়ে ফেরার পথে হিন্দুরা দেখতে পায় যে, শত শত মুসলমানদের মৃতদেহ বিলের মধ্যে পড়ে আছে। তা দেখে তারা বেশ ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় তাদের মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে যায়। তিন চারজন মিলে একটা করে মৃতদেহ তারা বয়ে নিয়ে আসে এবং অনাবাদি বিলের ঘাসের চটানের নীচে তা পুঁতে রাখে। আর ঠাকুরের আশীর্বাদে সেদিন সমস্ত রাত ধরে প্রবল বৃষ্টি হয়। ফলে বিলের জল ২/৩ হাত উঁচু হয়ে সব ঢাকা পড়ে যায়। ফলে পরের দিন পুলিশ এসে দাঙ্গার কোনো চিহ্নই খুঁজে পায় না।

তৎকালীন ব্রিটিশ আমলে উচ্চপদের পুলিশ অফিসাররা ইংরেজ হলেও

নিম্নস্তরের প্রায় সব পুলিশ অফিসারই ছিল হিন্দু। কাজেই ব্যাপারটা ওখানেই চাপা পড়ে যায়। পরবর্তী কালেও এ নিয়ে তেমন কোনো হৈচৈ হয়নি। তা ছাড়া ডা. মিড এর প্রচেষ্টায় সেখানে যে খ্রীস্টান প্রচারকেন্দ্র গড়ে ওঠে তার পাদ্রীরা পুলিশের বাড়াবাড়িতে বাধা দেয়। ফলে দাঙ্গার ব্যাপারে কোনো মামলাও আদালতে দায়ের করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। প্রথম দিকে কিছু সংখ্যক লোক গ্রেপ্তার হলেও পরে তারা সবাই মুক্তি পায়।

সাতপাড় সংখ্যালঘু সম্মেলন

গোপালগঞ্জ মহকুমার সদর ও আশে পাশের হিন্দু অধ্যুষিত বিরাট অঞ্চল নিয়ে হিন্দু লবি একটি শক্তিশালী হিন্দু বলয় গঠনের চিন্তা করে। এই চিন্তা ধারায় বিশেষ ভাবে সাতপাড় গ্রামকে উপযুক্ত স্থান মনে করে সাত পাড়কেই তারা কেন্দ্র বিন্দু গঠন করার কথা ভাবে। এই কাজের সুবিধার জন্য সাতপাড়ে একটি কলেজ হলে সুবিধা হবে ভেবে সেখানে একটি কলেজ করার কথাও তারা চিন্তা করে। তার পরেই হিন্দু লবির একান্ত প্রেরণায় ও সাধ্যমত সাহায্য ও সহযোগীতায় আর শ্রী বীরেন বিশ্বাসের একান্ত প্রচেষ্টা ও আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের বিশেষ সহযোগীতায় সাতপাড় গ্রামে গড়ে ওঠে একটি কলেজ। পরে ঐ শক্তি বলয়ের দক্ষিণ প্রান্তে তথা খুলনা বরিশাল ও ফরিদপুর জেলার মিলন কেন্দ্র মাটিভাঙায় তাদের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে আর একটি কলেজ। এই ভাবনা চিন্তাকে চূড়ান্ত রূপ দিতে ১৯৬৩ সালের জানুয়ারী মাসে "পূর্ব বঙ্গ সংখ্যালঘু" সম্মেলন ডাকা হয়। এই হিন্দু ভিতকে আরও শক্তিশালী করতে ১৯৭০ সালে "গনমুক্তি" দলের প্রকাশ্য অধিবেশনও ডাকা হয়। এর ভিত গড়তে বরিশাল জেলায় শ্রী চিত্তরঞ্জন সুতার মহাশয়ের বাড়িতে বসে হিন্দু লবির কয়েকজন সদস্য ঘরোয়া বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেন যে, সাত পাড়ে সংখ্যালঘু সম্মেলন ডাকা হবে। সেই সম্মেলন ডাকার দায়িত্ব ভার স্বেচ্ছায় নিয়েছিলেন গোপালগঞ্জের বিশিষ্ট হিন্দু নেতা ডা. জ্ঞান বিশ্বাস। একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করে তিনি সম্মেলনের ডাক দেন।

ঢাকা জগন্নাথ হলের ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রী ধীরেন হালদারকে সঙ্গে নিয়ে সম্মেলনের আগের দিন ভোরে আমি সাতপাড় পৌঁছাই। সাতপাড় হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রী বীরেন বিশ্বাসের সঙ্গে আমরা প্রথম দেখা করি। বীরেন বিশ্বাস ছিলেন ধীরেন হালদারের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তারা দুজনেই বাগের হাট কলেজে এক ক্লাসে পড়েছেন ও একসঙ্গে হোস্টেলে থেকেছেন। আমার সাথে তার এই প্রথম পরিচয়। ওখানের পরিস্থিতির কথা জানাতে গিয়ে তিনি বললেন যে, তখন কার প্রাদেশিক

সরকারের মন্ত্রী শ্রীভবানী বিশ্বাস আয়ুব খানকে ধন্যবাদ ও তার সরকারকে সমর্থনের প্রস্তাব তিনি ঐ সম্মেলনে পাশ করাতে চান। সেজন্য সম্মেলনের দুদিন পূর্বেই তার লঞ্চ সাতপাড়ের ঘাটে এসে নোঙর করেছে। বীরেন বাবু জানালেন, তিনি এই প্রস্তাবের ঘোর বিরোধী। তিনি ও ঐ অঞ্চল বাসী সকলে সর্বশক্তি দিয়ে সে প্রস্তাবে বাধা দেবেন। তিনি বললেন যে, তিনি একজন নিরীহ শিক্ষক। সবার সাথে মিলে মিশে তাকে চলতে হয়। এ সম্মেলনের মূল বক্তব্য রাজনৈতিক। তিনি রাজনীতিতে জড়াতে চাননা। আমরা তাকে বার বার বুঝালাম "এটা রাজনীতি নয় এটা হিন্দুদের বাঁচার নীতি, মাতৃ ভূমিতে টিকে থাকার নীতি।" তাতে তিনি কিছুটা সক্রিয় হয়েই সেদিন সন্ধ্যায় স্থানীয় নেতাদের ডাকলেন, তাদের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন এবং ভবানী বাবুর ভাবি প্রস্তাব পাশকে রুখেদিতে তাদের অনুরোধ জানান। বীরেন বাবুর কথায় একমত হয়ে তারাও বীরেন বাবুকে সক্রিয় ভাবে তাদের পাশে থাকার অনুরোধ জানান। সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন সাতপারের ডাঃ সারদা বিশ্বাস, শ্রী সুরেন বালা, শ্রী জলধর কির্ত্তনীয়া, শ্রী সুধীর বিশ্বাস, শ্রী অর্জুন বিশ্বাস, ধুধামাদ্রা গ্রামের শ্রী মনোরঞ্জন হীরা। এদের অনেকেই হিন্দু লবির কথা জানতেন ও চিত্ত বাবু ও আমাদের পরিচিত ছিলেন। চিত্ত বাবু মূলবক্তা হবেন তাও তারা জানতেন। পরের দিন ভোরে শ্রী চিত্ত রঞ্জন সুতার (প্রাক্তন এম,পি,এ), শ্রী নীরোদ মজুমদার, শ্রী নীরোদ নাগ (প্রাক্তন এম,পি,এ) অন্যান্য নেতাদের নিয়ে বরিশাল থেকে সাতপাড় পৌঁছান। চিত্ত বাবুর সাথে বীরেন বাবুকে আমি পরিচয় করিয়ে দেই। এরপর চিত্ত বাবুর সেখানে পৌঁছানোর খবর পেয়ে স্থানীয় নেতাগন আসেন ও বীরেন বাবু তাদের সাথে চিত্ত বাবুর পরিচয় করিয়ে দেন। তারাও চিত্ত বাবুকে আশ্বাস দেন যে, কোনো অবস্থাতেই তারা ভবানী বাবুর ভাবি প্রস্তাব সভায় পাশ হতে দেবেন না। কিন্তু সেদিন নতুন যোগ দিয়েছিলেন ধর্মরায় বাড়ির শ্রী মুকুন্দ সরকার ও কেয়ানিয়ার শ্রী মহাদেব বালা। কিন্তু ডাঃ জ্ঞান বিশ্বাস মন্ত্রী ভবানী বিশ্বাসের পক্ষে চলে যান।

এই সম্মেলনে যে সব নেতৃবৃন্দ যোগ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঢাকার ধীরেন মন্ডলের সঙ্গে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, খুলনার শ্রীকুবের বিশ্বাসের (প্রাক্তন এম,পি,এ) সাথে ডাঃ জ্ঞান বালা, ডাঃ দেবেন মন্ডল সহ অন্যান্য নেতৃবর্গ। যশোরের এ্যাডভোকেট উপেন বিশ্বাস ও সেখানকার নেতৃবৃন্দ। ফরিদপুরের শ্রী নীল কমল সরকার (প্রাক্তন এম,পি,এ), গৌর বালা (প্রাক্তন এম,পি,এ) মন্ত্রী ভবানী বিশ্বাস ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ সহ অন্যান্য অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ। বরিশালের কথা আগেই বলা হয়েছে।

সভার শুরুতেই ভবানী বাবুর সাথে আমাদের যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। সভার

সভাপতি কে হবেন তা নিয়েই ছিল সেই যুদ্ধ। মন্ত্রী ভবানী বিশ্বাস সভাপতি হতে চান - আমরা তা হতে দেব না। শেষ পর্যন্ত বোলতলী ইউনিয়ন কাউন্সিলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অতি বৃদ্ধ শ্রী বিষ্ণুপদ বিশ্বাস সভাপতি নির্বাচিত হলেন। সভা পরিচালনায় তাকে সাহায্য করলেন প্রাক্তন এম, পি, এ শ্রী গৌর বালা।

অনেক বক্তা সেদিন পাক সরকারের বিরূদ্ধে অত্যাচার অবিচার ও বিমাতৃ - সুলভ আচরণের নিন্দা করেন। অনেকে হাটঝরিয়ায় কাজিয়ার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। এ সব বক্তব্যের মধ্যে ভবানীবাবু বার বার বাধা দেন। তাতে সভায় মাঝে মাঝে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। প্রত্যেক বারই শ্রোতারা চেঁচিয়ে তা থামিয়ে দেন। এ ভাবেই ও দিনের সভা শেষ হয়।

পরের দিন সাতপাড় গ্রামের সুরেন বালার প্রচেষ্টায় সেদিনের সভায় সভাপতির সাহায্যকারী মনোনীত হন শ্রী বীরেন বিশ্বাস। সভাপতির নির্দেশে ঐ দিন প্রথমেই চিত্ত বাবু বক্তৃতা শুরু করেন। এই দিনও পূর্বের দিনের মত ভবানী বাবু বাধা দিতে থাকেন। তা উপেক্ষা করেই চিত্ত বাবু তার বক্তব্য বলতে থাকেন। সেই মর্মস্পর্শী বক্তব্যে শ্রোতারা মোহিত হয়ে তার বক্তব্য শুনতে থাকেন। তারা দেখেন যে, তাদের প্রাণের কথাই চিত্ত বাবু বলছেন। শ্রোতাদের মনোভাব টের পেয়েই ভবানী বাবু আরও বেশি করে বাধা দিতে থাকেন। তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে ভবানী বাবুর বিরুদ্ধে কুৎসিৎ ভাষা প্রয়োগ করে চিৎকার করে শ্রোতারা তাকে থামিয়ে দেন। শ্রোতারা ভবানী বাবুর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিবাদ করতে থাকে তখন তিনি রাগের চোটে হুমকি দিয়ে বলেন পুলিশ ডেকে তিনি সভা ভেঙে দেবেন। এই হুমকির ফলে শ্রোতারা প্রতিবাদে মুখর হয়ে আরও হই হল্লোর করতে থাকে। আর সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাদের মধ্যে থেকে শ্রী সুরেন বালা গর্জে উঠে বলেন, ভবানী বাবু এখানে এসেছেন হিন্দু প্রতিনিধি হয়ে - মন্ত্রী হিসাবে নয়। এই সভায় সভাপতির কথাই শেষ কথা। পুলিশের ভয় দেখাবেন ঢাকা গিয়ে। এ সম্মেলন ভাঙার ক্ষমতা তার নেই। সাথে সাথে শ্রোতারা সুরেন বাবুর বক্তব্য চিৎকার করে সমর্থন করতে থাকেন। এই ঘটনায় মন্ত্রী ভবানী বাবুর রাজশক্তি চুপষে যায়। এর পরে সভায় আয়ুব খানের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব পেশ হয় এবং সর্ব সমর্থনে তা পাশ হয়। ভবানী বাবু শ্রোতা হয়ে চুপ করে বসে থাকেন। তার প্রস্তাব তিনি আর পেশ করলেন না। এর পর সভাপতির স্বল্প ভাষনের পরে সম্মেলন শেষ হয়। কিন্তু সম্মেলনে হিন্দুদের বাঁচার জন্য বাস্তব মুখী কোন প্রস্তাব পাশ করান সম্ভব হয় নি।

এই ভাবে সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলেও একটা ব্যাপার আমাদের কাছে

পরিষ্কার হয়ে গেল। আমরা বুঝতে পারলাম যে, গ্রামের সাধারণ মানুষও সব রকম ভয় ভীতি উপেক্ষা করে স্বেচ্ছাচারী আয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে তাদের ধিক্কার ও অনাস্থা প্রকাশ করার সাহস রাখে। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা কম থাকতে পারে — কিন্তু তাই বলে লোভ বা ভয় দেখিয়ে, এমনকি হুমকি দিয়েও তাদের বিপথে চালিত করা সম্ভব নয়। গ্রামের সাধারণ মানুষের এই সততা ও সাহস আমাদের মুগ্ধ করে। তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা সহস্রগুণ বেড়ে যায়।

১৯৫৪ সালে পূর্ববঙ্গে সাধারণ নির্বাচন কালে মুসলিম লীগের মন্ত্রী দ্বারিক বারুরীর বিরুদ্ধে মাদারীপুরের সেনদিয়া গ্রামে পৌষ মেলার স্থানের লাগোয়া মাঠে ঢাকার হিন্দু ছাত্ররা গিয়ে একটি সভা ডাকি। সভায় সভাপতি হন্ ধন্য ঘরামী। মন্ত্রী দ্বারিক বারুরীর ভাই (ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান) বরোদা বারুরী তার ভ্রাতৃবৃন্দ ও দলবল নিয়ে সেই সভা ভাঙতে আসে ও সভায় উপস্থিত লোকজনদের আক্রমণ করে। এই আক্রমণের প্রতিবাদে মেলার দোকান দাররা ও মেলার দর্শকরা প্রতি আক্রমণ করে ও তাদের বেদম পিটুনী দেয়। তাতে বারুরী ভায়েরা ও তাদের আত্মীয় স্বজন সহ কুড়ি - পঁচিশ জন আহত হয়।

১৯৬৫ সালে জলির পাড়ে এক বিরাট জনসভা ভাঙতে মন্ত্রী ভবানী বিশ্বাসের লোক জনকে মারাত্মক ভাবে আহত হতে দেখেছি। কলা বাড়ী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বুদ্ধিমন্ত বিশ্বাসের হাতের হাড় ভেঙে যায়। সাত আট জন জলিরপার মিশন হাসপাতালে ভর্তি হয়। সে সভার সভাপতি ছিলেন জলির পাড় ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নিত্য মজুমদার। সরকারি চাকুরি করা সত্ত্বেও সে সভায় আমি উপস্থিত হই। চিত্ত বাবুও সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। হান্টার সাহেবের দেওয়া উপাধি "নমঃ সমাজ যোদ্ধার জাতি"। এই সব ঘটনাবলী সেই আখ্যা বা উপাধিকে সার্বিক ভাবে প্রমাণ করে।

বিরাট হিন্দু বলয়ের - বিশেষ করে গোপালগঞ্জ কে কেন্দ্র করে ফরিদপুর ও আশ পাশ অঞ্চলের নমঃ সমাজের রক্তে শৌর্য বীর্যের কিছু বিশেষত্ব আছে তা হিন্দু লবি স্বীকার করত। তারা জাগলে অনেক অঘটনই ঘটতে পারত বা পারে এ বিশ্বাসও হিন্দু লবির ছিল। শ্রী পি আর ঠাকুর এই বিশ্বাস নিয়েই সীমান্তে বাড়ী করেছিলেন।

শ্রীশ্রী হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুর (১৮১২ - ১৮৭৮)

মহাপুরুষ শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার সাফলীডাঙ্গা গ্রামে, বাংলা ১২১৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন ও মৃত্যু হয় ১২৮৪ তে। পরে ওড়াকান্দি গ্রামেই তিনি বসবাস করতে শুরু করেন এবং সেটাই তাঁর লীলাক্ষেত্র

হয়ে ওঠে। তিনি মতুয়া ধর্ম নামে (হিন্দু ধর্মের অধীন) একটি ধর্মমত প্রচার করেন।

শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ছিলেন নমঃ সম্প্রদায়ের লোক। সেই কারণে তাঁর অনুগামিদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল নমঃ সম্প্রদায়ভুক্ত। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষও তাঁর শিষ্য ছিল। এমন কি কিছু সংখ্যক মুসলমানও তাঁর শিষ্য গ্রহণ করেছিল। শিষ্যরা তাঁকে অবতার জ্ঞানে পূজা করে থাকে। তাঁর পুত্র শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরকেও শিষ্যরা শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের অংশরূপে পূজা করে থাকে।

তাঁরা দুজনেই ছিলেন সিদ্ধপুরুষ। উভয়ের জীবনেই অনেক অলৌকিক ঘটনার ইতিহাস আছে। কথিত আছে যে শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর একদিন তারই বাইনোকুলারের সাহায্যে ডা. মিডকে অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থানরত তার মাকে দেখান। তিনি বলতেন, হাতে কাম [illegible] রিনাম, তাতেই সবাই যাবে স্বর্গধাম। শিষ্যরা কীর্তন করতে করতে মাতোয়ারা হ[illegible] [illegible]েত বলে তিনি তাদের নাম দেন 'মতুয়া'।

ঠাকুর বাড়িতে দুর্গাপূজা, রাস উৎসব ও দোল উৎসব সহ সব হিন্দু উৎসব খুব জাঁকজমক করে পালিত হত। সব থেকে বড় উৎসব হত ঠাকুরের জন্মদিন বারুণীর স্নানের দিন। ঐ দিন লক্ষ লক্ষ ভক্ত শিষ্য জয়ডঙ্কা, কাঁসি বাজিয়ে, শিঙা ফুঁকিয়ে, হরি বোল, হরি বোল ধ্বনি দিতে দিতে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলত। ঠাকুরের দেওয়া লাল নিশান উড়িয়ে, জয় ঠাকুর, ধ্বনি দিতে দিতে নাচতে নাচতে লক্ষ [illegible] [illegible] ওড়াকান্দিতে জমায়েত হত। দূর দূরান্ত থেকে আসা ভক্তদের কোলাহলে ওড়াকান্দি তখন গমগম করত। সাত দিন ধরে মেলা বসত। সেখানে এখনও মেলা বসে।

এই জয়ডঙ্কা, শিঙা, কাঁসি আর লাল নিশান সবই যুদ্ধের প্রতীক। এই নিশানের লাঠির উপরে আছে ছুঁচাল ফলা, যাতে দরকারের সময় তাকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এই যুদ্ধের ডাক স্বয়ং ঠাকুর দিয়ে গিয়েছেন অধর্মের বিনাশ [illegible] ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য। তারপর পদ্মবিলার কাজিয়ার সময়ে শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর মতুয়াদের হাতে তুলে দিয়েছেন লাঠি। অন্যায় অত্যাচার আর অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার হাতিয়ার হল সেই লাঠি।

শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের তিরোধানের পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর মতুয়া সম্প্রদায়ের গুরু হন। এই সময় মতুয়া ধর্মের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে। শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর মতুয়া ধর্ম প্রচারের সঙ্গে পিছিয়ে পড়া অনুন্নত ও অশিক্ষিত সমাজের মানুষদের শিক্ষিত ও উন্নত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। গ্রামে গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা, যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাস্তা তৈরি, প্রত্যেক বাড়িতে পায়খানা

তৈরি ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজ কর্মের অঙ্গ ছিল। এ ছাড়া সর্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকার উপরও তিনি জোর দিতেন। ঠাকুর পূজা সহ অন্যান্য পূজা ও অনুষ্ঠানও তিনি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে করার উপদেশ দিতেন।

এইভাবে একদিকে তিনি ছিলেন ধর্মগুরু এবং অন্য দিকে সমাজ সংস্কারক। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই ঐ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে শিক্ষা ও উন্নতিতে জাগরণ আসে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নামও চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সত্য কথা বলতে গেলে পূর্ববঙ্গের নমঃ সমাজের উন্নতির মূলে রয়েছে তাঁরই অবদান। ওড়াকান্দিতে তিনি শিক্ষার যে প্রথম প্রদীপটি প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন, কালে তার আলোতে বহুদূর আলোকিত হয়। তাঁর শিষ্যরা সেই আলো দূর দূরান্তে তাদের নিজ নিজ গ্রামে নিয়ে যায়। ফলে সেই প্রত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রামগুলোও শিক্ষার আলোতে আলেকিত হতে শুরু করে। তাঁর একক প্রচেষ্টার ফলেই নমঃ সমাজের মানুষেরা উন্নতির সুযোগ পায়। অনেককে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায়।

ধর্ম শিক্ষার সঙ্গে শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর তাঁর শিষ্যদের রাজনৈতিক উপদেশও দিতেন। তিনি তাদের বলতেন—যে জাতির নাই রাজা, সে জাতি নয় তাজা। যার দল নাই, তার বল নাই।

দেশভাগের পর তাঁরই সুযোগ্য নাতি, ব্যারিস্টার ও প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীপ্রমথ রঞ্জন ঠাকুর, সংক্ষেপে পি আর ঠাকুর-এর একান্ত প্রচেষ্টায় উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ঠাকুরনগরে গড়ে উঠেছে এক অত্যাধুনিক উন্নত উপনিবেশ। আগে যেখানে ছিল উলুঘাসের মাঠ, এখন সেখানে হয়েছে একটি রেল স্টেশন, দুটি হাইস্কুল ও একটি হাসপাতাল। গড়ে উঠেছে সর্বত্র পাকা রাস্তা সহ ব্যবসা বাণিজ্যের এক কেন্দ্র। ঠাকুর মহাশয় তাঁর বসত বাড়িটির নাম রেখেছেন 'Exile' বা নির্বাসন। বাড়ির এই নামকরণের মধ্যে দিয়ে ঠাকুর মহাশয় তাঁর মনোভাব সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। ওড়াকান্দিই হল তাঁর প্রকৃত বাসস্থান। জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি নির্বাসনের জীবনই অতিবাহিত করে গেলেন।

যেদিন থেকে ঠাকুর মহাশয় ঠাকুরনগরের এই বাড়িতে বসবাস করা শুরু করেছেন সেদিন থেকেই ঠাকুরনগর একটি ধামে, একটি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এই ঠাকুরনগরেই আজ প্রতি বছর ঠাকুর শ্রীশ্রী হরিচাঁদের জন্মদিনে লক্ষ লক্ষ মতুয়া সমবেত হয়। এখানের দুধপুকুরেই তারা বারুণীর স্নান করে পুণ্য অর্জন করে। আজ এই ঠাকুরনগরেই সাত দিন ধরে মেলা বসে। সে মেলায় ওড়াকান্দির মতো লক্ষ লক্ষ মানুষ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসে। তারা আসে আসাম মহারাষ্ট্র

মধ্যপ্রদেশ বিহার উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। আসে আন্দামান থেকেও।

ডা. সি এস মিড'এর ওড়াকান্দি আগমন

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় লক্ষ লক্ষ মানুষ চলে, এ কথা শুনেই বিশিষ্ট পণ্ডিত, মিশনারি পাদ্রী ডা. সি এস মিড ওড়াকান্দি এসে শ্রীশ্রী ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করেন। প্রথম জীবনে ডা. মিড পেশায় ছিলেন একজন ডাক্তার। শ্রীশ্রী ঠাকুর মহাশয়কে তিনি বলেন যে ঐ অনুন্নত ও অশিক্ষিত অঞ্চলে তিনি চিকিৎসার সুব্যবস্থা ও শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে আগ্রহী। তিনি সেখানে একটি মিশন স্থাপন করে সেখানে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও একটি হাইস্কুল গড়ে তোলার জন্য ঠাকুর মহাশয়ের অনুমতি ও সহযোগিতা প্রর্থনা করেন। আর এই মিশন স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জমিও তিনি প্রার্থনা করেন।

ঠাকুর মহাশয় তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন এবং প্রয়োজনীয় জমির ব্যবস্থা করে দিলেন। পরে সেই জমিতেই গড়ে উঠল একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও একটি হাইস্কুল। সি এস মিড নিজেই সেই স্কুলের তত্ত্বাবধানের ভার নিলেন। এই স্কুলে থেকেই শত শত ছাত্র বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এন্ট্রাস পাশ করে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পায়। তাদের মধ্যে অনেকেই গ্র্যাজুয়েট. পোস্ট গ্র্যাজুয়েট এবং তারও ওপরের শিক্ষা গ্রহণ করে। ঠাকুর মহাশয়ের এক ছেলে সাব রেজিস্ট্রার হন। এক নাতি ভগবতী ঠাকুর ডক্টরেট হন (Phd.)। অন্য আর এক নাতি পি আর ঠাকুর যে ব্যারিস্টার এবং পরে মন্ত্রী হয়েছিলেন তা আগেই বলা হয়েছে। ঠাকুর মহাশয়ের ওড়াকান্দি গ্রামেরই দুই জন বিলাত ফেরৎ ব্যারিস্টার ও একজন ডক্টরেট হন। অন্য আর এক জন বিলাত ফেরৎ ইঞ্জিনীয়ার এবং পরে শিবপুরের বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ হন। অন্য আর এক জন ব্যারিস্টার ও পরে বিচারক (জজ) হন। অন্যান্য বহু ছাত্র ঐ অঞ্চলে স্কুল স্থাপন করে বা স্কুলে শিক্ষকতা করে অনুন্নত সমাজকে উন্নতির পথ দেখান।

তবে যে উদ্দেশ্য নিয়ে মিড সাহেব ওড়াকান্দি এসেছিলেন এবং স্কুল স্থাপন করেছিলেন তাঁর সে আশা পূরণ হয়নি। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত সে যুগের যুবকদের মধ্যে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করার একটা ঝোঁক দেখা যায়। তাকে বাধা দিতে শ্রীরামমোহন রায়, ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রী শ্রী জয় জগদ্বন্ধু, শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ, ঠাকুর শ্রীশ্রী সত্যানন্দ, শ্রীশ্রী পাগলচাঁদ সহ অন্য অনেক মহাপুরুষেরা প্রচার চালান। প্রকৃতপক্ষে ঐ অঞ্চলে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার করতে এবং সেবার আড়ালে সেখানকার মানুষ জনকে খ্রীষ্টান করতেই মিড সাহেব ওড়াকান্দি এসেছিলেন। কিন্তু

শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর মিড সাহেবকে নিজের গ্রামে বসিয়ে তার সমস্ত অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। সব সময় নিজের চোখের সামনে রাখার জন্যই ঠাকুর গুরুচাঁদ মিড সাহেবকে নিজের গ্রামে বসান।

শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর ছিলেন হিন্দু দর্শনের মূল শক্তিতে বলীয়ান। তার ফলেই শিক্ষিত, বিদ্বান এবং অর্থবলে বলীয়ান মিড সাহেব সেদিন অশিক্ষিত ও নির্ধন ঠাকুর গুরুচাঁদের কাছে পরাস্ত হন। ঠাকুরের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ফলেই সেদিন ঐ অঞ্চলে সনাতন হিন্দুধর্ম রক্ষা পায়। ঠাকুরের ঐশী শক্তির কাছে রাজশক্তিতে বলীয়ান মিড সাহেব পরাভূত হন। পদ্মবিলার কাজিয়ার দিনও ঠাকুর তাঁর ঐশী শক্তির দ্বারাই হিন্দুর মনোবল বৃদ্ধি করেছিলেন।

রাজশক্তির আশীর্বাদ ও অর্থবলে বলীয়ান মিড সাহেব মিশন স্থাপনের মধ্যে দিয়ে অনেক দান-ধ্যান করেছিলেন। এ সব দান-ধ্যানের মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মান্তরকরণ। এ চেষ্টা চালিয়েও মিড সাহেব ঐ অঞ্চলের একটি মাত্র পরিবারকে খ্রীষ্টান করতে পেরেছিলেন। তাঁর এই পরাজয় দেশে ফিরে যাবার আগে ঠাকুরের কাছে অকপটে তা স্বীকার করে যান।

মিড সাহেবের আশা ছিল যে ঠাকুরের মতো একজন অশিক্ষিত ও নির্ধন গ্রাম্য মানুষকে সহজেই কাবু করতে পারবেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অনুগত লক্ষ লক্ষ শিষ্যকেও ধর্মান্তরিত করতে পারবেন। কিন্তু ঠাকুর যে ঐশী শক্তিতে বলীয়ান একজন খাঁটি হিন্দু ছিলেন তা বোঝার ক্ষমতা মিড সাহেবের ছিল না। শ্রীশ্রী ঠাকুরের ছিল হিন্দু ধর্ম দর্শনে গভীর জ্ঞান ও উপলব্ধি। সর্বোপরি তাঁর ছিল অবতারের গুণ ও মন এবং তার সাহায্যেই তিনি হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা উচিত হবে যে, হিন্দুত্ব ও হিন্দু সংস্কৃতিকে ইসলামের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে সঙ্কল্পবদ্ধ আর এক মহাপুরুষ তখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি হলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ মহারাজ। তিনিও ফরিদপুর জেলার বাজিতপুরে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ ও শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর, দুজনেরই উদ্দেশ্য ছিল এক এবং অভিন্ন। তাই দুজনেই দুজনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। বিশেষ ভাবে আলোচনার জন্য স্বামী প্রণবানন্দ একাধিকবার ওড়াকান্দিতে এসে শ্রীশ্রী ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হন। একথা স্বামী বিজয়ানন্দজী রাণাঘাটের প্রকাশ্য জনসভায় জানিয়েছিলেন।

মুজিবের সঙ্গে সমঝোতা

ছাত্রদের আয়ুব বিরোধী বিস্ফোরক আন্দোলন হয়েছিল ১৯৬২ সালে। বাইরে কোনো প্রচার না থাকলেও স্বায়ত্ব শাসনের দাবিই সে আন্দোলনের পিছনে স্ফুলিঙ্গের কাজ করেছিল। সেই সময় চিত্তবাবু এবং আমি মুজিবের সঙ্গে দেখা করি। আমরা তাঁকে বলি যে, স্বায়ত্ব শাসনের দাবিতে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন দল আলাদা আলাদা ভাবে প্রচার শুরু করে দিয়েছে। কাজটি সহজ নয় এবং একমাত্র তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বেই তা সম্ভব হতে পারে। আমরা আরও বললাম যে, হিন্দুরা তাঁর নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং তিনি নেতৃত্ব দিলে হিন্দুরা যাতে আন্দোলনে সামিল হয় সেজন্য আমরা যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাব।

আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে স্বায়ত্ব শাসন না পেলে হিন্দুরা দেশে বাস করতে পারবে না। আমরা আরও বুঝতে পেরেছিলাম যে পাকিস্তানের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা থাকলে হিন্দুদের উপর অত্যাচার চলতেই থাকবে, কোনো দিনই কমবে না। তাই আমরা তাঁকে বোঝালাম যে, দক্ষিণ অঞ্চলের হিন্দুদের একটা বড় অংশ ন্যাপ বা কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক হয়ে পড়েছে। কিন্তু মুজিব যদি স্বায়ত্ব শাসনের দাবিকে সামনে রেখে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন তবে আমরা আবার তাদের ফিরিয়ে আনতে পারব। আর স্বায়ত্ব শাসন না পেলে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা সুখে শান্তিতে বাস করতে পারবে না।

এ প্রস্তাব মুজিব খুশি মনেই গ্রহণ করলেন। আমাদের পিছনে যে রাজনীতি সচেতন একটি বড় গোষ্ঠী আছে তা মুজিবের অজানা ছিল না। মুজিব নিজেও ছিলেন গোপালগঞ্জ মহকুমারর লোক এবং সেখানকার সব হিন্দু নেতাকেই তিনি চিনতেন। এদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৯৫ জনই ছিলেন নমঃ সমাজের লোক। বীরেন বিশ্বাস, সন্তোষ বিশ্বাস, মতি দত্ত, মুকুন্দ সরকার, নিত্য মজুমদার, কার্তিক ঠাকুর, অনিল রায়, মিহির ঠাকুর, সতীশ বিশ্বাস, আশুতোষ দাস, চিত্ত গাইন, কেশব মণ্ডল সহ প্রায় সব নেতাই ছিল আমাদের হিন্দু লবির সঙ্গে যুক্ত।

আলোচনার পর মুজিব সেদিন বলেছিলেন আপনারা যদি আপ্রাণ চেষ্টা করেন তবে দক্ষিণবঙ্গের হিন্দুরা যে আমার পিছনে দাঁড়াবে সে বিশ্বাস আমি রাখি। মুজিব জানতেন যে ঐ অঞ্চলের মুসলমানরা তাঁকেই সমর্থন করে এসেছে। কাজেই দক্ষিণবঙ্গের হিন্দু মুসলমান শক্তি একত্র হলে উত্তরবঙ্গেও ঐ একই ঘটনা ঘটবে। তাই তাকে রোখার ক্ষমতা কারও থাকবে না।

এই আলোচনার পরেই আমরা অঙ্ক কষতে শুরু করি যে, অন্যান্য দলের নেতাদের মধ্যে কাকে কাকে সঙ্গে পাওয়া যেতে পারে। সম্ভাব্য নেতাদের সঙ্গে আলাদাভাবে গোপনে আলোচনা শুরু করে দিই। ভাসানি ন্যাপের প্রাক্তন এম পি এ আবদুল করিম, আজাদ সুলতান, মুজাফফর ন্যাপের প্রাক্তন এম পি এ মহিউদ্দিন ও আবদুল সামাদ (বাংলাদেশের প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী), কমিউনিস্ট পার্টির জীতেন সেন ও মুকুল সেন এবং জাতীয় লিগের অলি আহাদ সহ অনেক নেতার সঙ্গে ই আমরা আলোচনা শুরু করি।

সেই সঙ্গে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের মধ্যেও স্বায়ত্ত শাসনের দাবিকে তুঙ্গে তুলে দেওয়া হয়। ফলে সমগ্র ছাত্র মহলেই এক বিরাট সাড়া পড়ে যায়।

স্বায়ত্ত শাসন সম্বন্ধে প্রাথমিক আলোচনায় দুই জন নেতা সন্দেহ প্রকাশ করেন যে পশ্চিম পাকিস্তান কিছুতেই স্বায়ত্ত শাসন দেবে না। আমরা তাদের বলি, তা না দিলেতো স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হবে। তখনই তারা বলে সেই স্বাধীনতার ডাকই হবে শ্রেষ্ঠ পথ। একথা তারা স্পষ্ট ভাবে বললেই গভীর আলোচনা হয় এবং শেষ পর্যন্ত তারা পূর্ববঙ্গকে স্বাধীন করার প্রতিজ্ঞা নেয়।

তারা গোপনে প্রচার পত্র ছেপে বিলি করে। তবে তার সংখ্যা ছিল সীমিত। উল্লেখ্য এদের দুজনের সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল আলাদা আলাদা বৈঠকে। তারা একে অন্যের কথা জানতে পারেনি। এ দুজনের গোপন কাজের কথা কেবল আমি ও চিত্তবাবু জানতাম। এই দুজনের এক জন ছিলেন ভাসানী ন্যাপের প্রাক্তন এম পি এ উক্ত করিম সাহেব এবং অন্যজন ছিলেন আওয়ামি লিগের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় লিগের সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ। করিম সাহেব বর্তমানে মারা গিয়েছেন এবং অলি আহাদ স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে ভারতে চলে আসেন। কিন্তু আওয়ামি নেতাদের দুর্ব্যবহারে প্রাণের ভয়ে ফের ঢাকা ফিরে যান। ফলে তার পক্ষে সংগ্রামে অংশগ্রহন করা সম্ভব হয় না। পরে দেশে ফিরে গিয়ে তিনি কট্টর মৌলবাদী হয়ে যান।

চিত্তবাবু ও আমি ঠিক করেছিলাম যে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা না বললেও শেখ মুজিবই হবেন আমাদের প্রথম লক্ষ্য। কেননা তিনি ছিলেন নেতৃত্বে ও কর্তৃত্বে সবার উপরে। তবে তার ইসলাম প্রীতির কথা আমাদের জানা ছিল। এই ইসলামিক কারণে তিনি পিছিয়ে গেলে করিম সাহেব দ্বিতীয় ও অলি আহাদ সাহেব হবেন তৃতীয় লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সামনে রেখেই আমরা অলি আহাদ ও করিম সাহেবের

সাথে আলাদা আলাদা ভাবে আলোচনা চালালাম। করিম ও অলি আহাদ সাহেব স্বাধীনতার প্রচার গোপনে চালাতে স্বেচ্ছায় রাজি হলেন। আর মুজিব চালাতে থাকলেন স্বায়ত্ব শাসনের সংগ্রাম। সেই স্বায়ত্ব শাসন সংগ্রামকে পুরো সমর্থন জানালেও গোপনে স্বাধীনতা সংগ্রামের সব প্রস্তুতি আমাদের চলতে থাকল। করিম সাহেব ও অলি আহাদ আলাদাভাবে প্রচার পত্র ছাপিয়ে গোপনে তা বিলি করলেন। বিশেষ নিরাপত্তার জন্য তা ছিল সীমিত। প্রাথমিক ভাবে উক্ত দুজনেই বাঙালিদের আলাদা ভাবে ঘরে ফেরার ডাক দিলেন।

আমাদের বিশ্বাস ছিল মুজিবের প্রচেষ্টায় স্বায়ত্ব শাসন আন্দোলন দুর্বার হয়ে উঠবে। পাকিস্তানের জনগোষ্ঠির বেশির ভাগ মানুষের আন্দোলনকে থামাতে সরকার চরম অত্যাচার চালাবে। তার ফলে স্বাধীনতার ডাক আসবে। সেই ডাকে মুজিব সাড়া দিলে, পূর্ববঙ্গ সহজে স্বাধীন হতে পারবে। আর শেষ মুহূর্তে তিনি বিরোধিতা করলেও স্বাধীনতা ঠেকাতে পারেবেন না। তার জন্যই করিম ও অলি আহাদকে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় লক্ষ্য রেখে স্বাধীনতার প্রস্তুতি চালাই। অন্য দিকে ছাত্রমহলে গোপনে স্বাধীনতার প্রস্তুতি চলতে থাকে পুরোদমে। করিম ও অলি আহাদ সাহেব গোপনে আলাদাভাবে ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করতে থাকলেন কিন্তু তারা একে অন্যের কাজের কথা জানতেন না।

পূর্বপাকিস্তানে ১৯৬৪ সালের দাঙ্গা

দাঙ্গা লাগিয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে হিন্দুদের দেশ থেকে বিতাড়িত করার ইসলামি কায়দা দক্ষিণবঙ্গে অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির তিন বছর পর তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। আয়ুবের স্বৈরাচারী শাসন শুরু হলে সেই একই কায়দা পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র চালু হয়ে যায়। ১৯৬৪ সালে উত্তরবঙ্গের মুসলমানরা পরিকল্পিতভাবে দাঙ্গা বাধিয়ে হিন্দু বিতাড়ন করতে শুরু করে। এই সময় একটা বড় সুযোগ তাদের হাতে এসে গেল।

১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে কাশ্মীরের হজরতবাল মসজিদে রক্ষিত নবী মহম্মদের পবিত্র চুল চুরি হয়ে গিয়েছে। এরই প্রতিক্রিয়া হিসাবে সর্ব প্রথম খুলনায় ও পরে ঢাকায় দাঙ্গা শুরু হয়। সেই দাঙ্গার মূল উদ্যেক্তা ছিলেন আয়ুব খাঁ স্বয়ং। দাঙ্গা শুরু হবার আগের দিন ইসলামাবাদে ফেরার পথে ঢাকার বিমান বন্দরে তিনি ঘেষণা করলেন যে, কাশ্মীরে চুল চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানে যদি কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তবে তার পক্ষে কিছু করার থাকবে না।

এইভাবে দাঙ্গার উস্কানি দিয়ে আয়ুব খাঁ ঢাকা ত্যাগ করলেন। পরের দিনই খুলনায় ও পরে ঢাকায় আদমজী ও বাওয়ানি জুট মিলের অবাঙালি মুসলমানরা দাঙ্গা শুরু করে দিল। কিছু বাঙালি মুসলমান শ্রমিকও তাতে যোগ দিল। এই দুটি জুট মিলের চারপাশে ছিল হিন্দুদের গ্রাম। মিলের মুসলমান শ্রমিকরা ক্ষিপ্ত কুকুরের মতো সেই সব গ্রামের হিন্দুদের ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। খুন করে ও লুট করে হিন্দুদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিতে লাগল।

পাশের শূন্যা গ্রামের সুধীর মণ্ডল নামে একটি কলেজের ছাত্রকে আমি চিনতাম। সে প্রথমে রুগী হিসাবে আমার কাছে এসেছিল। পরে আমার ভাইপোর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়। খবর পেলাম যে, সুধীর সহ তাদের বাড়ির মোট আট জনকে খুন করা হয়েছে। তাদের গ্রামের প্রায় আশি থেকে নব্বই জন হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছে।

সেই দাঙ্গা অতি দ্রুতবেগে মেঘনা নদীর পার থেকে ২৫/৩০ মাইল প্রশস্ত ও আশি - নব্বই মাইল দীর্ঘ বিশাল অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। হাজার হাজার হিন্দু খুন হয়। তাদের ঘরবাড়ি লুট করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। অন্যান্য অঞ্চলেও দাঙ্গা [illegible] বেশি ছড়িয়ে পড়ে।

দুপুরের মধ্যেই দাঙ্গার খবর ঢাকা শহরের সর্বত্র পৌঁছে গেল। খবর পেয়ে আমি ভাবনায় পড়ে গেলাম! বাড়িতেই থাকব না অন্য কোথাও আশ্রয় নেব। আমার বাড়ির চারদিকেই ছিল মুসলমানদের বাস। মাত্র ১০/১৫ ঘর হিন্দু ঐ পাড়ায় বসবাস করত। আমার বাড়ির পশ্চিম দিকে ছিল একচেটিয়া বিহারী মুসলমানদের বাস। আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে তারা ছিল অনেক পিছনে। তাছাড়া কলকাতা ও বিহার থেকে পূর্বপাকিস্তানে চলে আসতে হয়েছে বলে তারা ছিল প্রচণ্ড রকম হিন্দু বিদ্বেষী।

ঐ পাড়ার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন আবদুল হালিম। তিনি ন্যাপ কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ছিলেন। তাঁর ডাকে যখন তখন ১০০/১৫০ জন লোক এগিয়ে আসত। পাড়ায় তাঁর বেশ প্রতিপত্তি ছিল। হালিম সাহেব এসে আমাকে অভয় দিলেন এবং পাড়া ছেড়ে চলে না যেতে অনুরোধ করলেন। কোনো অসুবিধা হলে তিনি দেখবেন বলে আশ্বাসও দিলেন। তাঁর উপর সম্পূর্ণ আস্থা না থাকলেও তাঁর কথা সেদিন অমান্য করতে পারলাম না। কারণ পরবর্তীকালে যে সেখানেই বাস করতে হবে। তাদের কথা অমান্য করলে ভবিষ্যতে সেখানে বিশ্বাস নিয়ে বাস করা কঠিন হবে। তাই সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করে সেখানেই থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম।

সেদিন বিকালেই ঢাকার শহরতলীর কোনো কোনো অঞ্চলে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল। সে দাঙ্গার ভয়াবহতার কথা সবাই জানতে পারল। কিন্তু পাড়ার মধ্যে বন্দি হয়ে থাকার ফলে আমরা কিছুই টের পেলাম না, তবে দাঙ্গার ব্যাপকতা ও ভয়াবহতার কথা জানতে পেরে আমার শ্বশুর মহাশয় ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে একজন সার্জেন্টের অধীনে ছয় জন পুলিশ সহ একটি গাড়ি পাঠালেন আমাদের নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু হালিম সাহেবের ওপর বিশ্বাস রেখে সে গাড়ি ফিরিয়ে দিলাম।

এভাবে আমাকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যেতে গাড়ি পাঠালেন ফজলুল হকের ভাগনে এবং প্রাক্তন মন্ত্রী আজিজুল হক (নান্নামিঞা)। গাড়ি পাঠালেন আমার চেম্বারের বাড়িওয়ালা মজিদ সাহেব। সব গাড়িকেই আমি ফেরৎ পাঠালাম কারণ দাঙ্গার ব্যাপকতা ও ভয়াবহতার কথা তখনও আমার বোধগম্য হয়নি।

বিকাল ৫ টা নাগাদ হালিম সাহেব খবর নিতে আমার বাড়িতে এলেন। দোতলায় বারান্দায় বসে দুজনে চা খাচ্ছি। হালিম সাহেবও আমাকে নির্ভয়ের আশ্বাস দিয়ে চলেছেন। এমন সময় চারিদিকে শুরু হয়ে গেল হৈ হৈ চিৎকার। কানে এল আল্লাহো আকবর ধ্বনি। চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি, চিৎকার ও কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। আমরা দুজনেই দৌড়ে ছাদে উঠলাম। দেখি পাড়ার কয়েকটি বাড়িতে আগুন জ্বলছে।

আমাদের বাড়ির গেট বন্ধ ছিল। হালিম সাহেব তখন আর কিছু বলতে পারছিলেন না। এমন সময় আমাদের বাড়ির গেটে ধাক্কা শুরু হল। হালিম সাহেব পিছনের দরজা দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় বলে গেলেন—দাদা ভয় নেই, এখনই আমি লোকজন নিয়ে ফিরে আসছি।

তখন বাঁচার তাগিদে আমি চিৎকার করতে থাকলাম—রমণি (আমার ভাইপো) আমার বন্দুকটা নিয়ে আয়। বাড়িতে ঢুকলে শালাদের একজনকেও বাঁচতে দেব না। ভিতরে এলেই গুলি করব। যদিও আমার বন্দুক ছিল না, ভয় দেখাবার জন্যই চিৎকার করতে থাকলাম। মনে হল তাতে কাজ হল। তারা থমকে গেল। বাড়িতে ঢুকতে সাহস পেল না। কিন্তু অন্যান্য হিন্দুর বাড়িতে তারা যথারীতি আক্রমণ চালাল। অনেককে খুন করল। অনেককে জখম করল। শেষে সব হিন্দুর বাড়িতে আগুন দিল। লুটপাট করে তারা তখনকার মতো চলে গেল।

সেই নরপশুর দল চলে যাবার ১৫/২০ মিনিট পরেই দলে দলে আহত মানুষরা আমার বাড়িতে আসতে শুরু করল। এত গজ-ব্যাণ্ডেজ পাব কোথায়? কাপড় দিয়েই ব্যাণ্ডেজ করতে লাগলাম। প্রতিবেশীর সকলের কাছে খবর পাঠালাম।

চিকিৎসা ও নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য সবাইকে আমাদের বাড়িতে আসতে বললাম। রাতের মধ্যেই পার্শ্ববর্তী সব হিন্দু পাড়া থেকে প্রায় ৫০০/৬০০ মানুষ আমার বাড়িতে আশ্রয় নিল। বাড়িটা আমার নয়। আমি একজন ভাড়াটে মাত্র। সুবিধার মধ্যে, বাড়িটার সামনে খানিকটা খালি জায়গা ছিল। তাই অত লোককে জায়গা দিতে কোন অসুবিধা হয়নি।

সমস্ত রাত ধরে চলল কান্নাকাটি। শোকার্ত সেই সব হতভাগ্য মানুষের কান্না সহ্য করা যায় না। অত্যন্ত অসহায় অবস্থা ও চরম আতঙ্কের মধ্য দিয়ে রাত কাটল। আমি অবাক হলাম যে সারা রাতের মধ্যেও হালিম সাহেব আর ফিরে এলেন না। লোকজন নিয়ে আসার নামে সেই যে গেলেন তারপর আর এমুখো হলেন না।

সেই আতঙ্কের মধ্যে আমি বার বার সাহায্যের জন্য পুলিশকে ফোন করলাম। কিন্তু কোনো সাহায্য তাদের কাছ থেকে পেলাম না। তারা জানাল, সব জায়গায় দাঙ্গা হচ্ছে। সব গাড়ি বেরিয়ে গেছে। শুধু আশ্বাস দিয়ে বলল যে আমাদের এলাকায়ও গাড়ি যাবে। শেষ পর্যন্ত পরদিন সকাল নটা নাগাদ থানার দারোগা এলেন। তিনি অভয় দিলেন। বললেন কোনো ভয় নেই, আমরা আছি। আমরা তাকে পুলিশ পোস্টিং করার কথা বললাম। জবাবে দারোগা সাহেব বললেন, যে পুলিশের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। কাজেই তা করা যাবে না।

দারোগা সাহেব চলে যাবার পরেই দুর্বৃত্তের দল আবার আক্রমণ শুরু করল। আমিও আগের মতোই তাদের বন্দুকের ভয় দেখাতে থাকলাম। তা ছাড়া বাড়িতে ৫০০/৬০০ লোক আছে জানতে পেরে তারা আর এগোতে সাহস পেল না। কিন্তু জ্বলন্ত মশাল বাড়ির মধ্যে ছুঁড়তে শুরু করল।

ঠিক সেই সময় একটা পুলিশের গাড়ি বাড়ির সামনে এসে থামল। পুলিশ দেখে দাঙ্গাকারিরা পালাল। গাড়িতে ছিল চারজন পুলিশ এবং আমার হাসপাতালের দুজন ওয়ার্ড বয়, আজিজ ও আলতাফ।

প্রথম দিকে গেট খুলতে আমরা সাহস পাইনি। কিন্তু আজিজ ও আলতাফকে দেখে আমি গেট খুলে দিলাম। ওদের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে আমার বিশেষ বন্ধু আজাজ সুলতান, তাঁর বন্ধু মান্নান সাহেব এবং আমার শিক্ষক মফিজুল সাহেবের জামাই ও বিশিষ্ট সাংবাদিক গফফর চৌধুরীর চেষ্টাতেই পুলিশের গাড়ি এসেছে। তাঁরা প্রথমে আবেদন নিবেদন, তারপর পীড়াপীড়ি এবং শেষ পর্যন্ত হুমকির পরই হাসপাতালের হিন্দু বিদ্বেষী সুপারিন্টেডেন্ট পুলিশের গাড়ি পাঠাতে বাধ্য হন।

তখন একটা বিশেষ কারণে হাসপাতালে পুলিশ ক্যাম্প বসেছিল, তাই পুলিশ পাঠাতে তেমন অসুবিধা হয়নি।

তারা বলল যে আমাকে উদ্ধার করার জন্যই তারা এসেছে। কিন্তু শ'পাঁচেক আশ্রয় প্রার্থীকে বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে আমি যেতে রাজি হলাম না। কিন্তু সেই আশ্রয় প্রর্থীরাই শেষ পর্যন্ত এক রকম জোর করেই আমাকে গাড়িতে তুলে দিল। তারা বলল—আগে আপনি বাঁচুন তারপর আমাদের বাঁচাবেন। হাসপাতালে গিয়ে উঁচু মহলের সঙ্গে যেগাযোগ করে আমাদের বাঁচার ব্যবস্থা করুন। এ ভাবে আমাদের সঙ্গে থাকলে আমরা সাহস পাব বটে, কিন্তু বাঁচার ব্যবস্থা হবে না। তারা আরও বলল আমরা এখানে ৫/৬ শ' লোক আছি, তাই তারা আক্রমণ করতে সাহস পাবে না।

অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরিবারের সবাইকে নিয়ে গাড়িতে উঠলাম। গাড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের দিকে ছুটল। গলি পার হয়ে বড় রাস্তায় পড়ার মুখে আমার স্ত্রী অস্ফুট স্বরে বলল—ঐ দেখ, যোগেন কাকার মৃতদেহ রাস্তার পাশের ফুটপাতে পড়ে আছে। যোগেন কাকা জ্ঞাতি সম্পর্কে আমার কাকা হন। দেখি তার গলা কাটা দেহ রাস্তার পাশে পড়ে আছে। তার ছোট মেয়ে পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। তার হাতেও বিরাট ক্ষত। তা থেকে রক্ত ঝরছে।

মেয়েটিকে তুলে নেবার জন্য গাড়ি থামাতে বললাম। আমার কথায় তারা কোনো আমল দিল না। গাড়ি গন্তব্যের দিকে ছুটে চলল। পরে পুলিশ অফিসার আমাকে বললেন যে, গলির ভিতরে দাঙ্গাকারিদের দল ছিল। সেখানে গাড়ি থামালে তারা আক্রমণ করে বসত।

নবাবপুর রেল গেটের কাছেও ৪/৫ টা মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। মৃতদেহগুলোকে পাশ কাটাতে গাড়ির গতি একটু কমাতে হল। এই সুযোগে এক মুসলমান নরপশু বাঁ পাশ থেকে ছোরা হাতে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তেরো মাস বয়সের বড় ছেলে আমার কোলে ছিল। আমার প্রায় গা ঘেঁষে ছোরাটা চলে গেল। এভাবে সমূহ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলাম।

হাসপাতালে পৌঁছে শুনতে পেলাম যে সমস্ত ঢাকা শহরে কার্ফু জারি করা হয়েছে। হাসপাতালে পৌঁছেই বাড়িতে বিপদের মধ্যে পড়ে থাকা মানুষগুলোর কথা সুপারকে বললাম। তিনি তেমন আমল না দিয়ে বললেন—আগে নিজে বাঁচুন তারপর অন্যের কথা ভাববেন। কিন্তু ফিজিওলজির প্রফেসর ডা. আবদুর রহমান সাহেবকে বলাতে কাজ হল। তিনি এস পি, ডি এম, ও আই জি সহ বিভিন্ন জায়গায়

ফোন করলেন। আমিও আমার পরিচিত রাজনৈতিক নেতা ও অফিসারদের ফোন করলাম। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই ঢাকার অ্যাডিশনাল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এক দল পুলিশ নিয়ে আমার বাড়িতে গেলেন এবং সেই হতভাগ্য মানুষগুলোকে উদ্ধার করলেন।

ঐ ম্যাজিস্ট্রেটের নাম ছিল ওবায়দুল্লা সাহেব। তিনি যখন সেই আটক লোকেদের নিয়ে হেঁটে ফিরছিলেন তখনও তাদের ওপর আক্রমণ হয়। কিন্তু ওবায়দুল্লা সাহেবের কড়া নির্দেশে ও পুলিশের তৎপরতায় তা ব্যর্থ হয়। পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। শুনেছিলাম সাহেব পরে তাদের লাঠি দিয়ে নিজেই পিটিয়েছিলেন।

সেই চরম বিপদের দিনে যাঁরা আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন তাঁদের কাছে আমি চিরঋণী। সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকব তাদের কাছে। সেই আজাদ সুলতান, মান্নান সাহেব, গফফর চৌধুরী, আজিজ, আলতাফ, সেই গাড়ির ড্রাইভার ও পুলিশ বাহিনী ও সব শেষে এ ডি এম ওবায়দুল্লা সাহেবকে জানাই আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা।

মনে পড়ে সেই দৌড়াদৌড়ি হুড়োহুড়ির মধ্যে আমার পকেটের টাকা পয়সা কোথায় পড়ে যায়। একখানা দশ টাকার নোট ছাড়া আর কিছুই আমার পকেটে ছিল না। আজিজ ও আলতাফ আমার স্ত্রীর কাছ থেকে তা জানতে পারে। আজিজ তখনই সেই কার্ফুর মধ্যে নানা অলিগলি ঘুরে বাড়ি গেল। নিজের স্ত্রীর গলার সোনার হার বন্ধক রেখে ৩০০ টাকা এনে আমার স্ত্রীর হাতে দিল। অন্য দিকে আমার আর এক ওয়ার্ড বয় আমার স্ত্রীর কাছ থেকে দশ টাকা নিয়ে কিছু চাল, ডাল, আলু এনে দিল। খুব বেশি হলে তাতে চার টাকা খরচ হবার কথা, কিন্তু একটা পয়সাও সে ফেরৎ দিল না।

হাসপাতালও নিরাপদ নয়

মেডিক্যাল কলেজে পৌঁছেও সেদিন নিজেকে বা পরিবারকে নিরাপদ মনে করতে পারিনি। পথে যোগেন কাকার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছি। রক্ত ঝরা হাত নিয়ে তাঁর মেয়েকে অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে কাঁদতে দেখেছি। একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাকে তুলে আনতে পারিনি, সে কষ্ট সহ্য করতে পারছিলাম না। উপরন্তু হাসপাতালের সুপারের অমানবিক ব্যবহারে মন খুব ভেঙে পড়েছিল। কিছু কিছু ওয়ার্ডবয় এর বিরূপ উক্তি ও তাদের অশোভন ব্যবহারে মন ভেঙে গেল।

পরদিন সকালে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে চরম ভাবে ভীত হয়ে পড়লাম। হাসপাতালের ওয়ার্ডবয় ও আরও অনেক নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী গেটে জড়ো হয়ে স্লোগান দিচ্ছিল যারা মুসলমান রোগীদের বিষ খাইয়ে বা ইঞ্জেকশান দিয়ে মেরেছে তাদের রক্ত চাই। প্রথমে কিছুই মাথায় ঢুকতে চাইল না। কারা আবার মুসলমান রোগীদের বিষ খাইয়ে মারতে যাবে? পরে জানতে পারলাম পরিকল্পিতভাবে সর্বত্র এই গুজব রটানো হয়েছে যে, হিন্দু ডাক্তার ও নার্সরা মুসলমান রোগীদের বিষ ইঞ্জেকশন দিয়ে মেরেছে। এই গুজব বিস্ফোরণের মতো ছড়িয়ে পড়েছে এবং সাধারণ মানুষকে খেপিয়ে তুলেছে।

তাদের চিৎকার শুনে সুপারিন্টেডেন্ট গেটে এসে তাদের শান্ত করতে চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি বললেন যে এই সবের সত্যতা যাচাই করার জন্য একটা তদন্ত কমিশন বসানো হবে। কিন্তু তার কথার কোনো আমল দিল না। বরং আরও বেশি লোক জড়ো করার জন্য জোরে জোরে স্লোগান দিতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে গেট ভাঙার জন্য ধাক্কা দিতে শুরু করল।

ভিতরে আমি তখন ভয়ে কাঁপছি। কোথায় আশ্রয় নেব ভেবে পাচ্ছি না। মনে হল, শত্রুর শিবিরে এসে বন্দি হয়েছি। আর রক্ষা নেই। আর ঠিক সেই সময় সার্জন প্রফেসর কে এস আলম বাঘের মতো লাফ দিয়ে, ধাক্কা দিয়ে সুপারকে পাশে সরিয়ে গেট আগলে দাঁড়ালেন। মারমুখী জনতাকে হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "মনে রেখো আমি সার্জন আলম। হাতে আমার এখনও শক্তি আছে। তোমরা কেউই আমার সামনে দাঁড়াতে পারবে না। যে ভিতরে ঢুকবে তার জীবন শেষ করে দেব।"

ডা. আলমকে এভাবে এগিয়ে যেতে দেখে কিছু ডাক্তার, ছাত্র ও ওয়ার্ডবয় তাঁর পিছনে এসে দাঁড়াল। বেগতিক দেখে হামলাকারিরাও সরে পড়ল। ডা. আলমের সেদিনকার সেই যুদ্ধং দেহি মূর্তি আজও চোখের সামনে ভাসছে। তিনি এভাবে এগিয়ে গিয়ে না দাঁড়ালে হয়তো সেদিনই ঐ দুর্বৃত্তদের হাতে প্রাণ দিতে হত।

আমার স্ত্রীকে ডা. আলম নিজে গিয়ে কলেজ বিল্ডিং থেকে সরিয়ে এনে হাসপাতালে ভি আই পি কেবিনে থাকার বন্দোবস্ত করে দেন।

হাসপাতালে আসার ফলে দাঙ্গার ভয়াবহতার কথা জানতে পারলাম। আমাদের পাড়া ও পাশের পাড়ার অনেক হিন্দুকে সেদিন খুন করা হয়েছিল। সব বাড়িই লুট হয়েছে। এমন কি ঘরের দরজা জানালা পর্যন্ত খুলে নিয়ে গিয়েছে। তারপর আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে। এই দাঙ্গার পরই আমি দক্ষিণ মৈষণ্ডীর পুরানো পাড়া ছেড়ে নিরাপত্তার জন্য শাঁখারী বাজারে চলে আসি এবং সেখানেই

আবার খেলা শুরু করি।

নতুন করে মাইগ্রেশনের ভীড়

১৯৬৪'র সেই ভয়াবহ দাঙ্গার পরই অসহায় ও নিরুপায় সংখ্যালঘু হিন্দুরা দলে দলে দেশ ত্যাগ করতে শুরু করে। এই হিন্দু বিতাড়ন এবং বিতাড়িত হিন্দুর সম্পত্তি আত্মসাৎ করাই ইসলামের নির্দেশ। তার জন্যই দাঙ্গা। দাঙ্গা লাগিয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা যাতে কাফের হিন্দুর দল ভয় পেয়ে আতঙ্কে দেশত্যাগ করে। ঢাকার ভারতীয় দূতাবাসের সামনে হতভাগ্য হিন্দুর ভীড় শুরু হয়ে যায়। সেই সময়, প্রতিদিন পাঁচ থেকে ছয় হাজার আতঙ্কগ্রস্ত হিন্দুর লাইন পড়ত। সবাই ভারতে যেতে চায়।

মাত্র তিন থেকে চারশ মানুষ আসল মাইগ্রেশন পত্রপেত। দু এক হাজার মানুষ পেত জাল মাইগ্রেশন পত্র। দালালদের থেকে যা হাতে পেত তাই নিয়ে তারা দেশত্যাগ করত। সেই বিশাল লাইনে যেমন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি লাগত, তেমনি সুযোগমতো মুসলমান গুণ্ডারা তাদের সর্বস্ব কেড়ে নিত। সেই করুণ দৃশ্য চোখে দেখা যেত না।

এই সময় আমার অনেক আত্মীয়স্বজন এবং অন্যান্য আপন জনেরা দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত নিল। সহায় সম্বল সব ফেলে রেখে শুধু প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে তারা দেশ ছেড়ে পালাতে শুরু করল। জন্মভূমিকে চিরতরে ত্যাগ করে ভাগ্যের ওপর সব ছেড়ে দিয়ে এক অজানা ভবিষ্যতের পথে তারা যাত্রা শুরু করল।

তাদের দেশত্যাগের এই করুণ দৃশ্য দেখে মন স্থির রাখা সম্ভব হল না। এই সব নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের ভবিষ্যৎ কি এই নিয়ে আলোচনার জন্য বাটনাতলায় গেলাম। হিন্দু লবির সদস্যদের নিয়ে বৈঠকে বসলাম। অন্যান্য অঞ্চলের সদস্যরা বৈঠকে যোগ দিল। তাতে কোনো কোনো সদস্য প্রস্তাব করলেন যে, লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে পূর্ব প্রস্তুতি নিয়েই ভারতে চলে যেতে হবে। এমন প্রস্তুতি নিয়ে যেতে হবে যাতে পশ্চিমবাংলায় পাঞ্জাবের মতো লোক বিনিময়ের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তাতেও যদি ভারত সরকার মেনে নিতে না চায় তবে চাপ সৃষ্টি করে তাকে তা মেনে নিতে বাধ্য করতে হবে।

অনেকে আবার কিছুটা ধীরে চলার নীতিতে মত দিলেন। তারা আরও সময় নিয়ে ধীরে সুস্থে সিদ্ধান্ত নেবার কথা বললেন। কেউ কেউ আবার আশা প্রকাশ করে বললেন যে, পূর্ববঙ্গের মানুষ পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসন পেলে অবস্থার পরিবর্তন

ঘটতে পারে। অনেকে দেশত্যাগের ব্যাপারে ইতস্তত ভাব দেখালেন। অনেকে আবার বলল যে, শত লাঞ্ছনা, অত্যাচার সহ্য করেও কিছু লোক থেকে যাবে। তাদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করাও একান্ত জরুরী।

আলোচনার পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে, আমাদের কয়েকজন কর্মী পশ্চিম বাংলায় গিয়ে সেখানকার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের ওপর লক্ষ্য রাখবে। সেখানকার রাজনৈতিক সামাজিক নেতৃগণের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের বেদনাময় করুণ অবস্থা নিয়ে আলোচনা করবে। এবং তাঁরা কি মতামত দেন তার উপর ভিত্তি করে আবার আলোচনায় বসা হবে ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

প্রকৃতপক্ষে ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পর পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের মনোবল খুবই ভেঙে পড়ে। ব্যক্তিগতভাবে আমিও খুব হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। ভাবতে থাকি, ডাক্তারী পেশাচালিয়ে কতজন অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করার ক্ষমতা আমার আছে? যে সব লক্ষ লক্ষ হিন্দুর সন্তান আজ মরণাপন্ন, তাদের কে বাঁচাবে? কি করে বাঁচবে? এই পথ খুঁজে বের করতে আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। এই চঞ্চল মনকে শান্ত করতে ছুটে গেলাম কলকাতা। আবার ফিরে যাই ঢাকা। ৪/৫ বার বাটনাতলায় যাই।

এদিকে আত্মীয় স্বজনরা চাপ সৃষ্টি করছে দেশ ত্যাগ করে কলকাতায় চলে যাবার জন্য। পাকাপাকি ভাবে সেখানে বসবাস করার জন্য। এতে রাজি হওয়া সম্ভব ছিল না। মাথায় ছিল পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের বাঁচানোর প্রতিজ্ঞা। এই প্রতিজ্ঞাই আমাকে কলকাতায় শান্তিতে থাকতে দিল না। এই প্রতিজ্ঞাকে অনুসরণ করেই পূর্ববঙ্গকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলাম।

মনের এই অশান্ত অবস্থা অনেকদিন ধরে চলছিল। তখন ভারতের চীফ মাইগ্রেশন অফিসার অরুণাংশু দে কিছুটা স্বস্তি দিয়েছিলেন। ঢাকায় আমার কাজকর্ম দেখে তিনি আমাকে উৎসাহ দিতেন, স্নেহ করতেন। তিনি আমাকে ডিপ্লোমেটিক মাইগ্রেশন নিয়ে ভারতে চলে যাবার পরামর্শ দিতেন। তিনি বোঝাতেন যে ডিপ্লোমেটিক মাইগ্রেশন নিয়ে ভারতে গেলে আমি অনেক সুযোগ সুবিধা পাব। আমার কাজেরও অনেক সুবিধা হবে। প্রয়োজনে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে বলে আমার জন্য বিশেষ সুবিধা সুযোগ করে দেবেন, এ আশ্বাসও অরুণাংশুবাবু আমাকে দিয়েছিলেন। অফিসার হলেও তিনি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী রাজনৈতিক নেতা ও নেহেরুর সহকর্মী ছিলেন। এ চাকরিটা ছিল তার রাজনৈতিক পুনর্বাসন।

ঢাকা থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসার কয়েকদিন আগে তিনি হঠাৎ আমার

বাড়িতে চলে আসেন। আমার স্ত্রীর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ সালাপ করেন। তাঁর মনের অনেক কথা সেদিন তিনি আমার স্ত্রীকে বলেন। বিদায় নেবার সময় আমাকে কিছু উপহারও দেন। তাঁর সেই আন্তরিক স্নেহ ভালবাসা আজও মনের কোণে উজ্জ্বল হয়ে আছে। কোনোদিন ভুলতে পারব বলে মনে হয় না।

গভর্নরের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা

১৯৬৪ সালের দাঙ্গার ঠিক পরেই পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এক অর্ডিন্যান্স জারি করলেন। এতে বলা হলো যে, কোনো হিন্দু তার সম্পত্তি বিক্রি বা হস্তান্তর করতে পারবে না, চিত্তবাবু এই অর্ডিন্যান্সের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতে মামলা করলেন। হিন্দু লবির সদস্যরাই এই মামলার টাকা পয়সা যোগাড় করে দিল। মামলায় চিত্তবাবু জিতে গেলেন। চিত্তবাবুর হয়ে মামলা লড়েছিলেন ঢাকার বিখ্যাত অ্যাডভোকেট সবিতারঞ্জন পাল, এবং তাঁর জুনিয়র ছিলেন সুধাংশু শেখর হালদার। হিন্দু লবির পক্ষ থেকে মামলার তদারকি করার সমস্ত দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত ছিল। খরচের টাকার দায়িত্বও আমি নিয়েছিলাম।

মামলার শুনানি শুরু হবার অনেক আগে থেকেই সুধাংশুবাবু একটা মোটা অঙ্কের টাকার তাগাদা দিতে শুরু করলেন। কিন্তু চিত্তবাবু বাটনাতলায় ছিলেন বলে কোনো টাকাই আমি তাকে দিইনি। তখন আমি চিত্তবাবুকে খবর পাঠিয়ে ঢাকায় নিয়ে এলাম এবং আমরা দুজনে সরাসরি সবিতাবাবুর সঙ্গে দেখা করলাম।

সবিতাবাবু বললেন — হিন্দুদের স্বার্থে অনেক ত্যাগ স্বীকার ও বিশেষ সাহস দেখিয়ে আপনারা খোদ গভর্নরের বিরুদ্ধে মামলা লড়ছেন। হিন্দু হয়ে যখন জন্মেছি তখন এই সংগ্রামে আমারও কিছু করার আছে। আপনাদের মতো অত কিছু করতে না পারলেও বিনা টাকায় মামলা তো লড়তে পারি। জোরালো যুক্তি হাজির করে মামলা যাতে হিন্দুর পক্ষে যায় তা তো করতে পারি। তাই টাকা দিতে চেয়ে আমাকে আর লজ্জা দেবেন না।

মামলার দিন এত জোরালো যুক্তির সঙ্গে সবিতাবাবু তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করলেন যে ঢাকা হাইকোর্ট গভর্নরের অর্ডিন্যান্সটিকে বাতিল বলে ঘোষণা করল। লক্ষ লক্ষ হিন্দু তাদের মৌলিক অধিকার ফিরে পেল। জলের দাম পেলেও তারা তাদের সম্পত্তি ইচ্ছামত বিক্রি করে দেশত্যাগ করার সুযোগ পেল। এই জয়ের পর আমাদের সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দুদের মনোবল অনেক বেড়ে যায় এবং তাদের মনোবল আমাদের মনোবলকেও অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়।

কিন্তু মামলা জেতার আনন্দ বেশিদিন স্থায়ী হল না। দলে দলে হিন্দুর দেশ ত্যাগের দৃশ্য আমার মনকে পীড়িত করে তুলল। তাই একদিন ঠিক করলাম যে, সোবাহান সাহেবের কাছে গিয়ে মনের কথা খুলে বলি। তাঁর সাথে পূর্বেই আমার ভালো পরিচয় ছিল। তিনি ছিলেন বরিশালের একজন এম পি এ (Member of the Provincial Assembly)। এই সময় তিনি স্বরাষ্ট্র বিভাগের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারির দায়িত্বে ছিলেন। তখন এই বিভাগে কোনো মন্ত্রী ছিল না, গভর্নর মোনায়েম খান নিজেই এই বিভাগের কাজকর্ম দেখতেন। পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি গভর্নরের হয়ে এই বিভাগ চালাতেন।

যাই হোক, শাঁখারি বাজারের বিশিষ্ট নেতা কালিদাস সুরকে সঙ্গে করে এক দিন তাঁর কাছে হাজির হলাম। হিন্দুদের করুণ অবস্থার কথা, চরম দুরবস্থার মধ্যে দেশত্যাগের কথা তাকে বললাম। আমি তাকে বিশেষভাবে প্রশ্ন করলাম — যাদের সঙ্গে মিলেমিশে এত দিন বসবাস করেছেন, আজ তারা নিঃস্ব হয়ে ভিখারির বেশে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে আপনাদের মনে কি সামান্যতম প্রতিক্রিয়া, সামান্যতম বেদনারও সৃষ্টি করে না? আপনাদের ওপর আস্থা হারিয়েছে বলেই তারা চলে যাচ্ছে। আপনারা শাসন ক্ষমতায় আছেন। আপনারা আশ্বাস না দিলে কার ওপর ভরসা করে তারা তাদের জন্মভূমিতে বসবাস করবে?

কিন্তু দুষ্টের ছলের অভাব হয় না। আমার প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, ভারত সরকার শত শত দালাল পাঠিয়ে এদের দেশত্যাগে প্রোরোচিত করছে। এর মধ্যে টাকার লোভও আছে। ভারতে গেলেই তারা প্রত্যেকে ৪/৫ হাজার করে টাকা পাবে। তাই দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যাচ্ছে। তারা ভারতকেই তাদের পুণ্যভূমি মনে করে, তাই তারা ভারতে চলে যাচ্ছে।

সেদিন আমরা তাকে বলেছিলাম যে টাকার লোভে বা ভারতকে পুণ্যভূমি মনে করে হিন্দুরা দেশত্যাগ করছে না। জীবনের ভয় এবং ভাবী জীবন অন্ধকার দেখেই তারা ভারতে চলে যাচ্ছে। আমি তাকে সরাসরি প্রশ্ন করেছিলাম — আপনার পুণ্যভূমি তো আরব। কত টাকা পেলে আপনি সেই পুণ্যভূমিতে চলে যেতে রাজি আছেন বলুন। আমরা সেই টাকা আপনাকে দেব। বলুন কত টাকা আপনার চাই?

কিন্তু আমার প্রশ্নের কোনো জবাব তিনি সেদিন দিতে পারেননি। জবাব না পেয়ে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে আমি তাকে প্রশ্ন করলাম—আপনি বলছেন যে ৪/৫ হাজার টাকার লোভে হিন্দুরা ভারতে চলে যাচ্ছে। হিন্দুরা আপনাকে ৫/১০ লক্ষ টাকা দেবে। বলুন তাহলে আপনি আপনার পুণ্যভূমি আরবে চলে যেতে রাজি

আছেন? বলুন আপনি তা হলে চিরদিনের জন্য বাংলার মাটি ত্যাগ করে আরবে গিয়ে বাস করবেন? আমার প্রশ্নের কোনো জবাব তিনি দিতে পারলেন না।

কিছুদিন বন্ধ থাকার পর ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় ও তার পরে নতুন করে হিন্দু নির্যাতন শুরু হয়। সরকারিভাবে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার চলে। হাজার হাজার হিন্দুকে বিনা কারণে ডি পি আর (Defence Pakistan Rule / DPR) আইনে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হয়। হিন্দুর অনেক সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি ঘোষণা করে সরকার তার দখল নিতে থাকে। ফলে হিন্দুরা আবার দলে দলে দেশত্যাগ করতে শুরু করে।

এই সময় আরও একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। পাকিস্তান সরকার আর্থিক দিক দিয়ে ভীষণভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। সেই সুযোগে শেখ মুজিব পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসনের দাবি নিয়ে জোরালো বক্তব্য রাখতে শুরু করেন। এই স্বায়ত্ব শাসনের দাবিই যে কিছুদিন পরে পূর্ণ স্বাধীনতার ডাকে রূপান্তরিত হবে তা আমাদের জানা ছিল। তাই আমরা মুজিবের সমর্থনে এগিয়ে গেলাম। মুজিবের হাত আরও শক্ত করার উদ্দেশ্যে গোপালগঞ্জের জলির পাড়ে এক বিশাল সভার আয়োজন করা হল। বিরাট সেই জনসভায় প্রকাশ্যে স্বায়ত্ব শাসনের স্বপক্ষে জোরালো যুক্তি দিয়ে হিন্দু নেতারা বক্তব্য রাখলেন। হিন্দুদেরও আহ্বান জানানো হল মুজিবের স্বায়ত্ব শাসনের ডাকের পিছনে একত্রিত হবার জন্য। আয়ুবের দালালরা সভায় গণ্ডগোল সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু বেশি সুবিধা করতে পারেনি। সভা ভালভাবেই শেষ হয়।

হিন্দুরা তাঁর নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল এবং তাঁর দাবিকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে জানতে পেরে মুজিব খুবই খুশি হলেন। আমরাও তাঁকে আবার বোঝালাম যে স্বায়ত্ব শাসনের দাবিকে হিন্দুরা তাদের বাঁচার দাবি বলে মনে করে। এইভাবে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস রেখেই আমরা কাজ করে যেতে থাকলাম। মাঝে মাঝে একান্ত আলোচনাও হত। এভাবে নিজেদের মধ্যে মত বিনিময় হত।

আমি চিত্তবাবু ও মুজিব, এই তিনজনের উপস্থিতিতেই বেশির ভাগ বৈঠক হত। সময় সময় আলাদাভাবে চিত্তবাবু ও আমার সঙ্গে তার আলোচনা হত। তবে বেশির ভাগ সময়ে চিত্তবাবু ঢাকায় না থাকার ফলে মুজিব ও আমার মধ্যে আলোচনা হত। সেই আলোচনার ফলাফল চিত্তবাবুকে আমি জানাতাম। আর খবর পেয়ে দরকারমতো চিত্তবাবু ঢাকায় চলে যেতেন।

চিত্তবাবু ঢাকায় এলেই আমাদের মধ্যে স্বায়ত্ব শাসন ও স্বাধীনতার বিষয় নিয়ে অনেক আলোচনা হত। অত্যন্ত গোপনে এই সব আলোচনা করতে হত।

কাজটা ছিল খুবই ভীতিপ্রদ, কারণ পাকিস্তান সরকার ঘুণাক্ষরে জানতে পারলে আমাদের ওপর নেমে আসবে রাষ্ট্রদ্রোহিতার চরম শাস্তি। তাই প্রতিটি পদক্ষেপই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নিতে হত। কারণ স্বাধীনতাই ছিল আমাদের মূল লক্ষ্য। স্বায়ত্ত শাসনের আন্দোলনকে কি করে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপান্তরিত করা যায় সেটাই ছিল আলোচনার মূল বিষয় বস্তু। যে সব বাড়িতে আমরা বিশেষ বিশেষ লোকের সাথে গোপনে এই সব আলোচনা করতাম সেই সব বাড়ির লোকেরাও কিছু টের পেত না যে আমরা কি নিয়ে আলোচনা করছি। কারণ মাত্র ৫/১০ মিনিটের মধ্যে আলোচনা শেষ হত। বাড়ির কর্তার অনুপস্থিতিতেই তা হত।

এভাবে চলতে চলতেই ১৯৬৫'র পাক-ভারত যুদ্ধ এসে গেল। অনেক হিন্দু নেতার সঙ্গে চিত্তবাবুকেও জেলে যেতে হল। কিন্তু আমার সরকারি চাকরি আমাকে রক্ষা করল। তা ছাড়া থানার দারোগা সহ পুলিশের বড়কর্তাদের পারিবারিক চিকিৎসক হওয়ার কারণে আমাকে আর জেলে যেতে হল না।

১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

পাক-ভারত যুদ্ধের আগেই এসে গেল ১৯৬৫ সালের পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পর্ব। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সকল সাধারণ মানুষই তখন আয়ুবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। তখন দুই পাকিস্তানের সমস্ত বিরোধী শক্তি এক হয়ে "কপ" (COP : Combined Opposition Party) গঠন করল এবং জিন্নার বোন ফতেমা জিন্নাকে আয়ুবের বিরুদ্ধে দাঁড় করাল। পূর্ব পাকিস্তানেও আয়ুব বিরোধী ঝড় খুবই প্রবল হয়েছিল। ফতেমা জিন্নার পক্ষে আমি হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপক প্রচার চালাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আয়ুবই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন।

আয়ুববিরোধী নির্বাচনী প্রচারের সময় মুসলিম লিগের গুণ্ডারা আমাকে শাসায়। প্রাণের ভয় দেখায়। কিন্তু সে সব উপেক্ষা করেই আমরা প্রচার চালিয়ে যেতে থাকি। যাই হোক, নির্বাচনের আগে আমার ওপর কোনো আক্রমণ হল না বটে, কিন্তু নির্বাচনের ঠিক পরেই প্রকাশ্যে আক্রমণ হল।

নির্বাচনে জিতে আয়ুবের কনভেনশন লিগ ঢাকায় বিজয় উৎসব করে এবং উৎসবের শেষে বিজয় মিছিল বের করে। আমার চেম্বারের সামনে দিয়ে সেই বিজয় মিছিল যাচ্ছিল। তার মধ্য থেকে কুখ্যাত আক্তার গুণ্ডা লাফ দিয়ে আমার চেম্বারে ঢুকে পড়ল। তার হাতে ছিল মারাত্মক ছোরা। আমার বুকে সেই ছোরা বিদ্ধ করার জন্য সে হাত উঁচু করল। সঙ্গে সঙ্গে মাহতাবউদ্দিন পিছন থেকে তার

হাত ধরে ফেললেন। তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন। তিনি ছিলেন জাতীয় পরিষদের মুসলিম লিগের সদস্য ও আমার প্রতিবেশী। আমি তার পারিবারিক চিকিৎসক ছিলাম।

. আক্তার গুণ্ডা ছিল বিহারী মুসলিম এবং চরম হিন্দু বিদ্বেষী। মাহতাব সাহেব না রক্ষা করলে সেদিন সে অবশ্যই আমাকে খুন করত। এইভাবে দ্বিতীয়বার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাই।

পাক-ভারত যুদ্ধ (১৯৬৫)

নির্বাচনে আয়ুব খাঁর জয়ে সবাই বুঝতে পারল যে, বেসিক ডেমোক্রেসি বলবৎ থাকলে ভোটের মাধ্যমে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা এক অসম্ভব ব্যাপার। পক্ষান্তরে ভোটে জিতে আয়ুব নিজেকে অসীম ক্ষমতাশালী বলে মনে করতে শুরু করলেন। তার পররাষ্ট্র মন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টোও নগ্নভাবে তার তাবেদারি করতে শুরু করলেন। বাহবা দিতে থাকলেন।

ভুট্টো ছিলেন এক জন কট্টর ভারত বিদ্বেষী এবং উগ্রপন্থী মুসলমান। কাশ্মীর সমস্যাকে কেন্দ্র করে তিনি ভারতের বিরুদ্ধে হুঙ্কার দিতে শুরু করে দিলেন। যুদ্ধ করে কাশ্মীর সমস্যা চিরকালের মতো সমাধান করবেন বলে হুমকি দিতে থাকলেন এবং বিশেষভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করলেন। এরই পরিণতি হিসাবে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী কাশ্মীর অক্রমণ করে বসল। তার জবাবে ভারতীয় বাহিনী লাহোর আক্রমণ করল। লাহোর প্রায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। তখন লাহোর রক্ষার জন্য পাকিস্তান রাশিয়ার মধ্যস্থতায় যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করল। ফলে স্বাক্ষরিত হল তাসখন্দ শান্তি চুক্তি।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আয়ুব খাঁ সেই চুক্তিতে সই করলেন। এই চুক্তি সই করার পরেই লালবাহাদুর শাস্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যু হয় বা তাঁকে মেরে ফেলা হয়। অন্য দিকে যুদ্ধে হেরেও আয়ুব খাঁ যুদ্ধ জয়ের দাবি করতে থাকেন এবং ভুট্টো পরাজয়ের গ্লানি ও তাসখন্দ চুক্তি সহ্য করতে না পেরে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করলেন। শুধু পদত্যাগ করে ভুট্টো ক্ষান্ত থাকলেন না। তাসখন্দ চুক্তির বিরোধিতা করে তিনি আয়ুবের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করে দিলেন।

অপর দিকে, নিজের দুর্বলতা ঢাকার জন্য আয়ুব নিজেই নিজেকে ফিল্ড মার্শাল উপাধিতে ভূষিত করলেন। এখান থেকেই শুরু হল আয়ুবের শক্তির ভাটার টান।

এই যুদ্ধে কাশ্মীরের সীমারেখার কোনো অদল বদল হল না। কিন্তু সর্বনাশ হল পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের। হাজার হাজার হিন্দুকে পি ডি অ্যাক্টে আটক করে জেলে পাঠান হল। হিন্দুর সম্পত্তির প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ 'শত্রু সম্পত্তি' আইনের জেরে কেড়ে নেওয়া হল।

১৯৬৫ সালের এই প্রেসিডেন্ট নির্বাচন COP এর প্রার্থী ফতেমা জিন্না পরাজিত হলেন বটে, কিন্তু শেখ মুজিবর রহমান বুঝতে পারলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানের খবরদারি আর বরদাস্ত করতে রাজি নয়। তারা আয়ুব তথা পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে প্রস্তুত ও বদ্ধপরিকর। এই সময় আয়ুবের স্বঘোষিত ফিল্ড মার্শাল উপাধি গ্রহণের মধ্য দিয়ে মুজিব আয়ুবের দুর্বলতা ধরে ফেললেন। ফলে তার সাহস বেড়ে যায়। একটা কিছু করার জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে ওঠেন এবং প্রস্তুতিও নিতে শুরু করেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে COP গঠনের পূর্বেই সুরাবর্দির মৃত্যু হয়। NDF র রাজনৈতিক দলগুলি পুনর্জীবিত হয়।

ছয় দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্ব শাসনের দাবী

পাক-ভারত যুদ্ধের সময় চিত্তবাবুকে জেলে যেতে হয়। তাই ৬ দফা দাবি প্রকাশের পূর্বেই আমার সাথে মুজিবের গোপন আলোচনা হয়। মুজিবকে আমি আমার পূর্ণ সম্মতি জানাই। সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর দলের বিশ্বস্ত ও সীমিত সদস্যদের সাথে গোপনে আলোচনা করেন এবং তাদের মধ্যেও অনেকেই তার বিরোধিতা করেন।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ১৯৬৬ সালে পাকিস্তানে দক্ষিন পন্থি বিরোধি দলগুলির বৈঠকে যোগদিতে মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান। সেখানেই লাহোরে বসে তিনি তাঁর ছয় দফা দাবি সম্বলিত পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ব শাসনের কথা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার কথা শুনে যে আনন্দ পেয়েছিলাম তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আওয়ামি লিগের দলীয় সিদ্ধান্ত ছাড়াই মুজিব এই ঘোষণা করেন। ফলে তাঁর দলের অনেক নেতাই তাঁর উপরে অসন্তুষ্ট হন। অনেকে নীরব থাকলেন। অনেকে প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দিলেন যে এ বিষয়ে মুজিবের সঙ্গে তাঁরা একমত নন। অনেকে আবার গোপনে তাঁকে সমর্থন জানালেন। ফলে আওয়ামি লিগের মধ্যে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত হল। ফলে আওয়ামি লিগ দুভাগ হয়ে যায়।

উপরিউক্ত ছয় দফা দাবির মধ্যে প্রধান ছিল এই যে, শুধু মাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিভাগই কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে। এছাড়া অন্য যে কোনো ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার সম্পূর্ণ অধিকার থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে। এই ঘোষণার ফলে ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খাঁর কি প্রতিক্রিয়া হবে তা সহজেই অনুমান করা চলে। তিনি ঘোষণা করলেন যে, শেখ মুজিবের ছয় দফা দাবির জবাব অস্ত্রের ভাষাতেই দেবেন।

মুজিবের এই শক্ত ঘোষণা পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজকে উত্তেজিত করে তুলল। তারা মুজিবের ছয় দফার পক্ষে ও আয়ুবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠল। এদিকে ছাত্রদের সমর্থন তাঁর পিছনে রয়েছে দেখে মুজিব পূর্ণ আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৯৬৬ সালের ২৩ শে জুন তিনি সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানে হরতালের ডাক দিলেন। আয়ুবের সামরিক শাসন জারি হবার পর এই প্রথম পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালিত হল। সমস্ত সরকারি অফিস বন্ধ থাকল। অনেক জায়গাতেই গণ্ডগোল হল। আমার বাড়ি থেকে মাত্র ১০০ গজ দূরে ঢাকা সদর ঘাটে, স্টেট ব্যাংকের সামনে পুলিশের গুলিতে একজন নিহত হল এবং বেশ কয়েকজন আহত হল।

আহতদের দুই জনকে সবাই আমার চেম্বারে নিয়ে এল। তাদের অনুরোধে আমি তাদের চিকিৎসা করলাম। সেলাই ও ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলাম। থানার দারোগা বাবুর কাছে এই সংবাদ যথারীতি পৌঁছে গেল। কিন্তু আমি ছিলাম সেই দারোগাবাবু ও সার্কেল ইনস্‌পেক্টরের পারিবারিক চিকিৎসক, তাই তাঁরা আমার বিরুদ্ধে কিছুই করলেন না।

থানা আমাকে রেহাই দিল বটে, কিন্তু এস বি (Special Branch)-র হাত থেকে রেহাই পেলাম না। ৩/৪ দিন পরে তারা আমাকে থানায় ধরে নিয়ে গেল। আমার বিরুদ্ধে এক গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করল। তারা বলল যে স্টেট ব্যাংকে গুলি চলার পরের দিন সদর ঘাটে মানুষের একটা কাটা হাত পাওয়া গেছে এবং সেই হাত আমি কেটে বাদ দিয়েছি। উপরন্তু তিন ব্যক্তি ঐ ঘটনা নিজের চোখে দেখেছে। ঐ তিন ব্যক্তি থানায় এসে আমার বিরুদ্ধে আমার সামনে সাক্ষী দিল। দারোগাবাবু ও সার্কেল ইনস্‌পেক্টর অনেক চেষ্টা করেও আমার গ্রেপ্তার আটকাতে পারলেন না।

আমাকে সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে গেল। কিন্তু জেলের গেটে গিয়ে শুনলাম যে, এস পি সাহেব ফোন করেছেন। ফলে এস বি অফিসারেরা আমাকে ছেড়ে দিল। পরে জানতে পেরেছি যে দারোগা বাবু ও সার্কেল ইনস্‌পেক্টর এস পি কে ফোন

করেছিলেন আমাকে বাঁচাতে এবং তাদের প্রচেষ্টাতেই আমি মুক্তি পাই। অবশ্য আমিও এক দিন এস পি সাহেবের চিকিৎসা করেছিলাম। এই কারণেও তিনি হয়ত আমাকে মুক্ত করেছিলেন।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

শেখ মুজিবের ৬ দফা দাবি আয়ুবকে যে ক্ষুব্ধ করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই কারণেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে অস্ত্রের ভাষাতে মুজিবের দাবির জবাব দেবেন। আয়ুবের এই হুমকির ফলে আওয়ামি লিগের বেশির ভাগ নেতার ঘুম ছুটে গিয়েছিল। এর কিছুদিন পরেই আয়ুব খাঁ "আগরতলা ষড়যন্ত্র" মামালা নামে এক মামলায় মুজিবকে জড়িয়ে ফেলেন। অভিযোগ পেশের সঙ্গে সঙ্গে মুজিবকে জেলে যেতে হয়।

ঐ মামলায় মুজিবের বিরূদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল যে তিনি ভারতের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এবং ভারতের উস্কানিতেই তিনি ৬ দফা সহ ও স্বায়ত্ব শাসনের দাবি তোলেন। আরও অভিযোগ ছিল যে, ভারতের সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে ভারতের সঙ্গে তিনি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। উপরন্তু এই ষড়যন্ত্রের অঙ্গ হিসাবেই এবং তথাকথিত সেই স্বাধীনতাকে কিভাবে পূর্ণ রূপ দেওয়া যায় সে ব্যাপারে বিচার বিবেচনা করার জন্যই তিনি আগরতলা যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

মুজিব ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের বেশ কয়েকজন সামরিক ও বেসামরিক অফিসারকেও এই মামলায় জড়িয়ে ফেলা হয়। মুজিবের সাথে তাদেরও গ্রেপ্তার করা হয়। এই সব ধরপাকড়ের ফলে আওয়ামি লিগের সব নেতাই ভয়ে গা ঢাকা দেন। মুজিবের বাড়ির খবরাখবর নেওয়ার জন্য কোনো নেতাকে খুঁজে পাওয়া মুস্কিল হয়ে পড়ে।

এক মাত্র মোল্লা জালাল নামে মুজিবের এক বাল্যবন্ধুই তখন মুজিবের বাড়ি যেতেন এবং খোঁজ খবর নিতেন। এই মোল্লা জালাল ছিলেন ঢাকা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট ও পরে মন্ত্রী হন।

সেই পরিবেশে ৬ দফা দাবির প্রদীপটিকে জ্বালিয়ে রাখার সাহস আওয়ামি লিগের কোনো নেতাই দেখাতে পারেন নি। একমাত্র মহিলা নেত্রী আমেনা বেগম সে দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে আসেন এবং ৬ দফার পক্ষে বক্তব্য রাখতে থাকেন। আমেনা বেগমের সাথে দেশের সাধারণ মানুষ এবং ছাত্র মহলও এগিয়ে আসে।

পূর্ব পাকিস্তানে আয়ুব বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধলে পশ্চিম পাকিস্তানের

ছাত্ররাও আয়ুব বিরোধী আন্দোলনে নেমে পড়ে। ফলে ঢাকার ছাত্রদের মনে বল ফিরে আসে এবং তারা ব্যপক আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য তারা স্টুডেন্টস অ্যাকশন কমিটি (SAC) গঠন করে। ছাত্রদের নিজস্ব ১১ দফা দাবি ছিল। তার সাথে মুজিবের ৬ দফা যুক্ত হয়। আরও যুক্ত হয় মুজিব সহ সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দাবি। এই ১৮ দফা দাবি সামনে রেখে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এক ব্যাপক ও ঐতিহাসিক গণ আন্দোলন গড়ে তোলে। ঝড়ের বেগে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এতে আওয়ামি লিগের নেতাদের অবদান কিছুই ছিল না বললেই চলে।

মুজিবকে বন্দি করে ঢাকার সেন্ট্রাল জেলে রাখা হয়। চিত্তবাবুও সেই জেলেই বন্দি ছিলেন। তাই এই সময় দুজনের মধ্যে একান্ত আলোচনার সুযোগ ঘটে। আমার শ্বশুর মহাশয় মণিমোহন সরকার এই সুযোগ ঘটিয়ে দেন। তিনি ছিলেন ঢাকার আই জি (প্রিজনস) অফিসের হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট। জেল কমপাউণ্ডের মধ্যেই ছিল তাঁর অফিস।

তাঁর মাধ্যমে জেলার তোফাজ্জল হোসেন সাহেবের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। জেলের একজন ডাক্তারও ছিল আমার পরিচিত। আমার উদ্দেশ্য ছিল চিত্তবাবুকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। আমার অনুরোধে জেলের ডাক্তাররা চিত্তবাবুকে মেডিক্যাল কলেজে পাঠাবার সুপারিশ করল এবং তোফাজ্জলও তাঁর নিয়ম মাফিক সম্মতি জানালেন। ফলে চিত্তবাবুকে মেডিক্যাল কলেজের আউটডোরে নিয়ে আসা হল। এদিকে কলেজের প্রফেসাররা আমার অনুরোধে এই সুপারিশ পাঠালেন যে, চিত্তবাবুর যে অসুখ তার বিভিন্ন পরীক্ষা ও তার চিকিৎসার জন্য তাঁকে মাঝে মাঝেই হাসপাতালে আনতে হবে।

এভাবে চিত্তবাবুকে ঘন ঘন হাসপাতালে নিয়ে আসার ব্যবস্থা হল। হাসপাতালে এসেই তিনি আমার ঘরে চলে আসতেন, চা খাবার অজুহাতেই তিনি আমার ঘরে আসতেন এবং আমরা ২৫/৩০ মিনিট একান্ত আলোচনার সুযোগ পেতাম। এভাবে তার প্রথম রোগটির চিকিৎসার পরে অন্য রোগের চিকিৎসা চলতে থাকল। তার ফলে তার হাসপাতালে যাওয়া অব্যাহত থাকল। চিত্তবাবুর প্রথম সাক্ষাতের দিনই জানতে পারি যে মুজিব সাহেব সহ সব আসামিদের উপর চরম দৈহিক অত্যাচার হয়েছে।

এদিকে জেলের মধ্যে তোফাজ্জল সাহেব মুজিব ও চিত্তবাবুর মধ্যে সাক্ষাৎ

করিয়ে দিতেন। একান্ত আলাপ আলোচনার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা সময় দিতেন। কারণ তোফাজ্জল সাহেব নিজে ছিলেন একজন কট্টর আয়ুব বিরোধী। উপরন্তু আওয়ামি লিগের সমর্থক।

এভাবে চিত্তবাবুর সঙ্গে মুজিবের যা যা আলোচনা হত চিত্তবাবু তা সবই আমাকে জানাতেন। তা ছাড়া মুজিবের যদি কোনো জরুরী খবর কাউকে দেওয়ার থাকত তাও তিনি আমাকে বলতেন। আমি সেই খবর যথাস্থানে যথাকালে পৌঁছে দিতাম। এ ভাবে অনেক গোপন চিঠিপত্র আমি বিলি করে দিতাম।

একদিন চিত্তবাবু আমাকে বললেন যে একটা খুব ভাল খবর আছে। খবরটি হল মুজিব তাকে বলেছেন, ৬ দফা দাবি মেনে নিয়ে শালারা কখনও পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ব শাসন মেনে নেবে না। তাই এবার পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করতে চাই। তার জন্য আপনার মতামত ও সমর্থন চাই। অবশ্য এ কথা মুজিব কয়েকদিন আগেই চিত্তবাবুকে বলেছেন।

চিত্তবাবু বললেন, বেশ কয়েকদিন ধরেই মুজিব তাঁকে এসব কথা বলছেন। কিন্তু তিনি তাতে কোনো সাড়া দেননি। এটাই যে চিত্তবাবুর মনের কথা তা তাঁকে বুঝতে দেন নি। বেশ কয়েকবার শোনার পরও চিত্তবাবু তাতে সম্মতি দেননি। তাঁকে চিত্তবাবু বলেন কাজটি যেমন কঠিন তেমন বিপজ্জনক। শুধু ভাবাবেগে একটা দেশকে স্বাধীন করা যায় না।

এ কথা শোনার পরও মুজিব থেমে যাননি। এ ব্যাপারে চিত্তবাবুর দ্বিধা কোথায় তা জানার জন্য তাঁকে চাপ দিতে থাকেন। পরিস্কার মতামত জানাবার জন্য চিত্তবাবু কয়েকদিন সময় চেয়ে নিলেন। পরের দিন হাসপাতালে এসে চিত্তবাবু আমাকে এ সব কথা বললেন। তাঁকে আমি আমার সন্দেহের কথা জানালাম। মুজিবের উপর খুব দৈহিক অত্যাচার হয়েছে। তাই হয়ত ক্রোধের বশে স্বাধীনতার কথা বলছেন। এমন হতে পারে যে, জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বিপদমুক্ত হলে তিনি অন্য কথা বলতে শুরু করবেন। আমার সন্দেহ ছিল অন্য জায়গায়। আমি জানতাম যে মুজিবের মধ্যে ইসলামি মানসিকতা খুবই গভীর। এখন মারের চোটে সে মানসিকতার পরিবর্তন হলেও চরম মুহূর্তে সেই মানসিকতা আবার ফিরে আসবে না তা সন্দেহাতীত নয়। এভাবে চুলচেরা বিচারের পরে মুজিবের প্রস্তাবে আমরা সম্মতি জানাই। পরের দিন তিনি মুজিবকে বললেন যে স্বায়ত্ব শাসনের থেকে স্বাধীনতার ডাক দিলে তিনি বেশি খুশি হবেন। চিত্তবাবু মুজিবকে আরও বলেন যে মুসলমানদের কাছে স্বাধীনতার ডাক হল বেশি সুযোগ সুবিধা পাবার ডাক। কিন্তু হিন্দুদের কাছে

তা হল বাঁচার ডাক। এইভাবে সেই দিনই সেই জেলের মধ্যে দুই নেতা স্বাধীনতা সংগ্রামের শপথ নিলেন। আমার শপথের কথাও চিত্তবাবু মুজিবকে জানালেন।

যাই হোক, মুজিব নিজেই শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে মত দিয়েছেন এ খবর শুনে খুবই আনন্দ পেলাম। চিত্তবাবু ও আমি, দুজনে এই আনন্দ সমান ভাগে ভাগ করে উপভোগ করলাম। প্রকৃতপক্ষে চিত্তবাবু ও আমি ছিলাম একে অন্যের পরিপূরক। এই মানসিকতা নিয়েই আমরা কাজ করেছি। আমি যেমন তাঁর মত না নিয়ে কোনো সিদ্ধান্তে আসতাম না। চিত্তবাবুও আমার মত না পাওয়া পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত নিতেন না। আমাদের পরস্পরের প্রতি এই বিশ্বাস ছিল খুবই প্রগাঢ়।

এই গভীর বিশ্বাস থেকেই জন্ম নিয়েছিল গভীর বন্ধুত্ব ও মমত্ববোধ। চরম বিপদের কথা জানলেই একজনের ডাকে অন্যজন সাড়া দিতাম।

একবার বাটনাতলার হিন্দু লবির একটা বিশেষ সভায় উপস্থিতির জন্য চিত্তবাবু হঠাৎ জরুরী ডাক দিলেন। ঢাকা থেকে পরের দিন গিয়ে সভায় পৌঁছান সম্ভব নয় জেনেও একটা লঞ্চে উঠে পড়ি। রাত্রে সে লঞ্চ চাঁদকাঠি ঘাটে ধরবে না আমি ভালভাবেই জানি। আমি আরও জানি যে ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। শেষ পর্যন্ত লঞ্চের মধ্যে একটা বিপ্লব ঘটিয়েই সেদিন আমি চাঁদকাঠি ঘাটে নেমে অতি কষ্টে রাত ২ টায় সভা স্থলে পৌঁছাই। আর একবার বাড়ি গিয়ে এরূপ খবর পেয়ে রাত আড়াইটার পর তার ওখানে পৌঁছাই। ডাকাতের ভয়ে সন্ধ্যার পর যে নদীতে যাতায়াত করা যায় না সেই ডাকাতের ভয় উপেক্ষা করেই সেদিন সেখানে পৌঁছাই। আমাদের গোপন সভা রাত ১০ টার পরে বসত। চলত সমস্ত রাত। কিছুদিন পর চিত্তবাবু জেল থেকে বেরিয়ে এলেন কিন্তু মুজিব আগরতলা মামলার আসামি হয়ে জেলে থাকলেন। তখন ছাত্রজনতার আয়ুব বিরোধী আন্দোলনের ঝড় ভুলে উঠেছিল। তা সামাল দিতে আয়ুব রাজনৈতিক নেতাদের গোলটেবিল বৈঠক ইসলামাবাদে ডাকেন। সেই বৈঠকে যোগ দিতে মুজিবকে প্যারোলে মুক্তি দেবার সিদ্ধান্ত নেন। পরে ছাত্রজনতার চাপে বিপর্যস্ত মুজিবকে বিনাশর্তে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। সেই সঙ্গে তার বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তুলে নিতেও বাধ্য হন। তাতেও ছাত্র-জনতা শান্ত না হয়ে ঢাকার সেন্ট্রাল জেলের গেট ভেঙে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্ত করে আনে।

স্বঘোষিত ফিল্ড মার্শাল খেতাব নিয়ে আয়ুব দীর্ঘদিন ধরে প্রতাপের সাথে রাজ্য চালাবার পরে ৬৮ সালেই তার বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন শুরু হয়। তা চরম রূপ নেয় ৬৯ সালের প্রথম দিকেই। তাতে রাজনৈতিক দলের বিশেষ কোনো ভূমিকা

তখন ছিল না। ছাত্রদের কথা হয়ে ওঠে শেষ কথা। তাদের নির্দেশেই সাময়িকভাবে কয়েকদিন ধরে প্রাদেশিক সরকার চলছিল, সে সময়ের (৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাস) একটি ঘটনার কথা আমার বার বার এখনও মনে পরে। দেশের টাল-মাটাল সেই ভয়াবহ অবস্থা সামাল দিতেই আয়ুব খাঁ গোল টেবিল বৈঠক ডাকেন। পাকিস্তানের ভাবী নয়া শাসনতন্ত্রের মূল নীতি নির্ধারণের জন্যই সেই বৈঠক ডাকা হয়েছিল। তাতে আমন্ত্রণ পায় পূর্ব বাংলার পাঁচটি দল — এন ডি এফ, আওয়ামি লীগ,মুসলিম লিগ কমিউনিস্ট পার্টি-ন্যাপ ও জামাতে ইসলাম। সাথে সাথে ঢাকার ছাত্ররাও নিউ মার্কেটে একটি সভার ডাক দেয়। সে সভায় যোগ দিতে উক্ত দলগুলির নেতাদের উপস্থিত হতে ছাত্ররা আহ্বান জানায়। ছাত্রদের সেই ডাকে তখন সাড়া দিতে তারা বাধ্য ছিল। গোল টেবিল বৈঠকে কোন দল কি বক্তব্য রাখবে তা আগাম জানাবার জন্যই সেই সভা। সভায় প্রথমেই এন. ডি. এফ জানায় তারা গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের বক্তব্য বলবে। ৬ দফা সহ পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসনের দাবিতে আওয়ামি লিগ অচল থাকবে। কমিউনিষ্ট পার্টি ও ন্যাপ সমাজতন্ত্র সহ গণতন্ত্রের দাবিতে তারাও অচল থাকবে একথাই তারা জানায়। সভাটি নিউ মার্কেটে হয়েছিল। সব শেষে নেজামে ইসলাম পার্টির পক্ষে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মৌলানা গোলাম আযম। ডায়াসে ওঠার আগেই একজন ছাত্র তার আলখাল্লার পিছন দিক টেনে ধরে। তা উপেক্ষা করে দ্রুত গতিতে তিনি এগুতে থাকেন। তাতে ছাত্রটির হাতে আলখাল্লার পিছনের অর্ধেক অংশ থেকে যায়। আর একজন ছাত্র তার মাথার টুপিটি টেনে নেয়। তবুও দৌড়ে মাইকের সামনে গিয়ে দেখতে পান মাইক বন্ধ করে দিয়েছে। তখন তিনি চিৎকার করে বলতে থাকেন —"আমার দল ইসলামের মূলনীতি ও হাদিসের নির্দেশ মতো ইসলামিক রাষ্ট্র কায়েম করতে জান কবুল করবে। আল্লার হুকুম অমান্য করার ক্ষমতা কোন মুসলমান কেন পৃথিবীতে কারো নাই"। তারপর ডায়াসের সামনে এগিয়ে গিয়ে মাথাটা নত করে গলা বাড়িয়ে দিয়ে চিৎকার করে বলতে থাকেন, মাইক বন্ধ করে দিলেও আল্লার ইচ্ছায় আমার বক্তব্য আমি বলতে পেরেছি। এখনই আমার দেহকে তোমরা ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারো সে শক্তিও তোমাদের আছে। তাই আমি গলা বাড়িয়ে দিয়েছি - "কোতল করতে পারো"। সেদিন তার সেই ব্যবহারে অবাক হয়ে তাজ্জব বনে গেলাম। প্রথমে মনে হলো এটা তার পাগলামি। কিন্তু একটু পরেই চিন্তা করলাম ইসলামের মূল নীতিতে কি আছে তা জানা দরকার। ঐ দিনই একখানা বাংলা কোরান কিনে বাড়ি এলাম। তা পড়ে দেখলাম অধ্যাপক সাহেব ঠিকই বলেছেন। অধ্যাপক গোলাম আজমের বক্তব্য তো সামান্য ব্যাপার, অমুসলমানদের খুন করতে যে সব হুকুম ঐ বইতে লিপিবদ্ধ

আছে তা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। শুধু আমি কেন? যে কোনো অমুসলমান তা পড়লে সে শিউরে উঠবেই। বিভিন্ন সময়ের দাঙ্গা বিশেষ করে ১৯৭১ সালে হিন্দু নিধন যজ্ঞই তার বাস্তব রূপ আমরা দেখেছি আর বর্তমানে ইসলামিক সন্ত্রাস তথা ইসলামিক যেহাদি হুকুম সে বইতে লিপিবদ্ধ আছে। সে হুকুমকে কেউ নাকচ করতে পারে না। সেই বইয়ের একটি অক্ষর বা শব্দ অদল বদল করা চলবে না। তা করতে গেলেই সে বই এবং সাথে সাথে আল্লাকেও অস্বীকার করতে হবে। সে কাজ খুবই কঠিন।

ইয়াহিয়ার উত্থান ও আয়ুবের পতন, আবার মার্শাল ল জারি

সেই অবস্থা সামাল দিতে পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি ইয়াহিয়া খান আয়ুব খাঁকে তাড়িয়ে ২৩ শে মার্চ, ১৯৬৯, দেশের প্রধান সামরিক শাসক হয়ে বসলেন ও নতুন করে সামরিক আইন জারি করলেন। ফলে সব রকম রাজনৈতিক কার্যকলাপ স্তব্ধ হয়ে গেল। আয়ুবের দেওয়া বুনিয়াদি গণতন্ত্রের শাসনতন্ত্রটিও বাতিল হয়ে গেল। তিনি জনগণকে আশ্বাস দিলেন যে দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে শীঘ্রই নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন এবং সেই নির্বাচিত সদস্যরাই নতুন শাসনতন্ত্র রচনা করবেন। সামরিক আইন জারি করেও তিনি রাজনৈতিক নেতাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন না। সাধারণ নাগরিকদের উপর কোনো অত্যাচার চালালেন না।

এইভাবে ৯ মাস চলার পর ইয়াহিয়া খান ২৮ শে নভেম্বর ৬৯, ঘোষণা করলেন যে ১৯৭০ সালের ■ ই অক্টোবর জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের ভোট হবে। এবং দেশের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকই সেই নির্বাচনে ভোট দিতে পারবে। ঘোষণায় আরও বলা হয় যে ১৯৬৯ সালের ২৮ শে নভেম্বর থেকে রাজনৈতিক দলগুলি আবার তাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করতে পারবে। তবে তাদের অবশ্যই ৪টি শর্ত মেনে চলতে হবে। এই ৪টি শর্ত হবে ভাবী শাসনতন্ত্র রচনার মূল ভিত্তি।

জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্যরা এই ৪টি মূলনীতির ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করলে তিনি এই শাসনতন্ত্রকে অনুমোদন দেবেন। সেই শাসনতন্ত্রের নীতি অনুসারে দেশ আবার গণতান্ত্রিক পথে চলতে থাকবে। চারটি শর্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে পাকিস্তানের ভাবী শাসনতন্ত্র ইসলামিক হবে।

সেই ৪টি শর্ত হল :—

(১) দেশের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকই জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ভোট দিতে পারবে।

(২) পাকিস্তানে ইসলামি শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং রাষ্ট্রপ্রধান অবশ্যই মুসলমান হবেন।

(৩) সব নাগরিককেই ইসলামি জীবনধারা অনুসারে জীবন যাত্রা নির্বাহ করতে হবে।

(৪) ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় সরকারি খরচে শিক্ষাকেন্দ্র, প্রচার ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সরকার ইসলামি শিক্ষার্থীদের আর্থিক দায় দায়িত্ব বহন করবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হল যে, কোনো ব্যক্তি এই চারটি মূল শর্তের বিরোধিতা করলে আইনের চোখে সে অপরাধী বলে গণ্য হবে এবং তাকে ৭ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে।

স্বাভাবিকভাবেই এই ঘোষণা হিন্দুদের মনে ভীতির সঞ্চার করে। আমরাও এই ঘোষণার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাই। হিন্দু লবির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেই আমরা ঐ প্রতিবাদ পত্রের বিষয়বস্তু ঠিক করেছিলাম। উক্ত প্রতিবাদ পত্রে আমরা জানিয়েছিলাম যে, পাকিস্তানের হিন্দুরা কখনও ইসলামি জীবন ধারা গ্রহণ করবে না এবং ইসলামি শাসনতন্ত্রকে তারা মেনে নেবে না। তারা হিন্দুমতেই তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করবে। আর যদি সব নাগরিককে ইসলামি ধারায় চলতে বাধ্য করা হয় তবে কোথায় দাঁড়িয়ে তারা তাদের মৌলিক অধিকারের ভিত্তিতে হিন্দু জীবন ধারা অনুসরণ করবে তা সরকারকে জানাতে হবে। এই প্রতিবাদ পত্র পাঠাবার জন্য অবশ্য আমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। আর শাস্তিও হয়নি।

মোহম্মদপুরের দাঙ্গা

১৯৬৯ সালে আয়ুব খাঁকে তাড়িয়ে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা দখল করে সামরিক আইন জারি করল। এর কিছুদিন পরেই ঢাকার মোহম্মদপুরে বাঙালি ও অবাঙালিদের মধ্যে দাঙ্গা হয়। তাতে ৪/৫ জন অবাঙালি মারা যায়। দাঙ্গা শুরু হবার ৩/৪ দিন পর পুলিশ শাঁখারী বাজারের নগেন নন্দী, কালিদাস শূর, বৃন্দাবন নাগ এবং সুরেশ্বর ধরের মত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে আমাকেও গ্রেপ্তার করল। তেজগাঁয়ের মার্শাল ল কোর্টে আমাদের হাজির করা হল। আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে, দাঙ্গাকারিরা কলকাতা থেকে গিয়ে দাঙ্গা করেছে এবং আমরা তাদের আশ্রয় দিয়েছি। অভিযোগ খুবই গুরুতর। তাই সাধারণ ফৌজদারী আদালতের বদলে সামরিক

আদালতে আমাদের হাজির করা হয়েছিল।

কিন্তু পাড়ার গণমান্য নেতাদের এ ভাবে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করায় পাড়ার মানুষ ক্ষেপে যায়। তারা স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে দল বেঁধে খয়েরুদ্দিন সাহেবের কাছে ধর্না দেয় এবং প্রতিবিধান দাবি করতে থাকে। খয়েরুদ্দিন ছিলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন গভর্নর জেনারেল ও পরবর্তী কালের প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনের ভাইপো ও পাকিস্তান মুসলিম লিগের সভাপতি। তাঁর হস্তক্ষেপে আমরা মুক্তি পাই এবং কারাবাস থেকে রেহাই পাই।

এরকম জঘন্য এবং আক্রমণাত্মক ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়া সত্ত্বেও মাতৃভূমি চিরতরে ত্যাগ করার চিন্তা কোনো দিনও করতে পারিনি। এই সব ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেও ৬ দফা দাবির আন্দোলনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছি। এভাবে বাইরে ৬ দফা দাবির কথা বললেও ভিতরে ভিতরে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম ধাপের কাজ চালিয়ে গিয়েছি।

ঢাকায় সংখ্যালঘু সম্মেলন

এই ঘোষণার পর চিত্তবাবু ঢাকায় চলে আসেন। তখন দুজনে একত্রে আলাপ আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, শীঘ্রই ঢাকায় একটি সংখ্যালঘু সম্মেলন ডাকতে হবে এবং সেই সম্মেলনের পক্ষ থেকে ইয়াহিয়া খাঁর ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ জানাতে হবে। এরপর শেখ মুজিবের সঙ্গে একান্ত আলোচনার পর সংখ্যালঘু সম্মেলনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। শেখ মুজিব অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে সংখ্যালঘু সম্মেলনের প্রস্তাবকে সমর্থন করেন।

ঢাকার শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী হিন্দু মহলের প্রায় সকলেই মনে প্রাণে আমাদের সমর্থন জানালো। কিন্তু কোনো ব্যক্তিই সেই সম্মেলনের আহ্বায়ক হতে রাজি নন। অনেক বোঝানোর পর হিন্দু লবির কিছু সমর্থক এগিয়ে আসতে এবং আহ্বায়ক হতে রাজি হলো। তাদের মধ্যে থেকে ৫০/৬০ জনকে আহ্বায়ক করা হল এবং আমার বসত বাড়িকে (১৩০, শাঁখারী বাজার) অফিসঘর করে সম্মেলনের প্রচার পত্র বিলি করা হল। চিত্তবাবু, অ্যাডভোকেট হারাধন সরকার, মলয় রায় এবং আমি এই চারজন মূল উদ্যোক্তা হিসাবে থাকলাম।

নির্দিষ্ট দিনে ঢাকার বার-লাইব্রেরী হলে সভা শুরু হল। বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ১০০০ প্রতিনিধি সভায় যোগ দিয়েছিলেন। উক্ত সভাগৃহে স্থান সঙ্কুলান না হবার ফলে অনেককে বাইরে দাঁড়িয়ে বক্তাদের বক্তব্য শুনতে হয়। ফলে কিছুটা

অসুবিধার সৃষ্টি হয়। উপরন্তু সভার শুরুতেই এক ঝামেলার সূত্রপাত হল। প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীধীরেন দত্ত এবং ছাত্র-লিগের নেতা স্বপন দত্ত সভার কাজে বাধার সৃষ্টি করে। ধীরেন বাবুর বক্তব্য ছিল যে, এই সংখ্যালঘু সম্মেলনের আর কোনো প্রয়োজন নেই। শেখ মুজিবের ৬ দফা ঘোষণা অনুসারে এখন উচিত হিন্দু ও মুসলমান মিলিতভাবে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে স্বায়ত্ত শাসন আদায়ের জন্য লড়াই করা। এই সম্মেলনে লাভের বদলে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। কারণ এই সম্মেলনের ফলে মুসলমানরা হিন্দুদের উপর ক্ষেপে যাবে। ফলে স্বায়ত্ত শাসন আদায়ে বিঘ্ন ঘটবে।

ধীরেনবাবুর সঙ্গে আমাদের খুবই হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। সম্মেলনের ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আমরা আলোচনাও করেছি। আহ্বায়ক হতে রাজি না হলেও তিনি আমাদের প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু সেদিন সভাস্থলে তাঁর বিরোধিতা দেখে আমরা খুবই অবাক হয়ে গেলাম। তাঁর প্রকাশ্য বিরোধিতায় উৎসাহ পেয়ে ছাত্র-লিগ নেতা স্বপন চৌধুরীও এক দল ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে হৈ চৈ শুরু করে দিল। এই সব দেখে ন্যাপ নেতা নীরদ নাগ এবং তাঁর সাথে ছাত্র ইউনিয়নের কিছু ছাত্রও গণ্ডগোল শুরু করে দিল। ফলে সভাপতি সভার কাজ মুলতুবি রাখতে বাধ্য হলেন। সে দিন বিরোধকারী সেই সব ছাত্রদের অভিযোগ ছিল যে, আহ্বায়করা ছিল সাম্প্রদায়িক।

পরের দিন ফরাসগঞ্জের লালকুঠি হল-এ সভা অনুষ্ঠিত হল। সভার প্রথমেই শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ও তাঁর ৬ দফা দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য শুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যালঘুদের প্রতি আহ্বান জানানো হয় তাঁরা যেন দলমত নির্বিশেষে ৬ দফা সহ স্বায়ত্ত শাসনের দাবিতে আন্দোলনে সামিল হন এবং মুজিবের হাতকে শক্তিশালী করেন। সভার শেষে ইয়াহিয়া খাঁর ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাস করা হয়। উপরন্তু ইসলামি শাসনতন্ত্র ও ইসলামি ধারার জীবন যাত্রা চালাবার বিরুদ্ধে কার্যকরী আন্দোলন গড়ে তোলবার সংকল্প গ্রহণ করা হয় এবং এই আন্দোলনের ভাবী কার্যসূচি তৈরি করার জন্য ১১ সদস্যের একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়।

আগের দিনের সভায় হিন্দু নেতাদের গণ্ডগোল করার পিছনে একটা বিশেষ কারণ ছিল। সুদীর্ঘকাল ধরে হিন্দুদের ওপর যে অত্যাচার হয়ে আসছে তার প্রতিবিধান করা দূরের কথা, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা বা কোনো আন্দোলন গড়ে তোলা ঐ সব নেতাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই বর্তমানে তাঁরা শেখ মুজিবের ওপর নির্ভর করে তাঁদের নেতৃত্ব বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে মুজিবের প্রতি তাদের অবিচল আনুগত্য প্রকাশ করার জন্যই তাঁরা সভার কাজে বাধার সৃষ্টি

করেছিলেন। ইয়াহিয়া খাঁর ঘোষণাপত্রের কোনো প্রকাশ্য প্রতিবাদ করা তাঁদের সাধ্যে কুলোয়নি। অপর দিকে ইয়াহিয়ার ইসলামি করণের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আওয়ামি লিগও কোনো প্রতিবাদ করেনি। এই কারণেও তাঁরা সভার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করেন।

এ ব্যাপারে সব থেকে বড় কথা হল, আওয়ামি লিগ মুসলমানদেরই একটা রাজনৈতিক দল। তাই এই দলের গঠনতন্ত্রে রাষ্ট্রকে ইসলামিকরণের বিরুদ্ধে কোনো কর্মসূচি ছিল না। বরং বলা চলে যে, পাকিস্তান ইসলামিরাষ্ট্র এবং সে কারণে ইসলামিকরণের প্রতি আওয়ামি লিগের প্রচ্ছন্ন মদত ছিল। সেই কারণেই ইয়াহিয়ার ঘোষণাপত্র জারি হবার পরও এর বিরুদ্ধে আওয়ামি লিগের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিবাদ ওঠেনি।

আপরদিকে হিন্দু সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরেই হিন্দুরা মুজিবের নেতৃত্ব স্বীকার করেছিল। কিন্তু মুজিবের প্রতি পুরোপুরি বিশ্বাস আমাদের কোনো দিনই ছিল না। কারণ, যত কথাই বলুক, আসলে মুজিব নামাজ রোজাকারী একজন মুসলমান মাত্র। তাই যে কোনো দিন, যে কোনো সময় তিনি হিন্দুর সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন। এই কারণে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্যই আমরা ওই সম্মেলনের আয়োজন করেছিলাম। কিন্তু দেখা গেল, নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে নিজ দায়িত্বে কিছু করার সাহস হিন্দুরা অনেক আগেই হারিয়ে ফেলেছে। পরের আনুগত্য স্বীকার করাই তাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছে। অন্যের চরণে নিজেকে অর্পণ না করতে পারলে যেন তাদের ঘুম হয় না। তারা ১৭৫৭ সালে ইংরেজদের ডেকে এনে এক অত্যাচারী, দুশ্চরিত্র ও লম্পট মুসলমানকে সরিয়ে আরেকজন মুসলমানকে নবাবের গদিতে বসাল। জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ ও রায় দুর্লভের দল সেদিন নিজেরা রাজা হবার স্বপ্ন দেখতে পারল না। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের সময় সেই এক জন মুসলমান বাহাদুর শাহকেই তাদের নেতা বলে ঘোষণা করল, কোনো হিন্দুকে নেতার আসনে বসাতে পারল না। ভারতের শাসন ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে তুলে দেওয়ার আলাপ আলোচনার জন্য বৃটিশ সরকার ১৯৪৬ সালে ভারতে কেবিনেট-মিশন পাঠাল। সেই আলোচনায় কংগ্রেস পক্ষে আবুল কালাম আজাদ মুসলিম লিগের পক্ষে মিঃ জিন্না আলোচনা চালালেন। এরা দুজনই মুসলমান। সেদিনও কোনো হিন্দুকে খুঁজে পাওয়া গেল না। ১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হাতে পেয়েও মাউন্ট ব্যাটেনকে এক বছর ভাইসরয় হিসাবে স্বাধীন ভারতের কর্ণধার করে রাখলেন, কোন হিন্দুকে ঐ আসনে বসানো গেল না। সেই একই কারণে বিদেশিনী সোনিয়াকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী করার জন্য কংগ্রেস উঠে পড়ে লেগেছিলেন। এভাবে দেখা

যায় প্রকৃত যুদ্ধ কালে তাঁরা দুর্বল হয়ে পড়েন। আর বাধ্য হয়ে যুদ্ধে নামলেও এবং সে যুদ্ধে যদি জয়ীও হন, শেষ মুহূর্তে যুদ্ধ থামিয়ে চুক্তি করেন। সে চুক্তিতেও তাঁরা হেরে বসে থাকেন। অতীতে কাশ্মীর যুদ্ধে, তথাকথিত বাংলাদেশ যুদ্ধে ■ ভারতের উত্তর পূর্ব অঞ্চলের নাগাদের (খ্রীষ্টানদের) বেলায় একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

যাই হোক, ধীরেন দত্ত ছিলেন পূর্ববঙ্গের একজন শ্রদ্ধেয় হিন্দু নেতা। আয়ুব খাঁর সামরিক শাসনকালে হিন্দুদের উপর চরম অত্যাচার হয়। পরেও সে অত্যাচার সমানে চলতে থাকে। সেই সময় তিনি আমাদের চেষ্টায় হিন্দুদের সংঘবদ্ধ করে সেই অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসেন। ১৯৬৪ সালের প্রথম দিকে ধীরেন বাবুর নেতৃত্বে একটি সংখ্যালঘু সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু ঐ সময়ে ভারতের হজরৎবাল মসজিদ থেকে মহম্মদের চুল চুরি যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্ববঙ্গে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। ফলে সম্মেলনের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হয়।

তবে ঐ বছরের জুন মাসে তাঁরই নেতৃত্বে ২২ জন হিন্দু নেতা গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং হিন্দুদের করুণ কাহিনী তাঁর সামনে তুলে ধরি। প্রতিকারের অনুরোধ জানিয়ে একটা স্মারক লিপিও তাঁকে দেওয়া হয়। এই ধীরেন বাবু যখন সব জেনেও আমাদের সঙ্গে কোনো রকম আলোচনা না করেই ঐ দিন সভা ভাঙার চেষ্টা করলেন তখন আমরা খুবই অবাক হলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমরা এটাও বুঝতে পারলাম যে, তাঁকে আর আগের মতো বিশ্বাস করা চলে না। বুঝতে পারলাম মুজিবের সঙ্গে একসঙ্গে আন্দোলন শুরু হলে যখন সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি চলবে, তখন আমাদের সমর্থন আদায় করতে বাইরে মুজিব খুবই বন্ধুত্ব দেখাবেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সুযোগ পেলেই আঘাত করবেন।

আমরা বুঝতে পারলাম যে শেখ মুজিবের ইঙ্গিতেই সেদিন সভা বানচাল করা হয়েছিল। প্রথম দিকে গভীরভাবে চিন্তা না করেই মুজিব সংখ্যালঘু সম্মেলনকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। পরে কিছু হিন্দু নেতা তাকে বোঝালেন যে, সংখ্যালঘু সম্মেলন মানেই সাম্প্রদায়িকতার সমর্থন। এর পরেই মুজিব নতুন ভাবে চিন্তা করতে শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারলেন যে, সম্মেলন সফল হলে হিন্দু শক্তির একটি নতুন শক্তিশালী কেন্দ্র তৈরি হবে এবং পরে তারা তাঁর সঙ্গে দর কষাকষি শুরু করবে। তার চেয়ে ভালো হবে যদি সম্মেলনটাকে বানচাল করে দেওয়া যায়। তাই তিনি সম্মেলন বানচাল করার গোপন প্রস্তুতি নিলেন। এই চক্রান্তে তাঁর সাথি

হলেন সেই সব হিন্দু নেতারা, যারা ইয়াহিয়ার ঘোষণার প্রকাশ্য প্রতিবাদ করতে ভীত কিন্তু মুজিবের প্রিয়পাত্র হবার জন্য লালায়িত। এভাবেই সম্মেলন ভেঙে দেবার চক্রান্ত দানা বাঁধে।

গণমুক্তি দল

যাই হোক, এইভাবে সব রকম বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে যেমন সম্মেলন সফল হল, তেমনি সেই সম্মেলনে প্রস্তাবিত ১১ জন সদস্যের সাব কমিটির উপদেশ মতো ১৯৭০ সালের জানুয়ারিতে গঠিত হল "জাতীয় গণমুক্তি দল" — একটি অ-সাম্প্রদায়িক জাতীয় রাজনৈতিক দল। এই দলের ঘোষিত কর্ম সূচি ছিল অ-সাম্প্রদায়িক শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্ব শাসন। স্বায়ত্ব শাসনের দাবিকে সামনে রেখে এই দল মুজিবের ৬ দফাকে পূর্ণ সমর্থন জানাল।

নতুন হলেও এই দল এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল। এক মাত্র এই দলটি ইয়াহিয়া খাঁর ইসলামিকরণের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম লিখিত ভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করার ডাক দিল।

আগেই বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত পূর্বপাকিস্তানের অনেক রাজনৈতিক দলই নিজেদের অ-সাম্প্রদায়িক দল বলে দাবি করত। কিন্তু ইসলামিকরণের প্রতি তাদের প্রচ্ছন্ন মদত ছিল। তাই ইয়াহিয়া খাঁর ঘোষণার পর পূর্ব পাকিস্তানের কোনো রাজনৈতিক দলই ইসলামিকরণের বিরুদ্ধে কোনো বক্তব্য রাখত না। লাহোর প্রস্তাবে ভারতের দুই অঞ্চলে দুটো সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব ছিল। গণমুক্তি দল সেই লাহোর প্রস্তাবকে জনগণের সামনে তুলে ধরল। তার মূল কথাই হল—পূর্ববঙ্গকে সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকার করার মধ্য দিয়েই পাকিস্তান আন্দোলন জোরদার হয়। এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। কিন্তু আলাদা রাষ্ট্রের কথা বললেই রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হতে হবে। তাই বাইরে স্বায়ত্ব শাসনের কথা বললেও ভিতরে ভিতরে স্বাধীনতার প্রস্তুতি চলতে থাকে।

নতুন এই গণমুক্তি দলের আমি হলাম প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক। শ্রীচিত্তরঞ্জন সুতার হলেন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। বিশিষ্ট সমাজসেবী, স্বাধীনতা সংগ্রামী গান্ধীবাদী নেতা শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য হলেন সভাপতি এবং অ্যাডভোকেট শ্রীমলয় রায় হলেন প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম সম্পাদক।

গণমুক্তি দল গঠিত হবার পরে তার প্রথম প্রকাশ্য অধিবেশন হয় ১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, ফরিদপুর জেলার সাতপাড় গ্রামে। প্রকাশ্য সভায় সেখানে

অভাবনীয় লোক সমাগম হয়েছিল। কিন্তু সন্ধ্যার দিকে শীতের কারণে লোকজন সভা ত্যাগ করে চলে যেতে থাকে। তাই দেখে ক্ষোভে দুঃখে আমরা তাদের বলতে বাধ্য হয়েছিলাম — ঢাকা থেকে আমরা এসেছি আপনাদের বেদনার কথা শুনতে আর আমাদের কিছু কথা আপনাদের জানাতে। ঘরবাড়ি আগলাতে, গরু বাছুর সামলাতে শীতের ভয়ে আপনারা সভার শেষ বক্তব্য না শুনেই চলে যাচ্ছেন। অথচ ঐ ঘরবাড়ি, গরু বাছুর শেষ পর্যন্ত আপনাদের থাকবে কিনা সেই বক্তব্যই আমরা বলতে এসেছি। পূর্বে অনেক মানুষই তাদের ঘরবাড়ি, গরু বাছুর, জমি জায়গা সব সম্পত্তির মায়া, এমন কি আত্মীয় স্বজনদের মায়াও ত্যাগ করে চিরতরে দেশ থেকে চলে গেছে। এমন একদিন হয়তো আপনাদের সামনে আসবে, যেদিন সব কিছু ত্যাগ করে আপনাদেরও পালাতে হবে। এই ভাবে দেশত্যাগ করে পালানো চিরতরে বন্ধ করার কথা বলতেই আমরা এসেছি। আমাদের কথা আপনাদের শোনা দরকার কারণ, যে কোনা দিন, যে কোনো মুহূর্তে হয়াতো আপনাদের দল বেঁধে দেশত্যাগ করতে হতে পারে।

গণমুক্তি দলের ঘোষণাপত্রে স্বায়ত্বশাসনের দাবির আড়ালে স্বাধীন পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্র গঠনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। তখন কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষেই স্বাধীনতার কথা চিন্তা করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। তখন তাদের কাছে স্বাধীনতা ছিল কল্পনাতীত। শুধু তাই নয়, স্বাধীনতার কথা বললে তখন সব রাজনৈতিক দলই তার বিরোধিতা করত। এমন কি আওয়ামি লিগের কাছেও তখন স্বাধীনতার কথা ছিল অবাস্তব। তখন প্রকাশ্যে স্বাধীনতার কথা বললে আওয়ামি লিগ নিশ্চয়ই তার বিরোধিতা করত। এককালে ৬ দফা দাবিরও তারা বিরোধিতা করেছিল। কাজেই স্বাধীনতার কথা বললে তারা যে আরও প্রবলভাবে তার বিরোধিতা করত তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতার ব্যাপারে আমাদের যুক্তিগুলো ছিল অকাট্য এবং তা রূপায়ণের বিষয়ে আমরা ছিলাম নিশ্চিত। তাই গণমুক্তি দলের ঘোষণাপত্রে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে সাহসের সঙ্গে লেখা হয়েছিল, "পাকিস্তান সৃষ্টির ২২ বছর পরেও যদি সংখ্যালঘুদের ভিটামাটি ছাড়িয়া যাইতে বলা হয় তবে ন্যূনতম দায়িত্ব হিসাবে তাহাদের জন্য অন্য কোনো আস্তানার ব্যবস্থা করিয়াই তাহাদের যাইতে বলিতে হইবে।" এই বক্তব্য সংখ্যালঘুদের জন্য পাকিস্তানের সীমানার মধ্যে একটি হোমল্যাণ্ড গড়ার দাবির ইঙ্গিত ছাড়া আর কিছুই নয়। আর ইসলামিক পাকিস্তানের মধ্যে বসবাস করে এর থেকে স্পষ্ট ভাষায় এই দাবির কথা বলা সম্ভব ছিল না। জাতিসঙ্ঘের ঘোষণার ওপর ভিত্তি করেই সেদিন ইঙ্গিতে ওই হোমল্যাণ্ডের দাবি রাখা হয়েছিল।

ই দলের নামের পূর্বে সেদিন ইচ্ছা করেই পাকিস্তানের উল্লেখ করা হয়নি। কারণ আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে, অদূর ভবিষ্যতে পূর্ব পাকিস্তান ভেঙে গিয়ে পূর্ববাংলা স্বাধীন হবে। সেই জন্য সব জায়গাতেই পূর্ব পাকিস্তানের বদলে পূর্ববাংলা লেখা হয়েছিল। আমাদের মনে তখন পাকিস্তানের কোনো স্থান ছিল না। গণমুক্তি দলের ঘোষণা পত্রই প্রমাণ করে যে পূর্ববাংলার স্বাধীনতার ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত ছিলাম।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হল এই যে, স্বাধীন হবার পর পূর্ব পাকিস্তানের নাম হল বাংলাদেশ। অর্থাৎ বিনা যুদ্ধে তারা পশ্চিমবাংলা দখল করে নিল। এখানেই ধরা পড়ে হিন্দুদের রাজনৈতিক চেতনার অভাব। বাংলাদেশ নামকরণের মাধ্যমে তারা হয়ে গেল বাংলা ভাষার একচ্ছত্র মালিক। বাংলাভাষার ওপর আজ তাদেরই পূর্ণ অধিকার। বাংলাদেশ নামকে স্বীকৃতি দিয়ে ভারত, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার মানুষ আজ চরম বিপদের মুখে। ভারত তার অজ্ঞতার জন্যই হয়তো অংশকে সম্পূর্ণ ধরে নিয়েছে। কিন্তু অংশ কখনও সম্পূর্ণ হতে পারে না, এটুকু বোঝার মতো ক্ষমতা ভারতের নেতাদের ছিল না।

যাই হোক, গণমুক্তি দলের সাতপাড়ের প্রকাশ্য অধিবেশন হবার কিছুদিন পরেই বাটনাতলার গার্লস্ স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রী নগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের জরুরি বার্তা পেয়ে আমি সেখানে যাই। নগেনবাবু ছিলেন বরিশাল জেলার স্বরূপকাঠি থানার বিরাট হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলের একজন বিশিষ্ট সমাজ নেতা এবং স্থানীয় হিন্দু লবির একজন বিশিষ্ট কর্মী। বাইরে থেকে হিন্দু লবির সদস্যরা বাটনাতলায় গেলে নগেনবাবুই তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। হিন্দু লবির নেতা হবার সুবাদে তিনি ছিলেন জাতীয় গণমুক্তি দলের এক বিশিষ্ট নেতা।

বাটনাতলা পৌঁছে সেখানকার হিন্দু লবির তথা গণমুক্তি দলের বিশিষ্ট কর্মী ও নেতাদের নিয়ে একটা বৈঠক করি। সাতপাড়ের অধিবেশন নিয়ে সেই বৈঠকে আলোচনা হয়। তবে হিন্দুদের দেশত্যাগের বিষয়টিই সর্বাধিক প্রাধান্য পায়। অনেকে যুক্তি দেখাল যে, সে সময় দেশে যানবাহনের যে অবস্থা তাতে সব হিন্দুর পক্ষে দেশত্যাগ করে চলে যাওয়া এক অসম্ভব ব্যাপার। হিন্দুর ঘরে রোজ যত শিশু জন্মায় তত হিন্দুর পক্ষে প্রতিদিন সীমানা পেরিয়ে ভারতে চলে যাওয়া সম্ভব নয়। এক সময় সীমান্তবর্তী অঞ্চলের হিন্দুরা যানবাহনের তোয়াক্কা না করে পায়ে হেঁটেই সীমানা অতিক্রম করে গিয়েছিল। তাতেও পূর্ববঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা কমে নি। হিন্দুর সংখ্যা না কমে বরং বেড়েছে। দেশভাগের সময় হিন্দুর যে সংখ্যা ছিল তা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। তা ছাড়া বর্তমানে তাদের অনেক দূরের পথ অতিক্রম করতে হবে।

যানবাহন ছাড়া তা সম্ভব হবে না। কাজেই দেশত্যাগের ব্যাপারটা হিন্দুর কাছে ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠেছে। তাই পূর্ববঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা বাড়তেই থাকবে।

দেশের তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অঙ্কে কোনো ভুল ছিল না। কিন্তু সে সব জেনেও স্বাধীনতার ঝড়ের কথা চিন্তা করে চিত্তবাবু ও আমি সেদিন তাদের অন্য কথা বলেছিলাম। আমরা বলেছিলাম যে, কিভাবে সবাই যাবে সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল এই যে, ভবিষ্যতে হয়তো দেশের অবস্থা এমন হবে যে তারা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হবে। হয়তো সেই পরিস্থিতিতে তিন ভাগের দুই ভাগ হিন্দুর দেশত্যাগ না করে উপায় থাকবে না। উপরন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই হয়তো তাদের চলে যেতে হবে। আজ যেটা অসম্ভব মনে হচ্ছে ভবিষ্যতে যে তা সম্ভব হবে না তা কে বলতে পারে? অনেক সময়ই এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যুক্তি দিয়ে তা ব্যাখ্যা করা যায় না।

আমাদের সেদিন অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। বিশেষ করে গণমুক্তি দলের ঘোষণা পত্রের ব্যাপারেই তাদের উৎসাহ ছিল বেশি। আমাদের ঘোষনাপত্রে দাবি ছিল যে, পাকিস্তানের দুই অঞ্চলে আলাদা মুদ্রা, আলাদা রিজার্ভ ব্যংক থাকতে হবে। পূর্ববঙ্গ থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্র কোনো ট্যাক্স আদায় করতে পারবে না। এই সব ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের এক্তিয়ারভূক্ত থাকবে। শুধু দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয় ছাড়া আর কোনো ব্যাপারে পূর্ববঙ্গের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ পাকিস্তান রাষ্ট্রের হাতে থাকবে না। কর্মীদের অনেকেই সেদিন এই প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, উপরিউক্ত ঘোষণা তো স্বাধীনতা ঘোষণার পর্যায়ে পড়ে। তা কি সম্ভব?

পাকিস্তানী আই বি'র হানা

সেদিন আমরা এসব প্রশ্নের ভাসা ভাসা জবাবই শুধু দিয়েছিলাম। কারণ পূর্ণ স্বাধীনতার কথা মনে থাকলেও তা প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত মনে করিনি।

এসব কথা সম্যকভাবে তাদের বুঝতে দেরি হলেও পাকিস্তান গোয়েন্দা বিভাগের লোকদের পক্ষে বুঝতে দেরি লাগেনি। যে দিন আমরা বৈঠক করলাম সেই দিনই গোয়েন্দা বিভাগের বরিশাল জেলার ডিস্ট্রিক ইন্সপেক্টর, ইন্টেলিজেন্স [D.I.B.(I.)] অনেক রাত্রে বাটনাতলায় হাজির হন। তখন রাত প্রায় ১২ টা। বৈঠক শেষ করে কর্মিরা যে যার বাড়ি চলে গেছে। পরের দিন লঞ্চে ঢাকা যাব ঠিক করে সেদিন রাত্রে আমি বাটনাতলায় থেকে যাই। উদ্দেশ্য ছিল চিত্তবাবুর সঙ্গে বিশেষ কিছু কথাবার্তা সেরে নেওয়া। ঠিক এমন সময় আই বি অফিসারের

আগমন হল।

যতদুর মনে পড়ে সেই অফিসারের নাম ছিল ইউনুস সাহেব। তিনি প্রথমেই বললেন যে, বিশেষ করে আমার জন্যই তার বাটনাতলায় আসা। তিনি আমাদের রাত্রে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানালেন। ভদ্রলোকের বাহ্যিক আচার ব্যবহার খুবই ভালো ছিল। তবুও প্রথমে আমরা ভীত হয়ে পড়ি। আমরা ভাবি আমাদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ অন্ধকারে বাড়ি ঘেরাও করে ফেলেছে। যদিও তা সত্য নয় তবে আমাদের দুর্বলতার জন্যই আমরা ভীত হয়েছিলাম।

কথাবার্তা শুরু হতেই তিনি যা বললেন তাতে আমরা খুবই অবাক হলাম। কিছুটা ভয়ও পেলাম। তিনি বললেন, পূর্ববঙ্গকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা নিয়ে যে ইতিমধ্যে কাজকর্ম শুরু হয়ে গিয়েছে তা আর আই বি বিভাগের অজানা নেই। উপরন্তু চিত্তবাবু, শেখ মুজিব ও ডাঃ বৈদ্য যে এর মুখ্য ভূমিকায় আছেন তাও তাদের কাছে খবর আছে। ডাঃ বৈদ্যের আগমনের সংবাদ পেয়েই যে তিনি বাটনাতলায় আসছেন তাও তিনি স্বীকার করলেন।আমরা বুঝতে পারলাম যে, চিত্তবাবু ও আমার সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলার জন্যই ইউনুস সাহেব তড়িঘড়ি অনেক কষ্ট করে ঐ গভীর রাতে বাটনাতলায় উপস্থিত হয়েছেন। প্রথম দিকে একটু দুর্বল ও ভীত হয়ে পড়লেও, ক্রমে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে আমাদের মনোবল ফিরে পেলাম।

ইউনুস সাহেব খোদার নামে শপথ খেয়ে বললেন যে, তিনি মনে প্রানে পূর্ববাংলার স্বাধীনতা চান। আমরা কিছু জিজ্ঞাস করার আগেই ইউনুস সাহেব আবেগের চোটে তাঁর মনের কথা অকপটে বলতে লাগলেন। আমাদের বললেন যে, তিনি আমাদের শত্রু নন। তবে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে যে, আমরা পাকিস্তান ভেঙে স্বাধীন পূর্ববঙ্গ গড়তে চাই। তার সত্যতা যাচাই করতেই তাঁর আগমন। উপরন্তু তিনি আমাদের প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, আমাদের সঙ্গেতিনি বন্ধুর মতোই ব্যবহার করবেন।

মনে পড়ে, শেষের দিকে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন যে, শক্তিশালী পাকিস্তানী সৈন্যদের পরাজিত করে কোন উপায়ে পূর্ববঙ্গ স্বাধীন হবে। সেদিন খুব চতুরতার সঙ্গে চিত্তবাবু এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে কেউ যদি পূর্ববঙ্গকে স্বাধীন করার কথা চিন্তা করে থাকে তবে সে মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। পাক সামরিক বাহিনীকে যুদ্ধে পরাস্ত করে পূর্ববঙ্গ কে স্বাধীন করা এক অসম্ভব কাজ। পূর্ববঙ্গের সব মানুষ এক হয়ে সমস্ত রকমের

ত্যাগ স্বীকার করেও যদি স্বাধীনতা সংগ্রামে নামে, তবুও পূর্ববঙ্গ স্বাধীন হবে না। কারণ পূর্ববঙ্গে তেমন কোনো অস্ত্রসক্তি নেই। তবে বৃহত্তর স্বয়ত্বশাসন তারা আন্দোলন করে আদায় করতে পারবে। তবে এ কথাও সত্য যে, পূর্ব্ববঙ্গিয় অস্ত্রধারীরা যদি তাদের অস্ত্র ঘুরিয়ে পশ্চিমের দিকে তাক করতে পারে, তবে আন্তর্জাতিক চাপের মুখে কোনো অঘটন ঘটাতেও পারে। এই আলোচনা কালে নাগেনবাবুও উপস্থিত ছিলেন।

তার পরের দিনই ইউনুস সাহেব বাটনাতলা ছেড়ে চলে গেলেন। আমাদের বিরুদ্ধে সেদিন কোনো রিপোর্ট দেননি বলেই আমাদের বিশ্বাস। কারন সে রকম কোনো লক্ষন এর পরে আমরা দেখিনি। তখনকার দিনে পাকিস্তানের, বিশেষ করে বরিশালের এই ডি আই বি-১ এর ভয়ে পুলিশের এস পি, এমন কি জেলা শাসকও কাঁপত। সে সময় এই আই বি অফিসারদের ক্ষমতা ছিল অসীম।

গণমুক্তি দল গঠনের পরেই ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা ও যশোরের বিভিন্ন জায়গায় জনসভায় আমরা বিপুল সাড়া পাই। প্রথম দিকে ৭০ সালের নির্বাচনের কথা আমরা চিন্তা করিনি। কারণ স্বাধীন পূর্ববঙ্গ গঠন করাই ছিল আমাদের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্মসূচি।

সংখ্যালঘু সম্মেলনে মুজিবরের গোলমাল সৃষ্টির প্রচেষ্টা নিয়ে পরে আমরা চিন্তা ভাবনা করি। আমরা বুঝতে পারি মুজিবের মনে যাই থাকুক না কেন বৃহত্তর স্বার্থে তার সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে হবে। কেননা যথেষ্ট যোগাযোগের অভাবের ফলে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। এই কারণে মুজিবের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। মুজিবেরও তখন প্রয়োজন ছিল সবসময় আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার। তাই পারস্পরিক স্বার্থেই ক্রমে যোগাযোগ ঘনীভূত হয়। আস্তে আস্তে বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে তার সাময়িক ষড়যন্ত্রের কথা আমরা ভুলে না গেলেও তা না জানার ভান করে থাকি। তাই গণমুক্তি দলের সমস্ত জনসভায় মুজিবের প্রশংসা ও তার নেতৃত্বের প্রতি অবিচল বিশ্বাসের উল্লেখ করেই আমরা আমাদের বক্তব্য রাখতে থাকি।

মুজিবের লন্ডন যাত্রা

জেল থেকে মুক্তি পাবার কিছু দিন পরেই একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে মুজিব লন্ডনে যান। সেই বিশেষ উদ্দেশ্যটা কি, তা কেবল মাত্র মুজিব নিজে, চিত্তবাবু ও আমি জানতাম। লন্ডনের কাজ সেরে ঢাকা ফেরার দিনই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা

করলাম। কারণ তাঁর লন্ডন যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের কাছে তার ফলাফল ছিল আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সেদিন আমাকে দেখেই মুজিব খুশির মেজাজে চিৎকার করে বলে উঠলেন, "খবর খুব ভালো। উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।" কিন্তু পরক্ষণেই আরও জোরে ক্রুদ্ধ স্বরে চিৎকার করে বলে উঠলেন, "কবিরাজ, উদ্দেশ্য সফল হয়েছে বটে, কিন্তু গুজরাটে হিন্দুরা যেভাবে মুসলমানদের মারছে তাতে এখানকার মুসলমানরাও যদি হিন্দুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন পরিণতি কি হবে?" (আমাকে বৈদ্য না বলে তিনি কবিরাজ বলতেন এবং সেই সময় ভারতের গুজরাটে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা চলছিল।) সে কথার কোনো জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সেদিন সম্ভব হয়নি। কারণ সেই মুহূর্তে মুজিবের চোখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল, যেন একটা হিংস্র বাঘের সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি। যে কোনো মুহূর্তে সেই হিংস্র বাঘ আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। মুজিবের সেই হিংস্র চেহারাটার কথা জীবনে ভুলতে পারব না।

তার পরক্ষণেই তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। সংযত হলেন। আর চিত্তবাবুকে সত্বর ঢাকা আসার জন্য জরুরি খবর পাঠাতে বললেন। সেভাবে আমার জরুরি খবর পেয়ে চিত্তবাবু ঢাকায় এলে মুজিবের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ব্যাপারটা তাঁকে বিস্তারিত ভাবে জানালাম। তার পর মুজিবের লন্ডন যাত্রার সাফল্য ও অন্যান্য বিষয়ে আমাদের আলোচনা হয়। তখন আমরা এই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, মুজিবের লন্ডন সফর যেহেতু সফল হয়েছে তাই তাঁর ব্যক্তিগত গুণাগুণের দিকে গুরুত্ব দেওয়াটা ঠিক হবে না। কারণ আমাদের অন্তিম লক্ষ্য হল পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা। সেই মহান উদ্দেশ্যের কাছে এ সব ছোটোখাটো ঘটনা নিতান্তই তুচ্ছ ব্যাপার। মুজিবকে দিয়ে পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা ঘোষণা করানটাই ছিল আমাদের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কাজ। আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে, তাঁর মুখ দিয়ে একবার স্বাধীনতা ঘোষণা করাতে পারলে পূর্ববঙ্গ স্বাধীন হবেই হবে। কেউ তা রুখতে পারবে না।

আর পূর্ণ স্বাধীনতার কথা যদি নাও বলেন, তাতে কিছু যায় আসে না। স্বায়ত্ব শাসনের কথা বলে সাহসের সঙ্গে ৬ দফা দাবি ঘোষণা করাই যথেষ্ট হয়েছে। তাঁর ৬ দফাকে কেন্দ্র করেই আজ কাজ এতটা এগিয়েছে। আবার জোরালোভাবেই সেই দাবী রাখলে কাজ আরও শতগুণ বেড়ে যাবে। বিভিন্ন দল বা ব্যক্তি স্বায়ত্বশাসনের ব্যাপারে কিছু কথা বলেছে। কিন্তু তাঁর মতো সুনির্দিষ্টভাবে ৬ দফা ঘোষণা তো কেউ করতে পারেনি। আর স্বাধীনতার ডাক দিতে যে প্রস্তুতি দরকার

সেই প্রস্তুতি তিনি এখন নিচ্ছেন। তাই আমাদের কাজ হবে তাঁর দিকে সমস্ত রকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সঠিক পথে চালিত করা।

সেই সময় মৌলানা ভাসানী পাকিস্তানকে তালাক দেবার আহ্বান জানাচ্ছিলেন। কিন্তু তার সেই ডাকের ভিত্তি ছিল ইসলামি সংস্কৃতি। কিন্তু ইসলামি ভিতের উপর পূর্ববঙ্গ স্বাধীন হবে তা আমরা মেনে নিতে পারি না। আমাদের লক্ষ্য ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা। কাজেই আমাদের কাছে তখন একটাই পথ মুজিবকে বিশ্বাস না করেও তাঁকে সামনে রেখেই আমাদের এগোতে হবে।"

মুজিবের লন্ডন যাত্রার সফলতার ভিত্তিতে তাঁর সঙ্গে বিশেষ আলোচনার পরেই তখন কিছু কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অবশ্য কি কি আলোচনা সেদিন মুজিবের সঙ্গে হয়েছিল এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে কি কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তা প্রকাশ করে বলা এখন সম্ভব নয়। তবে চিত্তবাবুর কলকাতা আসার সিদ্ধান্ত ওদিন নেওয়া হয়। মুজিবের প্রতিনিধি হয়েই তিনি স্বাধীন পূর্ববঙ্গের জন্য গোপনে কাজ করেন।

আগেই বলেছি যে, চিত্তবাবুর ঢাকা থেকে অনেক দূরে বরিশালে তার গ্রামের বাড়িতে থাকতেন এবং মাঝে মাঝে ঢাকায় আসতেন। আমি ঢাকা শহরেই বাস করতাম। তাই মুজিবকে জানার সুযোগ আমার ছিল অনেক বেশি। আমাদের মধ্যে বয়সের তফাৎ তেমন বেশি ছিল না। বড় জোর ৪/৫ বছরের ব্যবধান হবে। তাই বেশ সহজ সরল ভাবেই আমরা মেলামেশার সুযোগ পেয়েছি। দরকার মতো আমার গাড়িও তিনি ব্যবহার করতেন, কারণ তখন আওয়ামি লিগের কোনো কর্মী বা নেতার গাড়ি ছিল না। নেতাদের বেশির ভাগই ছিলেন ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর এজেন্ট বা ইন্সপেক্টর। মুজিব নিজেও ছিলেন একটা বীমা কোম্পানীর (সম্ভবত আলফা ইনস্যুরেন্স কোং) এর ডেপুটি ম্যানেজার। এই ছিল তখনকার আওয়ামি লিগ নেতাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। অফিসগাড়ি ছাড়া মুজিবের নিজের কোনো গাড়ি ছিল না। শুধু অফিসের সময় তা ব্যবহার করতে পারতেন।

শেখ মুজিবের সঙ্গে আমার বা চিত্তবাবুর কথাবার্তা হত অত্যন্ত গোপনে। কারণ আমাদের আলাপ-আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমন বিপজ্জনক। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেও চিত্তবাবু ও আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ডাক্তার হবার সুবাদে তাঁর বাড়ি যাবার আমার অবাধ সুযোগ ছিল। চিত্তবাবু ও আমার মধ্যে এই বোঝাপড়া হয়েছিল যে, ঘটনা এমনভাবে ঘটিয়ে যেতে হবে যাতে শেষ পর্যন্ত দেশের সাধারণ মানুষই চিৎকার করে বলতে থাকবে, আমরা

পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা চাই। এই দাবিকে এতটা জোরদার করতে হবে যাতে মুজিব তখন বিশ্বাসঘাতকতা করলেও সাধারণ মানুষের আন্দোলন বন্ধ হবে না।

আমাদের সৌভাগ্য, অমরা যেমন চেয়েছিলাম, ঘটনাও সেই রকম ঘটতে থাকল। তখন আমি ঢাকায় আর চিত্তবাবু কলকাতায়। ঢাকায় বসে মুজিবের প্রতিটি পদক্ষেপ আমি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করতাম এবং তার চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করতাম। আমি লক্ষ্য করলাম যে, মুজিব সময় মতো স্বাধীনতা ঘোষণা করে আত্মগোপন করলেন না। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, মুজিব 'স্বাধীন পূর্ববঙ্গ' ঘোষণা না করলেও শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ স্বাধীন হল, এপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে যে নির্বাচনের পূর্বে মুজিবের বিশেষ প্রতিনিধি হয়ে চিত্তবাবু কলকাতা আসেন সত্য। তবে পূর্ব সিদ্ধান্তমত আমি চিত্তবাবুর নাম প্রস্তাব করেছিলাম। আমাদের সুচিন্তিত প্রস্তাবে মুজিব সহজে অনুমোদন দেন। তিনি হয়তো একটা বাড়তি সুযোগের পথ খোলা রাখতে চেয়েছিলেন। দরকারমতো ভবিষ্যতে যা কাজে লাগানো যায়। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য ছিল সেই খোলাপথ ধরেই পূর্ববঙ্গকে স্বাধীন করা। প্রথমদিকে তার কথা ঠিক রাখলেও শেষ মুহূর্তে তার মত পালটে যায়।

ত্রৈলোক্য মহারাজের ভারত সফর এবং মৃত্যু

১৯৭০ সালের নির্বাচনের ঠিক পূর্বেই স্বনামধন্য শ্রীত্রৈলোক্য মহারাজ ভারত সফরে এলেন। কলকাতায় আসার আগের দিন তিনি আমার বাড়িতে যান। পূর্ব্ববঙ্গের স্বাধীনতার ব্যাপারে সেদিন তাঁকে আমি কিছুটা ইঙ্গিত দিলাম। তাঁকে আমি পরিষ্কার বললাম যে পূর্ব্ববঙ্গ স্বাধীন হবেই এবং তাতে হিন্দুদের কিছুই লাভ হবে না। তাঁকে আমি অনুরোধ জানালাম যে, পূর্ব্ববঙ্গের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ভারতের জনসাধারণ হিন্দুদের জন্য যাতে আলাদাভাবে কিছু করতে পারে তার প্রস্তুতি নিতে।

কিন্তু ভারতে এসে তিনি শুধু মুজিবের প্রশংসাই করেছিলেন। হিন্দুদের ভবিষ্যতের ব্যাপারে কাউকেই কিছু তিনি চিন্তা করতে বলেননি। কারণ তিনি দেখেছিলেন যে সবত্রই তখন হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই স্লোগান চলছে। অভিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতা হওয়া সত্ত্বেও হিন্দু সুলভ মানসিকতা এবং ইসলাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার জন্য তাৎক্ষণিক অবস্থা দেখে তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন। ভবিষ্যতের কথা তিনি ভাবতে পারেননি। এই দেশপ্রেমিক স্বাধীনতা সংগ্রামী ব্রিটিশ শাসিত ভারতে এবং পাকিস্তানে জেলে সুদীর্ঘ ৩০ বছর কাটিয়েছিলেন। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর পূর্ব পাকিস্তানেই থেকে যান। জন্মভূমিকে ত্যাগ করেননি। শেষ

জীবনে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে শেষবারের মতো দেখা সাক্ষাৎ করতে ভারতে আসেন এবং ভারতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আমি কলকাতার অনুশীলন অফিসে টেলিগ্রাম পাঠাই। তার আত্মার শান্তির জন্য তাঁর মৃতদেহ ঢাকায় পাঠাবার অনুরোধও জানাই। কেননা তিনি বলেছিলেন "আমি দেশ তথা জন্মভূমি ত্যাগ করব না। জন্মমাটিতেই আমি মরতে চাই।"

গণতন্ত্রের পথে পাকিস্তান

১৯৭০ সালের নির্বাচনের ঘোষণার পরেই গণমুক্তি দলের পক্ষ থেকে মুজিবকে জানানো হল যে, বৃহত্তর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই গণমুক্তি দল নির্বাচনে নিজ প্রতীক নিয়ে কোনো প্রার্থী দাঁড় করাবে না। তখন পূর্ববঙ্গে লোকসংখ্যা অনুপাতে জাতীয় পরিষদে ৩৬ জন এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৭২ জন হিন্দু সদস্য হওয়ার কথা। সেখানে আমরা মাত্র ৫ জন গণমুক্তি দলের কর্মীকে জাতীয় পরিষদে এবং অন্য ৫ জন কর্মীকে প্রাদেশিক পরিষদের আওয়ামি লিগের প্রার্থী হিসাবে নমিনেশন দিতে অনুরোধ করি। তারা আওয়ামি লিগের কর্মী হিসাবেই উক্ত দলের প্রতীক নিয়ে নির্বাচন লড়বে। বাদবাকি হিন্দু প্রার্থীদের তিনি আওয়ামি লিগের কর্মীদের মধ্য থেকেই মনোনীত করবেন।

কিন্তু মুজিব তাতে রাজি হলেন না। শেষ পর্যন্ত ৩ জনকে জাতীয় পরিষদে এবং ৩ জনকে প্রাদেশিক পরিষদে মনোনয়ন দিতেও তিনি রাজি হলেন না। কারণ তখন সমগ্র পূর্ববঙ্গে ভোটের হাওয়া আওয়ামি লিগের অনুকূলে। হাওয়া না বলে তাকে ঝড় বললেই ভালো হয়। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত গণমুক্তি দলের পক্ষে ৫ জনকে জাতীয় পরিষদে এবং [illegible] জনকে প্রাদেশিক পরিষদে নমিনেশন দেওয়া হয়। এরা সকলেই দলের মোমবাতি প্রতীকে লড়ে এবং অল্প ভোটে হেরে যায়। তখন স্বাধীনতার পূর্ণ প্রস্তুতি চলছে। সে দিকেই ছিল আমাদের দৃষ্টি। তাই নির্বাচনের পূর্বেই মুজিবকে বোঝানো হল যে, দলের চাপে বা দল ঠিক রাখতেই নির্বাচনে অংশ নিতে হয়েছিল। মনে অন্য চিন্তা থাকলেও তাকে বলেছিলাম যে দলের কর্মীরা স্বাধীন পূর্ববঙ্গ সম্বন্ধে কিছুই জানে না। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করলে তারা বিদ্রোহ করবে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ও আমাদের মধ্যে যাতে কোনো ভুল বোঝাবুঝি না হয় সেজন্য তার মতামত আমি চেয়েছিলাম। তার মনে অন্যকিছু থাকলেও তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার স্বপক্ষে তার অভিমত জানান।

মুজিব অবশ্য নির্বাচনে আওয়ামি লিগের হাওয়া বুঝতে পেরেছিলেন। তাই জাতীয় পরিষদে মাত্র ১ জন এবং প্রাদেশিক পরিষদে মাত্র ৬ জন হিন্দুকে আওয়ামি লিগের নমিনেশন দিয়েছিলেন। কেননা হিন্দুদের রাজনৈতিক ও মানসিক দুর্বলতার কথা সব মুসলমানই জানে। তারা সকলেই জয়লাভ করেছিলেন। সেদিন মুজিবের মনোভাব বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয়নি। তাঁর হিন্দু প্রীতির প্রমাণ সেদিন তিনি নিজেই দিলেন। এসব সত্ত্বেও গণমুক্তি দল যেখানে নিজস্ব প্রার্থী আছে সেই সব জায়গা বাদে অন্যান্য জায়গায় আওয়ামি লিগের হয়েই প্রচার করেছিল। কারণ মুজিবকে চটানো তখন ঠিক কাজ হত না। তাঁকে এটাই বোঝাতে চেয়েছি যে, নির্বাচনের চেয়ে স্বাধীনতার ডাকই আমাদের কাছে মুখ্য ছিল। আর হিন্দুদের বৃহত্তর স্বার্থেই মুজিবকে সমর্থন করা ছাড়া উপায় ছিল না।

নির্বাচনের পরেই যে পূর্ববঙ্গে স্বাধীনতার ঝড় বইবে সে ব্যাপারে আমরা ছিলাম সম্পূর্ণ নিশ্চিত। সেই ঝড়ের সময় যাতে ভারতের জনগণের সাহায্য পাওয়া যায় তার প্রস্তুতি নিতে এবং আরও একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে নির্বাচনের অনেক পূর্বেই মুজিবের বিশেষ প্রতিনিধি হয়ে চিত্তবাবু ভারতে চলে আসেন। এই বিশেষ কারণটা শুধু চিত্তবাবু মুজিব ও আমি জানতাম। গণমুক্তি দলই তাঁর কলকাতা আসার সমস্ত খরচ বহন করে।

চিত্তবাবু কলকাতায় চলে এলেন আর আমি তাঁর পরিপূরক হিসেবে ঢাকায় থেকে গেলাম যোগাযোগের কাজ চালিয়ে যেতে। এর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার কাজে সাহায্যকারী হিসেবে হামিদকে (বিপদ ভঞ্জন বিশ্বাস) নিয়োগ করা হয়েছিল। গণমুক্তি দল তথা হিন্দু লবির অজ্ঞাতেই তা করা হয়েছিল। বিপদবাবু ছিলেন বাটনাতলা স্কুলের একজন শিক্ষক। কিন্তু বিনা পাশপোর্টে সীমান্ত পারাপারের সুবিধার জন্য তিনি বিপদবাবু নামটাই ব্যবহার করতেন। এ কাজে তাকে অনেক ঝুঁকি নিতে হত। হিন্দু লবি বা গনমুক্তি দলের কোনো কর্মীই দলের কাজের জন্য কোনো আর্থিক সাহায্য নিত না। কিন্তু বিপদবাবুর আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না থাকায় তাঁকে গণমুক্তি দলের পক্ষ থেকে মাসোহারা দেওয়া হত। তাঁর গোপন কাজের কথা কর্মীরা জানত না। আমাদের কাজের সুবিধার জন্য দুইজন মহিলা কর্মী মঞ্জু মিত্র ও দীপালী অবৈতনিকভাবে স্বেচ্ছা সেবিকার কাজও করত। কাজের সুবিধার জন্য চিত্তবাবু কলকাতায় গিয়ে নিজেকে সত্যব্রত রায় বলে পরিচয় দেন। আমরাও প্রথম দিকে ভারতে গিয়ে নাম পাল্টে কাজ করতাম। আমি নিজেকে রতন রায় বলে পরিচয় দিতাম।

নির্বাচনের পূর্বে পূর্ববঙ্গে একটি জনপ্রিয় গল্প

১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগেই পূর্ববঙ্গে একটি গল্প চালু করে দিই এবং মানুষের মধ্যে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। গল্পটির কথা বলা প্রয়োজন কারণ বাঙালি জাতীয়তাবাদ গড়ার ব্যাপারে এটি খুবই সাহায্য করে। গল্পটির মূল বিষয় হল এই যে, যোগ্য পাত্রের সঙ্গে সুযোগ্য পাত্রীর বিয়ে না হলে সে বিয়ে টেকে না।

বিয়ে হল ভিন্ন পরিবেশে গড়ে ওঠা দুজন মানুষের মিলন, যারা সুখে দুঃখে, আপদে বিপদে পরস্পরের পাশে থাকবে। বিশ্বাসের সঙ্গে, ছেলেমেয়ে নিয়ে সারা জীবন একসঙ্গে ঘর করবে। দুজন মানানসই না হলেই সঙ্কট দেখা দেবে, যা শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদ ও ছাড়াছাড়িতে গড়াতে পারে। তাই পাত্র ও পাত্রীর মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই বিয়ে-সাদীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। সামঞ্জস্য না থাকলে বিবাহ বিচ্ছেদই হয় শেষ পরিণতি।

ভাল পাত্রী খোঁজ করতে প্রধানত A, B, C, D, E, F, G এবং H এই আটটি গুণ বা বিষয় বিচার করা হয়ে থাকে। এগুলো হল —

A – Age (বয়স)

B – Beauty (সৌন্দর্য)

C – Character (চরিত্র)

D – Dowry (যৌতুক)

E – Education (শিক্ষা)

F – Father or Family (পিতা বা পরিবার)

G – General Knowledge (বুদ্ধিসুদ্ধি বা কাণ্ডজ্ঞান)

H – Health (স্বাস্থ্য)

খুব কম মেয়ের মধ্যেই আটটি গুণ দেখা যায়। পাত্রপক্ষের পক্ষেও বিয়ের আগে এই ৮টি গুনের সবগুলো যাচাই করা সম্ভব হয় না। আপতদৃষ্টিতে যেই সব গুণ দেখা যায় তার ভিত্তিতেই সাধারণত বিয়ে সাদী হয়ে যায়। হয়তো শুধু রূপ দেখেই কোনো প্রাত্রীকে পছন্দ করা হল। কিন্তু বিয়ের পরে দেখা গেল তার চরিত্র খুবই খারাপ। দেখা গেল মেয়েটি দুশ্চরিত্রা, অথবা পাগল বা কোনো মানসিক রোগে আক্রান্ত। অথবা দেখা গেল দুরারোগ্য কোনোরোগে আক্রান্ত। সেই অবস্থায় বিবাহ-বিচ্ছেদই হয় চরম পরিণতি।

বিয়ে যেমন কতকগুলি গুণাগুণের উপর নির্ভরশীল, সেই রকম একটি দেশ গড়া বা টিকে থাকাও কতকগুলি গুণের উপর নির্ভরশীল, এই গুণগুলো হল —

(১) Natural Boundary বা প্রাকৃতিক সীমা। অর্থাৎ নদীনালা, পাহাড় পর্বত, সমুদ্র বা মরুভূমি ইত্যাদির দ্বারা ভৌগোলিক ভাবে সীমাবদ্ধ একটি ভূখন্ড।

(২) Continuity of Land বা ভূখন্ডের ভৌগোলিক অবিচ্ছিন্নতা। অর্থাৎ সেই ভূখন্ডের এক অংশ থেকে আরেক অংশে যেতে গেলে যেন অন্য কোনো সার্বভৌম দেশের জমি অতিক্রম করতে না হয়।

(৩) Easy Communication বা সহজ যোগাযোগ। অর্থাৎ দেশের এক অংশ থেকে আরেক অংশের মধ্যে যাতায়াত বা সংবাদ আদান প্রদান যেন সহজ হয়।

(৪) Same Value of Currency বা দেশের সমস্ত অঞ্চলে মুদ্রার সমান ক্রয়ক্ষমতা।

(৫) Same Historical Background বা একই ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও ধারাবাহিকতা।

(৬) Same Cultural Background বা একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।

(৭) Same Language বা দেশের সর্বত্র একই ভাষা।

(৮) Same Racial Background বা একই জাতিগত ঐতিহ্য।

(৯) Same Religion একই ধর্ম।

উপরিউক্ত বিচার অনুসারে দেখা যাচ্ছে যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সামঞ্জস্যকারী কোনো গুণই নেই। সেই সময় ঢাকায় ১ ভরি সোনার দাম ছিল ১২৫ টাকা, কিন্তু করাচিতে তার দাম ছিল ১০০ টাকা। এক মাত্র ধর্মের ব্যাপারে কিছুটা সামঞ্জস্য আছে। তবে তাও আংশিক মাত্র শিয়া সুন্নির বিভেদ তো আছেই। উপরন্তু আছে বিরাট সংখ্যক হিন্দু উপস্থিতি। কাজেই একটা দেশের অখন্ডতা বজায় রাখার জন্য যে সব গুণ বা উপাদানগুলো থাকা দরকার পাকিস্তান রাষ্ট্রে তা নেই। কাজেই এর থেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, পাকিস্তান ভাগ হবেই এবং পূর্ববঙ্গ স্বাধীন হবেই।

প্রথম দিকে এই গল্পটি গোপনে চলতে থাকে। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দেশের ঘরে ঘরে পৌঁছে যায় এবং সাধারণ মানুষ এর মধ্যে পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতার

যুক্তি খুঁজে পায়। এই যুক্তি অতি সাধারণ মুসলমানও বুঝে যায়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় যে প্রবল বন্যার কারণে ৫ই অক্টোবরের বদলে ৭ই ডিসেম্বর '৭০, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

এই ভাবে গণসমর্থন পেয়ে আওয়ামী লিগের প্রতীক নৌকা তখন দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছে। এদিকে হিন্দুরা সর্বশক্তি দিয়ে ব্যাপক প্রচেষ্টায় তার অনুকূলে তুলেছে প্রবল জোয়ার। সেই সঙ্গে উপরিউক্ত গল্পটি ঝড়ো হাওয়ার মতো লেগেছে নৌকার পালে। যার ফলে নৌকাও ছুটতে শুরু করেছে উল্কার বেগে।

নির্বাচনের আগেই ছাত্ররা যৌবনসুলভ মনোবল ও সাহসের সঙ্গে পূর্ববাংলার নাম বাংলাদেশ রাখে এবং স্বাধানতা সংগ্রামের শপথ নেয়। স্বাধীন বাংলাদেশের একটি জাতীয় পতাকাও তারা রচনা করে এবং প্রকাশ্যে উড্ডীন করে। পরে পতাকাটির সামান্য পরিবর্তন করা হয়। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এসব করেছে। সব কিছুই যে মুজিবের পরামর্শ বা অনুমোদন নিয়ে করা হয়েছে তা বলা চলে না। তবে অমত থাকলেও মুজিব বাধা দিতে সাহস পাননি। বাংলাদেশের মানুষ তখন স্বাধীনতার ব্যাপারে মানসিক দিক থেকে এতটাই এগিয়ে গিয়েছিল যে মুজিব বাধা দিলেও তা কার্যকর হত না।

সমস্ত পূর্ববাংলা জুড়ে তখন নবজাগরণের যে জোয়ার উঠল তা অভূতপূর্ব। ইসলামি তথা পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের বদলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ঝড় বয়ে যেতে থাকল। চারিদিকে স্লোগান উঠল —

"তোমার দেশ আমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ"
"তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা"
"হিন্দু মুসলিম আর নাই, বাঙালি সব ভাই ভাই। জয় বাংলা"

এই সব স্লোগান দিতে দিতে হিন্দু মুসলমানে মিলিত মিছিলে সমস্ত পূর্ববাংলা উত্তাল হয়ে উঠল। পূর্ববাংলার মানুষ প্রমাণ করল, হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই-ই বটে। বিগত হাজার হাজার বছর ধরে একই রক্ত বয়ে চলেছে তাদের ধমনীতে।

ছাত্রদের কাছ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের ডাক আসার পরেই তা দ্রুত গোপনে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, হাটে গঞ্জে, নগরে বন্দরে।

ইসলাম পন্থীদের ক্ষীণকণ্ঠের স্লোগানও সেদিন শুনেছি। তাতে ছিল দুর্বলতা ও ভয়ের আভাস।

"জয় বাংলা, জয় হিন্দ; লুঙ্গি ছেড়ে ধুতি পিন্দ।"
"জেহাদে পাইছি পাকিস্তান, জয়বাংলা খুঁড়বে কবরস্থান।"

এই পরিবেশ দেখে আনন্দ পেয়েছি। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছি। সান্ত্বনা পেয়ে ভেবেছি, "আমাদের সাধনা সফল হতে চলেছে।" হিন্দুদের মনোবল সেদিন শতগুণ বেড়ে গিয়েছিল। নির্বাচনে খুব কম সংখ্যক হিন্দুকে আওয়ামি লিগের নমিনেশন দিয়ে মুজিব যে সাম্প্রদায়িকতার স্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন, হিন্দুরা সেদিন তা মনে রাখেননি। বৃহত্তর স্বার্থের দিকে তাকিয়ে নির্বাচনে আওয়ামি লিগকে জেতাবার জন্য তারা কোমর বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অর্থ, শ্রম, বুদ্ধি ও কর্মীসহ এগিয়ে এল। নৌকা প্রতীকে একচেটিয়া ভোট দিল।

নির্বাচনে মুসলিম লিগ এবং পাকিস্তানপন্থী অন্যান্য দলগুলি পূর্ববাংলা থেকে ধুয়ে মুছে গেল। জাতীয় পরিষদে ১৬২ আসনের মধ্যে আওয়ামি লিগ পেল ১৬০টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৩০৯টির মধ্যে পেল ৩০৫টি আসন। যে ৭ জন হিন্দুকে আওয়ামি লিগ মনোনয়ন দিয়েছিল, তাঁরা সকলেই নির্বাচিত হলেন। একজন নির্দল হিন্দু প্রার্থী জয়ী হয়েছিলেন। মুজিবের ৬ দফা দাবির বিরোধিতা করার জন্যই যে ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির ভরাডুবি হয়েছিল তা বুঝতে কারো বাকি থাকল না। নির্বাচনের আগে এইসব দলগুলিকেও আমরা ভবিষ্যতের স্বাধীন পূর্ববাংলার কথা বলেছি। কিন্তু তাদের পক্ষে তখন স্বাধীন পূর্ববাংলার কথা চিন্তা করাও সম্ভব হয়নি।

তখন তারা বলত, ভারতের সাহায্য ছাড়া পূর্ববাংলা কোনো দিনও স্বাধীন হতে পারবে না। আর ভারতের সাহায্যে স্বাধীন হলে তা হবে ভারতেরই একটি তাবেদার রাষ্ট্র। তাই সেই স্বাধীনতা পেয়ে পূর্ববাংলার মানুষের কোনো লাভ হবে না। যে সব কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে এসব ব্যাপারে আলোচনা করেছি তাঁরা সবাই হিন্দু ছিলেন। মুসলমান কমিউনিস্টদের আমরা কখনোই বিশ্বাস করতাম না। তাই তাদের সঙ্গে কোনোদিন কোন আলোচনাও হয়নি। আমাদের বিশ্বাস ছিল যে, হিন্দুরা মনে প্রাণে কমিউনিস্ট তত্ত্বকে গ্রহণ করার ফলেই হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে কমিউনিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু মুসলমান কমিউনিস্টদের দেখলেই বোঝা যেত যে, তারা ইসলামকে ঠিক রেখে, শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে কমিউনিস্ট হবার অভিনয় করেছে মাত্র।

সাধারণ নির্বাচনের পরে অনেক দিন কেটে গেল, কিন্তু ইয়াহিয়া খাঁ পাকিস্তান গণ পরিষদের কোনো সভা ডাকলেন না। কারণ, সভা ডাকলেই বিপুল

সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য মুজিব পরিষদের নেতা নির্বাচিত হবেন। আর সেই সুবাদে তাঁকে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীরূপে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকবে না। জনমতের চাপে শেষ পর্যন্ত ইয়াহিয়া ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ গণ পরিষদের সভা ডাকলেন। স্থির হল ঢাকাতেই সেই অধিবেশন হবে। ইতিমধ্যে ইয়াহিয়া মুজিবকে জানিয়ে দিলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টোর সঙ্গে তাঁকে বোঝাপড়া করে নিতে হবে। এই বোঝাপড়ার উদ্দেশ্য ছিল যে, মুজিব যেন প্রধানমন্ত্রি হবার জন্য ভুট্টোর সম্মতি আদায় করতে ভুট্টোকে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী হিসেবে মেনে নেন। কিন্তু সে বোঝাপড়া আর হল না। এদিকে মুজিবের আওয়ামি লিগ দল সংসদে সংখ্যা গরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও ভুট্টোর বিরোধিতার জন্য ইয়াহিয়া মুজিবকে প্রধানমন্ত্রিরূপে স্বীকার করতে রাজি হলেন না। ফলে ২৮শে ফেব্রুয়ারি ইয়াহিয়া খাঁ ৩রা মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশনকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবি ঘোষণা করলেন।

নির্বাচনের পরেই মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সেই সময় দেখা করতে চাইলে তিনি ব্যস্ততার অজুহাতে আমাকে এড়িয়ে যেতে থাকেন। অনেক চেষ্টার পরও তাঁর সঙ্গে একান্তে আলোচনার সুযোগ পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ল। আগেই উল্লেখ করেছি চিত্তবাবু সেই সময় স্বাধীনতার বিশেষ কাজে কলকাতায় এসেছিলেন। তাই মুজিবের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার গুরুদায়িত্ব আমার ওপরেই ন্যস্ত ছিল। সেই কারণেই তাঁর সঙ্গে একান্তে আলোচনার চেষ্টা করি।

কিন্তু মুজিবের আচরণ থেকে আমার মনে সন্দেহ হয় যে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়াকেই তিনি বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। মনে প্রশ্ন জাগল মুজিব কি তবে স্বাধীন পূর্ববাংলার কথা বাদ দিয়ে পাকিস্তানকে অটুট রেখে তার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা চিন্তা করতে শুরু করেছেন? এটাও চিন্তা করলাম প্রথমে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে শক্তি সঞ্চয় করার পর কি তিনি পূর্ববাংলাকে স্বাধীন করার কথা ভাবছেন? এ চিন্তাও মাথায় এলো যে ভাবী ক্ষমতার জন্য তিনি এত লালায়িত হয়ে পড়েছেন, এক বার সেই ক্ষমতা হাতে পেলে তা কি তিনি ত্যাগ করতে পারবেন? মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ঝড় কি বইতে থাকবে? পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলে তাঁর হাতে এমন কি বিশেষ শক্তি আসবে যার দ্বারা পূর্ববাংলাকে স্বাধীন করার কাজ সহজতর হবে?

এভাবে বিভিন্ন দিক থেকে চিন্তা করে মুজিবের ভাবান্তরকে ব্যাখ্যা করতে

পারিনি। অঙ্ক মেলাতে পারিনি। সব ভাবনার একই জবাব পেয়েছি। তা হল মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের আবেগ মুখ থুবড়ে পড়বে। ঝড় আচমকা থেমে যাবে।

যদি এমন হয় যে, মুজিব প্রধানমন্ত্রী হলেন। কিন্তু ২/৩ মাস পরে তাঁকে বরখাস্ত করে ইয়াহিয়া আবার সামরিক আইন জারি করল। সেই অবস্থায় মুজিবের পক্ষে কি আবার বাঙালি জাতীয়তাবাদের ডাক দিয়ে ঝড় তোলা সম্ভব হবে? মুজিবের ক্ষমতালোভী চরিত্র জনসাধারণের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়লে তাঁর ডাকে আবার দেশের লোক আগের মতোই সাড়া দেবে সে সম্ভাবনা খুবই কম।

ইতিহাস একই সাক্ষ্য দেয়। সামরিক আইন জারির প্রথম দিকে বাঙালিরা অতীতে একবারও রুখে দাঁড়াবার সাহস দেখাতে পারেননি। আমরা দেখেছি, ১৯৫৪ সালে বাংলার গণতান্ত্রিক ফজলুল হক সরকারকে ফেলে দিয়ে ৯২ (ক) ধারা অনুসারে যখন রাজ্যপালের শাসন জারি করা হল, বাঙালি তখন কোনও প্রতিবাদ করেনি। গণতান্ত্রিক সরকারকে ফেলে দিয়ে '৫৮ সালে আয়ুব খাঁ যখন সামরিক আইন জারি করলেন, সেদিনও বাঙালি কোনো প্রতিবাদ করেনি। তারপর আধা গণতান্ত্রিক সরকারকে ফেলে দিয়ে ইয়াহিয়া খাঁ যখন সামরিক আইন জারি করলেন, সেদিনও দেখেছি বাঙালির কোনো প্রতিবাদ নেই, প্রতিরোধ নেই। কাজেই মুজিবের বেলাতেও যে একই ঘটনা ঘটবে না তার যুক্তি কোথায়?

কাজেই সব দিক চিন্তা করে এই সিদ্ধান্তই নিতে হল যে, মুজিব বর্তমানে স্বাধীন পূর্ববাংলার কথা ভুলে গিয়ে গোটা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার স্বপ্নে বিভোর হয়েছেন। এক সময় পাকিস্তানের গোয়েন্দা বাহিনীর হাতে চরমভাবে লাঞ্ছিত হবার পর রাগের মাথায় তিনি পূর্ববাংলার স্বাধীনতার কথা ভেবেছিলেন বটে। তা ছিল নিতান্তই সাময়িক উচ্ছ্বাস। নির্বাচনে সাফল্যের ফলে তাঁর সেই চিন্তায় আজ ভাটা পড়েছে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার স্বপ্ন সেদিন তাঁর সামনে ছিল না। কিন্তু আজ সেই সুযোগ তাঁর চিন্তা ভাবনায় এনেছে ব্যাপক পরিবর্তন।

যাই হোক, এককালে পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে হক সাহেবকে তাড়িয়ে দেবার পরও বাঙালি রুখে দাঁড়ায়নি তা ঠিক। কিন্তু ৩রা মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতুবির ঘোষণা ঢাকায় ভূমিকম্পের সৃষ্টি করল এবং অচিরেই সেই ভূকম্পন আরও প্রবল আকারে গোটা পূর্ববাংলায় ছড়িয়ে পড়ল। মুজিব স্বাধীন পূর্ববাংলার ডাক না দিলেও পূর্ব প্রস্তুতি মতো জনগণের মধ্যে থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই ডাক উঠল এবং মুহূর্তের মধ্যে তা সমস্ত গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ল। জনতার

পক্ষ থেকে দাবী উঠল — "স্বাধীন বাংলাদেশ চাই — মুজিব তুমি স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণা করো।" সেদিন বুঝতে কোন অসুবিধা হয়নি যে, অটুট পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য মুজিব যতখানি পাগল, সাধারণ মানুষ সেই পাকিস্তান ভেঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশ গড়তে তার থেকে অনেক বেশি পাগল। গ্রামে গঞ্জে শহরে নগরে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সভা-সমিতি মিছিল করে স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার শপথ নিল। ঢাকাসহ সমস্ত দেশ জুড়ে স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার ঝড় বইতে লাগল। এদিকে চিত্তবাবু ভারতে বসে স্বাধীনতার সব প্রস্তুতি নিতে থাকলেন। তার অগ্রগতির কথাও মুজিবকে জানানো হত।

দেশের সর্বত্র সেনাবাহিনীর সঙ্গে গ্রামগঞ্জের লোকও সরাসরি সংঘর্ষে নামে। ফলে কিছু সংখ্যক মানুষকে প্রাণ দিতে হয়। তাতেও জনগণ থামে না। সেই অবস্থা বুঝতে পেরেই ১লা মার্চ মুজিব রমনা মাঠে ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক জনমহাসভার ডাক দিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন উক্ত দিনেই তিনি ভাবী কর্মপন্থা ঘোষণা করবেন। আর ৭ই মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া খানের ঘোষণার প্রতিবাদ জানাতে সরকারের সঙ্গে সব রকমের অসহযোগিতা চালাতে জনগণকে ডাক দিলেন।

জনগণও তার ডাকে সাড়া দিয়ে সবরকমের সরকারি কাজে বাধা সৃষ্টি করতে থাকল আর রমনা মাঠের জনসভার প্রস্তুতিও সর্বত্র চলতে থাকল। এই ৭. দিন ঢাকায় কোনো সরকারই ছিল না বললে ভুল হবে না। তাতে কয়েক শত মানুষের সরাসরি সংঘর্ষে সেনার হাতে প্রাণ দিতে হয়।

মুজিব আশা করেছিলেন সরকার তার ঘোষণার প্রতিক্রিয়া জানাবে কিন্তু বাইরে সরকার কোনো প্রতিক্রিয়া জানাল না। তবে পর্দার আড়ালে শুরু হল সমঝোতার আলোচনা। সে আলোচনার কথা আমরা পরেই জানতে পারব।

৭ই মার্চের ঐতিহাসিক জনসভা

দেখতে দেখতে এসে গেল ঐতিহাসিক সেই ৭ই মার্চ। সেদিন রমনা মাঠের জনসভায় স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণা শুনতে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রমনা মাঠে জড়ো হয়েছিল লক্ষ লক্ষ মানুষের উত্তাল এক জনস্রোত। সভাস্থল ও রমনা মাঠের চতুর্দিকে উড়ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের শত শত পতাকা। জনতার মধ্যে থেকে কিছুক্ষণ পর পরই স্লোগান উঠছিল "মুজিব তুমি স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণা করো। জয় বাংলা। জয় স্বাধীন বাংলাদেশ।"

সেদিনর সেই বিশাল জনসভায় মুজিব নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় আধ ঘন্টা পরে

সভায় উপস্থিত হলেন। সেদিন তাঁর এই আধঘন্টার দেরি ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যতদূর অনুমান করা যায়, এর পিছনে ৩টি কারণ ছিল। প্রথম ইয়াহিয়ার আশঙ্কা ছিল যে, হয়তো একগুঁয়ে মুজিব ওদিন জনসভায় স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণা করবেন। তা থেকে নিবৃত্ত করতে তিনি আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ফারন্যাণ্ডকে ওদিন সকালে গোপনে দেখা করতে পাঠান। মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী করার ইয়াহিয়ার দেওয়া আশ্বাসের বার্তা নিয়েই ফারন্যাণ্ড আসেন ও মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রধানমন্ত্রী করার নিশ্চয়তা তিনিই মুজিবকে দেন। তার সঙ্গে তিনি হুঁশিয়ারিও দেন যে, সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে যদি মুজিব স্বাধীন বাংলাদেশ ওদিন ঘোষণা করেন তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। তাতে ভয়ে বা প্রধানমন্ত্রীত্বের লোভে বা যে কোনো কারণে তিনি ফারন্যাণ্ডকে প্রতিশ্রুতি দেন যে ওদিনের জনসভায় তিনি স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণা করবেন না। এই প্রতিশ্রুতির কথা ফারন্যাণ্ড তখনই ইয়াহিয়াকে জানিয়ে দেন। ইয়াহিয়া তা জেনে সঙ্গে সঙ্গে মুজিবকে ফোন করে ধন্যবাদ জানান ও তার দেওয়া আশ্বাসের নিশ্চয়তা আবার জানান। ইয়াহিয়ার এই ফোনটি সভায় যাওয়ার কিছু আগেই মুজিব পান।

দ্বিতীয়ত সভার পরিবেশের সমস্ত খবরাখবরই মুজিব বাড়িতে বসে পাচ্ছিলেন। বাড়িতে বসেই তিনি খবর পান যে, সেখানে স্বাধীনতা ঘোষণার পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে তৈরি। সেদিন স্বাধীনতা ঘোষণা না করলে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া অবস্যম্ভাবী সেটা বুঝতে তাঁর বাকি থাকল না। কাজেই পরিস্থিতি তাঁকে ভীষণ এক চাপের মুখে ঠেলে দিল। তৃতীয় কারণটি হল, তিনি বিশেষ একটি খবরের অপেক্ষায় ছিলেন এবং খবরটি পেতে দেরি হচ্ছিল। খবরটি তার কাছে ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। সভায় যাত্রা করার নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পরে সেই খবরটিও তিনি পেয়ে যান। এই বিশেষ খবরটি কি, তা আমার জানা থাকলেও এখন তা বলা সম্ভব নয়। এই বিশেষ কারণটি ছিল বাস্তব, অন্যগুলি অনুমান।

যাই হোক এই তিনটি কারণেই সেদিন সভায় উপস্থিত হতে তাঁর দেরি হয়েছিল। সভায় বক্তব্য বিষয় কি হবে তাই নিয়ে তাঁকে গভীরভাবে ভাবতে হয়েছিল। চরম সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। তারই ফল হল, আধ ঘন্টা দেরি।

এখানে আরও একটি কথা বলে নেওয়া উচিত হবে। সাধারণ নির্বাচনের ফল প্রকাশের আগে পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতিতে ছাত্র-জনতার ভূমিকাই ছিল মুখ্য এবং আওয়ামি লিগ দলের ভূমিকা ছিল গৌণ। সেই সূত্র ধরে উপরিউক্ত ৭ই মার্চের জনসভাতেও ছাত্র-জনতাই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

যাই হোক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা, না অটুট পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রিত্ব, কোনটা তিনি গ্রহণ করবেন, সেই সিদ্ধান্ত নিতে মুজিব যে তখন অতিশয় চাপের মধ্যে ছিলেন তা আগেই বলা হয়েছে। তবে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্বের দিকেই যে পাল্লা ভারী ছিল মুজিবের কিছু কিছু আচরণ থেকে তা স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল। ৭ই মার্চ দুপুরে ঢাকার বিভিন্ন সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের সঙ্গে কথাবার্তার সময় মুজিব বলেন যে, সভায় স্বাধীনতার বক্তব্য তিনি রাখবেন না। তবে ইয়াহিয়া খাঁ, ভুট্টো ও সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে তিনি অবশ্যই অত্যন্ত গরম বক্তব্য রাখবেন।

কিন্তু সভার পরিস্থিতি ছিল এই সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ প্রতিকূলে। উত্তাল জনতা মুহুর্মুহ স্বাধীন বাংলাদেশের ধ্বনি দিয়ে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলছে। উড়ছে হাজার হাজার স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। স্বাধীনতাকামী লক্ষ লক্ষ বাঙালি চিৎকার করে বলছে "মুজিব তুমি স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণা করো।"

সেই জনজাগরণের ঢেউ মুজিবকে নাড়া দিয়েছিল। স্বভাবসুলভ আবেগের সঙ্গে তিনি বক্তব্য শুরু করলেন। ঘরের মা বোনদের তিনি খুন্তি বঁটি নিয়ে পাক সেনাদের বিরুদ্ধে লড়তে বললেন। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার ডাক তিনি দিলেন, আরও উত্তেজিত ভাষায় বললেন—এ সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, ইনসাল্লা। তারপর তিনি ৪টি দফা সেই উত্তাল জনগণের সামনে তুলে ধরে অত্যন্ত সুচতুর ভাবে আবেগের ভাষায় তাদের বুঝতে চেষ্টা করলেন যে স্বাধীনতার জন্যই তার এ সংগ্রাম। কিন্তু স্বাধীনতা তিনি ঘোষণা করলেন না।

সেই দফা হল — (১) সামরিক শাসন তুলে নিতে হবে। (২) নির্বাচিত গণপ্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। (৩) সামরিক বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরে যেতে হবে। (৪) বাঙালি হত্যার খুনী সামরিক বাহিনীর লোকদের খুঁজে বের করতে হবে এবং শাস্তি দিতে বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করতে হবে।

সভার কয়েকদিন আগে নাকি ছাত্রনেতা সিরাজুল আলম খানকে তিনি বলেছিলেন, ও দিন সভা থেকে বেড়িয়ে এসে স্বাধীনতা ঘোষণা করেই ওখান থেকে তিনি আত্মগোপনে যাবেন।

কিন্তু দেখা গেল—তিনি সভার মধ্যে বা সভার পরে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন না। আর আত্মগোপনেও গেলেন না। কারণ ওদিন সকালেই তার মত সম্পূর্ণভাবে পাল্টে যায়।

সভায় ঐ সব গরম গরম বক্তব্য রাখার পরেও ইয়াহিয়ার সামরিক সরকার তাকে গ্রেপ্তার করল না। সামরিক সরকার তো দূরের কথা, তাঁর সেদিনের বক্তব্য

কোনো গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষেও বরদাস্ত করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু পাক সামরিক সরকার তাঁর কেশাগ্রও স্পর্শ করল না। হয়তো সভায় যাওয়ার আগের সংক্ষিপ্ত বোঝাপড়াই এর কারণ। এই সন্দেহের কারণ হল, এর ঠিক পরেই শুরু হল ইয়াহিয়া খাঁ ও পরে ভুট্টোর সঙ্গে তাঁর সুদীর্ঘ আলোচনা। হয়তো সেই সংক্ষিপ্ত বোঝাপড়াকে বাস্তবে রূপ দিতেই শুরু হয়েছিল সেই আলোচনা।

সেই সুদীর্ঘ আলোচনা আরম্ভ ১৫ই মার্চ, শেষ ২৪শে মার্চের রাত্রে। তাই এখানে প্রসঙ্গিক হিসেবে দু একটি কথা বলে নেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে। রাজনৈতিক ক্ষমতা কাকে বলে বা তার মোহ মানুষকে কিভাবে পাগল করে সে ব্যাপারে কোনো সম্যক উপলব্ধি সাধারণ মানুষের নেই। রাজনৈতিক ক্ষমতার মূল শক্তি কোথায় নিহিত রয়েছে এবং কি ভাবে তা কাজ করে অথবা তার গতি-প্রকৃতিই বা কি, ইত্যাদি বিষয়গুলোর ব্যাপারেও সাধারণ মানুষের কোনো সম্যক জ্ঞান নেই। সব শেষে, কিভাবে সেই রাজনৈতিক ক্ষমতা টিকে থাকে আর কি কারণে তা অন্যের হাতে চলে যায়, সে ব্যাপারেও সাধারণ মানুষের কোনো সম্যক ধারণা থাকা সম্ভব নয়। কারণ পর্দার আড়ালের রাজনীতির সঙ্গে তাদের কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। কিভাবে রাজক্ষমতা টিকে থাকে বা হস্তান্তরিত হয় তা পর্দার আড়ালে বসে যারা সব জানতে পারে তারা সুযোগ পেলেই দুর্জয় সাহস নিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করে থাকে।

যাই হোক, নির্বাচনে অপ্রত্যাশিত বেশি ভোট পেয়ে ক্ষমতার লোভে অন্ধ মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার চেষ্টা করলেন। শুধু চেষ্টা করলেন না, বলতে হয় ক্ষমতার পাগল হয়ে প্রধানমন্ত্রীত্বের ও পাকিস্তানকে অটুট রাখার সিদ্ধান্তে অটল হলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হওয়া তাঁর কপালে জুটল না, কারণ ক্ষমতার শক্তিকেন্দ্র তাঁর পক্ষে ছিল না। গণতান্ত্রিক নিয়ম অনুসারে মুজিবের প্রধানমন্ত্রীর পদ প্রাপ্য ছিল। কিন্তু যার হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল তিনি মুজিবকে প্রথমে তাঁর ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করলেন। তবুও ক্ষমতা হাতে পাবার মোহ মুজিবকে তাঁদের সঙ্গে বোঝাপড়ার পথে চালিত করেছিল।

তখন ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে বসেছিলেন সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খাঁ। তাই তাঁর সম্মতি ছাড়া মুজিবের পক্ষে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়া সম্ভব ছিল না। পক্ষান্তরে, তাঁর সাথে সংঘাতে গিয়েও মুজিবের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী হওয়া সম্ভব ছিল না। এসব ব্যাপার মুজিবের খুব ভালোই জানা ছিল। তাই যে রাস্তা খালি ছিল তা হল অনুনয় বিনয় আর অনুরোধ উপরোধ। কিন্তু সেই অনুনয় বিনয়ের প্রচেষ্টাও

ব্যর্থ প্রমাণিত হল।

মুজিবের সামনে তখন দুটো রাস্তা খোলা ছিল। প্রথমত, পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শক্তির কাছে বশ্যতা স্বীকার করে তাদের ইচ্ছামতো নিজের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করা। এর অর্থ হল পাকিস্তানকে অখণ্ড রেখে ইসলামি সংস্কৃতিকে অক্ষুন্ন রাখা। দ্বিতীয়ত, পূর্ববাংলা তথা বাংলা তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন করার পর তার প্রধান শাসক হয়ে বসা। কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, দ্বিতীয় রাস্তায় রয়েছে প্রচণ্ড ঝুঁকি। শক্তিশালী পাক সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সশস্ত্র যুদ্ধ চালিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করা মুখের কথা নয়। আবেগে অনেক কথা বলা হয়, বক্তৃতা করা যায়, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা রূপায়িত করতে গেলে শুধু আবেগে কাজ হবে না। তবে বাইরের লোকে না জানলেও মুজিব ও আমরা দুজন লোক জানতাম স্বাধীন হওয়ার ক্ষমতা তার হাতেও ছিল। কিন্তু তা ছিল বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল।

সব থেকে বড় কথা হল, স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণা করবেন তিনি কোন শক্তির উপর দাঁড়িয়ে? এটা তিনি খুব ভালো করে জানেন যে, পাক সেনাবাহিনীতে যে কয়জন বাঙালি সেনা আছে তা গোনা যায়। আর পদমর্যাদার দিকেও তারা অনেক নিচে। উপরন্তু তারা সবাই যে তাঁকে সমর্থন করবে এবং তাঁর পিছনে দাঁড়াবে তারই বা নিশ্চয়তা কি? সব থেকে বড় কথা হল, স্বাধীনতা ঘোষণা করে স্বাধীন বাংলা গড়তে না পারলে মৃত্যু অবধারিত। দেশের বাইরে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করতে পারলেও দেশে ফেরার পথ চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর তাঁর আত্মবিশ্বাস, মানসিকতা ও সাহসের প্রশ্ন। তা ছাড়া লোকক্ষয় ও রক্তপাতের প্রশ্ন তো আছেই।

এবার অন্য শিবিরে কি চলছে সে দিকে একটু দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। পরিস্থিতির চাপে ইয়াহিয়া খাঁ ও ভুট্টো শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারলেন যে, পূর্ববঙ্গে মুজিবের যে জনপ্রিয়তা তাতে তাঁকে প্রধানমন্ত্রী না করলে অবশ্যই পাকিস্তান ভাগ হবে, বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। তাই তাঁরা সাময়িক ভাবে মুজিবকে প্রধানমন্ত্রিত্বের আশ্বাস দিলেন। আর মুজিবও সুযোগ বুঝে আলাপ আলোচনার পথ বেছে নিলেন। এবং এই সিদ্ধান্তকে সামনে রেখেই তিনি ৭ই মার্চের জনসভায় ভাষণ দিলেন। তাই সভার মধ্যে বা পরে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন না আর আত্মগোপনেও গেলেন না।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার চাইতেও নিজের ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষাই সেদিন তাঁর কাছে বড় হয়েছিল। গোটা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর গদিটাই সেদিন তাঁর কাছে সর্বাপেক্ষা লোভনীয় হয়েছিল। সেজন্যই আলোচনা শুরু হল।

স্বাধীন বাংলাদেশ যে সেই আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল না তা বলাই বাহুল্য। এটাও বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, সে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল, কি করে স্বাধীন বাংলাদেশের আন্দোলনকে হত্যা করা যায়। কি করে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে হত্যা করে পাকিস্তানকে অখণ্ড রাখা যায়। বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কবর দিয়ে ইসলামি জাতীয়তাবাদ ও ইসলামি সংস্কৃতিকে বাঁচানো যায়।

কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এত দিন মুজিব ৬ দফা দাবি করে ও স্বাধীন বাংলাদেশের বিরোধিতা না করে যে জনসমর্থন ও জাগরণ গড়ে তুলেছিলেন তার এক মাত্র উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়া। প্রধানমন্ত্রী হয়ে ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করা। স্বাধীন বাংলাদেশ গড়া নয়। তার মাথায় পূর্বের চিন্তা স্বাধীনতা থাকলেও নির্বাচনের পরে পাকিস্তানকে অটুট রেখে তিনি তার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন নতুন করে দেখতে শুরু করেছিলেন।

তিনি খুব ভালো করেই বুঝেছিলেন যে, বর্তমান আওয়ামি লিগের কোনো নেতাই তাঁর মতো নিজে হাতে পাকিস্তান গড়েনি বা পাকিস্তান গড়ার জন্য জেহাদে অংশগ্রহণ করেনি। তাই পাকিস্তনের প্রতি যে প্রাণের টান তাঁর মধ্যে আছে, তাদের মধ্যে তা থাকতে পারে না। তাই তাদের পক্ষে পাকিস্তান তথা ইসলামি জাতীয়তাবাদকে পরিত্যাগ করে বাঙালি জাতীয়তাবাদে গা ভাসিয়ে দেওয়া খুবই সহজ। তাই অখণ্ড পাকিস্তানের অস্তিত্ব মূল্যবান নয় তাদের কাছে। কিন্তু মুজিব তা করতে পারেন না। পাকিস্তান সৃষ্টির এক নেতা মুস্তাক আহম্মদের সঙ্গে তিনি লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান বলে আন্দোলন করেছেন। পাকিস্তান আদায় করেছেন। সেই সব স্মৃতি আজও তাঁর মনে দৃঢ়মূল ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। তাকে কিভাবে তিনি পরিত্যাগ করবেন।

অপর দিকে এতদিন ধরে বাঙালি জাতীয়তাবাদী যে বাঘটিকে মুজিব লালন পালন করে আসছেন সে আজ ক্ষুধায় হিংস্র হয়ে উঠেছে। সে পূর্ব পাকিস্তানকে খেতে চায়—সাথে পশ্চিম পাকিস্তানকেও। তাতে বাধা পড়লে তার ক্ষুধা মিটাতে মুজিবকেও খেয়ে ফেলবে। কিভাবে সেই হিংস্র বাঘের তিনি মোকাবিলা করবেন? সব থেকে বড় কথা হল, স্বাধীন বাংলাদেশের কথা না বললে বাঙালিরা তাকেই সবার আগে আক্রমণ করবে ও হত্যা করবে।

প্রথম দিকে, পাকিস্তান ভেঙ্গে যাবার ভয়েই ভুট্টো ও ইয়াহিয়া খাঁ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী করতে রাজি হননি। মুজিবও তা বুঝতে পেরে অখণ্ড পাকিস্তান ও ইসলামি

উম্মার ঐক্যের কথা তাঁদের বার বার বলে এসেছেন। কিন্তু বাঙালি বলেই মুজিবকে তারা বিশ্বাস করতে পারেননি। মুজিব কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা থেকে বিরত হননি। তিনি তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, সেই পাকিস্তানকে তিনি নিজ হাতে গড়ে তুলেছেন, যেই পাকিস্তান গড়ে তুলতে তিনি হিন্দুর বিরুদ্ধে রক্তাক্ত জেহাদে অংশগ্রহণ করেছেন, সেই পাকিস্তানকে তিনি নিজের হাতে ভাঙতে পারেননা। কিন্তু তাঁর সকল প্রচেষ্টাই অরণ্যে রোদন হয়েছে। ভুট্টো ও ইয়াহিয়ার মন তিনি ভেজাতে পারেননি।

মুজিবের আত্মগোপনের আলোচনা

অবস্থা দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে চিত্তবাবুর কাছ থেকে নির্দেশ এল এবং আমি মুজিবের সঙ্গে আলোচনায় বসলাম। স্বাভাবিক ভাবেই, আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের কি করা উচিত। তাঁর কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে পরিষ্কার বোঝা গেল যে, বাংলাদেশকে স্বাধীন করার চেয়ে অখণ্ড পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়াকেই তিনি বেশি গুরুত্ব দিলেন। এই সময় আমি তাঁর আত্মগোপনের কথা তুললাম। চিত্তবাবু আমাকে আগেই বলেছিলেন যে, তাঁর আত্মগোপনের ব্যবস্থা তিনি ইতিমধ্যে করে ফেলেছেন। আমি মুজিবকে বললাম, "দেশের পরিস্থিতি যে দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে শীঘ্রই আপনার আত্মগোপন করা উচিত।"

তাঁর আত্মগোপনের জন্য তিনটি পথের কথা আমরা আলোচনা করেছিলাম যার মধ্যে প্রথম ও প্রধান পথ ছিল ভারতে পালিয়ে যাওয়া। তাই আমি তাঁকে বললাম, "বাংলাদেশে আত্মগোপন করে থাকা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ এখানকার সব লোকই হয় আপনাকে দেখেছে নয়তো আপনার ছবি দেখেছে। তাই সব থেকে ভালো হয় যদি আপনি ভারতে চলে যান।" ইতিমধ্যে চিত্তবাবু যে নিরাপদে তাঁর আত্মগোপন করে থাকার সমস্ত ব্যবস্থা করে এসেছেন তাও তাঁকে বললাম। আমি আরও বললাম যে, ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর সঙ্গীসাথিদের নিয়েও ভারতে যেতে পারেন এবং সেখানে সকলেরই থাকা খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করা হবে। তাঁকে আমি আরও বলেছিলাম যে ভারতে গিয়ে রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা পাবেন ও সমস্ত সুযোগ তার থাকবে।

সব শুনে তিনি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। বললেন, "কবিরাজ, ভারতের মাটিতে থেকে আমি স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাব না।" আমিও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে বললাম, "দেশে থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাতে পারলেই সব থেকে ভালো হয়। কিন্তু তা

বড়ই কঠিন কাজ।" দ্বিতীয়টি তার নিজস্ব নির্ধারিত পথ। তা তিনিই বেছে নিবেন।

সব শেষে আমি তাঁকে তৃতীয় পথটির কথা বললাম। বিশেষ জরুরি অবস্থায় আত্মগোপনের সব রাস্তা যদি বন্ধ হয়ে যায় তখন এই তৃতীয় পথটিকেই গ্রহণ করতে হবে এবং নিকটবর্তী একটি বিশেষ দূতাবাসে তাঁকে আশ্রয় নিতে হবে। সেই পরিস্থিতিতে দেওয়াল টপকে সেই দূতাবাসে ঢুকবার জন্য একটা হালকা মই আগে থেকেই তৈরি করে রাখার কথাও আমি তাঁকে বললাম। এভাবে তাঁকে নিরাপত্তার সব দিকগুলোর কথা বলে এবং সব রকম আশ্বাস দিয়ে আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। তাকে আমি বারবার বলছিলাম যে উক্ত দূতাবাসে পৌঁছতে পারলে তার জীবনের কোনো ভয় থাকবে না। সেই দূতাবাসের তথা যে দেশের দূতাবাস সে দেশের সরকারের দেওয়া আশ্বাসের ভিত্তিতেই তাকে তা বলা হয়েছিল। তাও তাকে আমি জানিয়ে দিই।

মুজিবের বাড়ি থেকে বেড়িয়ে আমার মনে প্রশ্ন জাগল—কেন ভারতে যাবার কথা বলায় তিনি এত রেগে গেলেন? উপরন্তু, ইয়াহিয়ার সঙ্গে ঘন ঘন বৈঠক করে তিনি কি বিষয়ে আলোচনা করেছেন তার কোনো হদিস কেন তিনি দিলেন না? আর একটা প্রশ্নও আমার মনে উঁকি মারছিল। তাঁর দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পর থেকেই কি তিনি অখণ্ড পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়েছেন? স্বাধীন বাংলাদেশের প্রশ্ন কি তিনি আপাতত স্থগিত রেখেছেন?

চিত্তবাবু কলকাতায় ছিলেন, তাই তাঁর সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনার সুযোগ ছিল না। তবে আমার একক চিন্তায় মনে হল যে, মুজিবের প্রতি আমাদের প্রাথমিক সন্দেহ বাস্তব রূপ নিতে চলেছে। এত দিন ধরে ক্রমাগত বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথা আমাদের গোপনে বললেও চরম মুহূর্তে তাঁর ইসলামি সংস্কার ত্যাগ করা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

যাই হোক, ইতিমধ্যে ঢাকায় অবস্থা হয়ে উঠেছে অগ্নিগর্ভ। দেশের প্রশাসন যন্ত্রও কার্যত থমকে দাঁড়িয়েছে। মোটামুটিভাবে ছাত্ররাই প্রশাসন চালিয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে ঘটে গেছে আর এক পরিবর্তন। এত দিন ধরে ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টি সব দিক দিয়ে মুজিবের বিরোধিতা করে এসেছে। এমন কি বাংলাদেশের স্বাধীনতাকেও তারা এক হাস্যস্পদ প্রচেষ্টা বলে বিদ্রূপ করে এসেছে। বলেছে স্বাধীন বাংলাদেশ বাস্তবে কখনও সম্ভব নয়। তারা আরও বলে এসেছেন যে, পূর্ববঙ্গ স্বাধীন হলে তার স্বাধীনতা বলে কিছু থাকবে না। সে ভারতের একটি তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিনত হবে। আশ্চর্যের ব্যপার হল, তারাই আজ রাতারাতি ভোল পালটে

চিৎকার করে বেড়াচ্ছে, "আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ চাই। মুজিব তুমি স্বাধীনতা ঘোষণা করো।"৭

ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির এই হঠাৎ পরিবর্তন কেন তা বুঝতে বেশি অসুবিধা হয়নি। দুই দিক দিয়ে লাভ তোলার জন্যই তারা এই পথ বেছে নিয়েছিল। প্রথমত মুজিব যদি স্বাধীনতা ঘোষণা করে তবে ভুট্টো-ইয়াহিয়া তাঁকে ছেড়ে দেবে না। তারা তাঁকে হয় মেরে ফেলবে অথবা কারারুদ্ধ করবে। সেই অবস্থায় বাঘহীন বনে তাদের পক্ষে শৃগালের রাজত্ব করা সম্ভব হবে। দ্বিতীয় এই জন-জাগরণেকে উপেক্ষা করে মুজিব যদি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয় তবে তাকে বিশ্বাসঘাতক বলে প্রচার করা যাবে। জনগণের কাছে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে জন-জাগরণকে নিজের পক্ষে নিয়ে আসা সম্ভব হবে।

তাদের এই হঠাৎ দিক পরিবর্তনের সম্ভবত আরও একটি কারণ ছিল? পরের দিকে এক অভূতপূর্ব জন-জাগরণ লক্ষ্য করে তারা বুঝতে পেরেছিল যে, মুজিব স্বাধীনতার ডাক দিলে বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। কোনো শক্তিই তাকে প্রতিরোধ করতে পারবে না। তাই স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশীদার হবার জন্যই তাদের এই প্রচেষ্টা। এর পিছনে হয়তো রাশিয়ার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুজিবের বাড়ির সামনে জমায়েত হয়ে চিৎকার করতে থাকল— "মুজিব তুমি স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষনা করো, জয় বাংলা।" "ঢাকার পথে পথে মানুষের তখন একই কথা—স্বাধীনতা।"

সব জায়গায় মানুষের ঢল আর মুখে এক স্লোগান, "মুজিব তুমি স্বাধীনতা ঘোষনা করো, জয় বাংলা।"

রাশিয়া তখন বাংলাদেশের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখছিল। পরিস্থিতি লক্ষ্য করে সে-ই ন্যাপ-কমিউনিস্ট জোটকে স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল হতে নির্দেশ দিয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন না করলে তারা যে জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে সেটাও রাশিয়াই তাদের বুঝিয়েছিল। এই কারণেই তারা হঠাৎ করে স্বাধীনতার বড় সমর্থক বনে গেল এবং মুজিবের বাড়ির সামনে হাজার হাজার সমর্থকের জমায়েত করতে লাগল।

সেদিনের ঢাকার সেই উত্তাল গণ-জাগরণ নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা সম্ভব নয় এবং ভাষায় তা বর্ণনা করাও সম্ভব নয়। অভূতপূব সেই গণ-জাগরণ দেখে খুবই আনন্দ পেয়েছি। নতুন করে আশায় বুক বেঁধেছি। মনে মনে গভীর ইচ্ছা থাকলেও, সেই পরিবেশ মুজিবের পক্ষে অখণ্ড পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী

হওয়া সম্ভব ছিল না। আর তা হলেও বাংলাদেশের মানুষ তাকে কোনো দিনও ক্ষমা করত না।

আগেই বলা হয়েছে যে, পূর্ববাংলার প্রশাসন তখন একেবারেই ভেঙে পড়েছিল এবং এই সঙ্কট না কাটাতে পারলে পাকিস্তানের অখণ্ডতার পূজারি তিন নেতা, ভুট্টো, ইয়াহিয়া ও মুজিব প্রমাদ গুনলেন। ইসলামি সংস্কৃতির সুরক্ষার জন্য এই তিন নেতাকে আবার আলোচনায় বসতে হল।

এই আলোচনার মধ্য দিয়ে ভুট্টো ও ইয়াহিয়া আবার মুজিবকে ভাল করে বোঝার ও চিনবার সুযোগ পেলেন। তাঁরা দেখলেন যে ইসলামি পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্যে মুজিবের মধ্যে কোনো ভেজাল নেই। ইসলামি সংস্কৃতির প্রতি মুজিবের শ্রদ্ধাও অবিচল এবং তাকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারে মুজিবের প্রচেষ্টাও অত্যন্ত সৎ ও নির্ভেজাল। তাই ভুট্টো- ইয়াহিয়া এক ঢিলে দুই পাখি মারার পরিকল্পনা করলেন। তাঁরা মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী হবার আমন্ত্রণ জানাবেন ঠিক করলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, প্রধানমন্ত্রী হলে মুজিব আর বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথা বলবেন না বা তার পক্ষে বলা সম্ভব হবে না। ফলে তিনি বাংলা জাতীয়তাবাদীদের থেকে অনেক দূরে চলে যাবেন এবং তখন তাঁদের পক্ষে ইসলামি জাতীয়তাবাদ প্রচার জোরদার করা সম্ভব হবে। সেই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মুজিবের পক্ষে স্বাধীন বাংলাদেশের ডাক দেওয়া আর সম্ভব হবে না। অন্যদিকে সেনাবাহিনীতেও বাঙালির সংখ্যা খুবই কম। তাই মুজিব সেনাবাহিনীকেও নিজের পক্ষে নিতে পারবেন না। সবার উপরে থাকবে ইসলামি পাকিস্তানের প্রতি গভীর আনুগত্য সম্পন্ন এক জন প্রেসিডেন্ট, যাঁকে অতিক্রম করে মুজিবের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হবে না। এই সব দিক বিবেচনা করে তাঁরা মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী করার আশ্বাস দিলেন। আর ভুট্টোর অগোচরে মুজিবও নাকি ইয়াহিয়াকে পাকিস্তানের ভাবী প্রেসিডেন্ট করার জন্য গোপনে প্রতিশ্রুতি দেন।

মুজিব বুঝলেন যে, তিনিই অখণ্ড পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। ফলে পাকিস্তানও অখণ্ড থাকবে এবং ইসলামি বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব রক্ষা পাবে। উপরন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের ঝুঁকিও তাঁকে নিতে হবে না। মুজিবের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা ইঙ্গিতে ইয়াহিয়া ২২শে মার্চের রেডিও ভাষণে দেশের জনগণকে জানিয়ে দিলেন। আর ওদিন মুজিবও সমঝোতার আভাস দিলেন। দেশের যোগাযোগ, পাট শিল্প ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানীর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা (অসহযোগিতা) তুলে নিলেন।

পর্দার আড়ালে ষড়যন্ত্র

৭ই মার্চের পরে আলোচনায় দীর্ঘদিন কেটে গেল। তাতে অনেকের মনে সন্দেহের দানা বাঁধতে থাকে। আর জনগণও অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। তারা আর সময় দিতে রাজি নয়। তারা মনে করল মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন না। ঢাকায় খবর ছড়িয়ে পড়ল যে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। তার কিছু কিছু প্রমাণও তাদের সামনে এল। তার সঙ্গে একটা গুজবও গোপনে ছড়িয়ে পড়ল যে মুজিব প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একজন নেতা স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণা করবেন। তার জন্য জনগণকে প্রস্তুত থাকতে হবে। দরকার মতো যেকোনো মুহূর্তে সে স্বাধীনতা ঘোষিত হতে পারে। কেউ কেউ সে গুজবকে পাগলের কল্পনা বলে উড়িয়ে দিলেও ইয়াহিয়া, ভুট্টো ও মুজিব কিন্তু ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়লেন। ইচ্ছা থাকলেও এঅবস্থায় কিছুতেই মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী করা যায় না। তা করলে তখন বাঙালি জাতীতাবাদী ঝড় এক ভয়াবহ তাণ্ডবের রূপ নেবে।

তিন নেতা ভালোভাবেই বুঝতে পারেন এভাবে সময় নিলে পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নেবে। তারা সবাই ভীত হয়ে পড়েন। সেজন্যই তারা ২৪শে মার্চের বৈঠকে শেষ সিদ্ধান্ত নেন। সে সিদ্ধান্ত মতো মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন। কিন্তু সেই পরিবেশে তা সম্ভব নয়। পরিবেশকে শান্ত করতে সময়ের দরকার আছে। তার জন্য সময় কাটাতে মুজিবকে স্বেচ্ছায় গ্রেপ্তার বরণ করতে হবে। তারপর ইয়াহিয়া কঠোর হস্তে মিলিটারী নামিয়ে পরিবেশকে শান্ত করবে। তার জন্য ক্ষয়ক্ষতির দায়দায়িত্ব মুজিবকে বহন করতে হবে না। বাঙালিরাও পরবর্তীকালে মুজিবের উপর সে দায়ভাগ চাপাতে পারবে না। আরও সিদ্ধান্ত হয় যে ইয়াহিয়া জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ ভাঙ্গবে না। কেননা পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার (গণতান্ত্রিক) গড়তে তাদের দরকার হবে। আওয়ামি লিগ নেতা ও কর্মীদের উপর কোনো অত্যাচার না করার নিশ্চয়তা ইয়াহিয়া মুজিবকে দেন। বৈঠকে তারা সবাই একমত পোষণ করেন যে কঠোর হাতে আন্দোলন দমনের পরে দেশ শান্ত হবে। তখন মুজিব প্রধানমন্ত্রী হলে কেউ মুজিবের ও অখণ্ড পাকিস্তানের বিরোধিতা করতে সাহস পাবে না। তারপর তাৎক্ষণিক বাঙালি আবেগ ভুলে তারা আবার ইসলামি দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হবে। গর্ভেই মৃত্যু হবে স্বাধীন বাংলাদেশ ভ্রূণটির।

সম্পূর্ণভাবে অনুমানের ভিত্তিতে এসব লেখা। সেদিন পর্দার আড়ালের আলোচনা ও সিদ্ধান্তকারীদের মধ্যে কেউ জীবিত নেই। কোনো লিখিত রেকর্ডও নেই। থাকলেও তা কবে প্রকাশ পাবে তা কেউ জানে না। তবে খুনী যেমন কোনো

চিহ্ন না রেখে অতি গোপনে খুন করে পালিয়ে যায় পরে কিন্তু খুনের রকম দেখে ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচার করে সেই খুনীকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। এ বেলাও সেই সময়ের পরিস্থিতি, মুজিবের অতীত ও পরবর্তীকালের কার্যাবলী সহ তার মানসিকতার বিচার করলেই প্রকৃত সত্য খুঁজে পাওয়া যাবে।

পাক আর্মি রাস্তায় নামল

পূর্বের সিদ্ধান্তমতো ২৫ শে মার্চ উভয় পক্ষের কোনো কর্মতৎপরতা দেখা গেল না। সন্ধ্যায় ঢাকার সর্বত্র প্রচারিত হল যে ওদিন রাত্রে মিলিটারী রাস্তায় নামাবে। তাদের চলার পথে বাধা সৃষ্টি করতে বেরিকেড গড়ার নির্দেশ মুজিব নিজেই দিলেন। সে ভাবে সর্বত্রই রাস্তায় বেরিকেড গড়তে মানুষ নেমে পড়ল। এ খবর লোকমুখে শুনে আমি ঐ সন্ধ্যায় মুজিবকে ফোন করি। তিনি খবরটির সত্যতা স্বীকার করলেন। তাকে আমি জিজ্ঞাসা করি "আপনি এখন কি করবেন।" তার কোনো উত্তর না দিয়ে তিনি ব্যস্তভাবেই ফোন ছেড়ে দিলেন। এ খবর পাওয়ার পরে আমাদের অঞ্চলের মানুষ বেরিকেড রচনায় রাস্তায় নেমে পড়ে।

রাত ১১টার পরে পরপর শেলিং এর শব্দ শুনে দৌড়ে ছাদে যাই। তখন শেলিং এর শব্দ শুনে ও বিদ্যুতের মতো আলোর চমকানি দেখে বুঝতে পারি যে পিলখানার ই. পি. আর (East Pakistan Rifles) আর রাজারবাগ পুলিশ হেড কোয়ার্টারে সামরিক বাহিনী আক্রমণ চালিয়েছে। তখন নীচে নেমে মুজিবকে আবার ফোন করি। তখনই তাকে আণ্ডার গ্রাউণ্ডে যাওয়ার অনুরোধ জানাই। তিনি আমাকে বললেন যে তখন সেখানে নজরুল ইসলাম, তাজুদ্দিন, শেখ মণিসহ প্রায় সব আওয়ামি লিগ ও ছাত্রনেতারা আছেন। তাদের সবাইকে তিনি আণ্ডার গ্রাউণ্ডে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আর তিনি তখনই আণ্ডার গ্রাউণ্ডে যেতে বেড়িয়ে পড়ছেন। পাঁচ মিনিট পরে তাকে আবার ফোন করতে গিয়ে বুঝতে পারি ফোনের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে।

পরে কলকাতায় এসে জানতে পারি মুজিবের বাড়িতে সে সময় নজরুল ইসলাম, তাজুদ্দিন, ক্যাপ্টেন মন্সুর আলী, কামারুজ্জমান, আবদুস সামাদ, সেরাজুল ইসলাম খান, শেখ মণি, আবদুর রেজ্জাক, তোফায়েল আহম্মদ সহ অনেক আওয়ামি লিগ নেতা ও ছাত্রনেতা ছিলেন। তারা সবাই মুজিবের বাড়ি থেকে বেড়িয়ে আণ্ডার গ্রাউণ্ডে যেতে পারলেন। নিরাপদে সবাই ভারতে আসতে পারলেন। কিন্তু মুজিব তা পারলেন না কেন? ই. পি. আর ও পুলিশ হেড কোয়ার্টার আক্রমণ শেলিং এর প্রথম শব্দের প্রায় ১ ঘন্টা পরে মিলিটারী মুজিবের বাড়িতে যায় ও তাকে গ্রেপ্তার করে। ১

ঘণ্টা সময় পেয়েও তিনি আণ্ডার গ্রউণ্ডে গেলেন না আর স্বাধীনতা ঘোষণার সই করা কাগজও কাউকে দিলেন না কেন? মিলিটারী নামবে খবর জেনেও তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা পত্রে স্বাক্ষর করে আওয়ামি লিগ নেতাদের হাতে তা আগে দিলেন না কেন? এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজলেই সঠিক সত্য বেরিয়ে আসবে এবং যা সবাই জানে। সেদিন ভারতে খাসা আওয়ামি লিগ নেতাদের কাছে মুজিবের স্বাধীনতা ঘোষণার কোনো কাগজপত্র ছিল না। তাদের একমাত্র সম্বল ছিল — বাঙালি যুবকদের স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীনতা ঘোষণা।

ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর সঙ্গে গোপন বোঝাপড়ার কথা মুজিব কাউকে বলেননি। সেই চরম মুহূর্তে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণাও করলেন না। কেননা মুজিব, ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর পরিকল্পনা ছিল মাতৃগর্ভে "বাংলাদেশ" শিশুটিকে হত্যা করা আর মুজিবের মনেও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তার ঘোষণা ও নেতৃত্ব ছাড়া বাংলাদেশ কোনোদিনই স্বাধীন হতে পারবে না।

বহুদিনের বহু ঘটনার সত্যতা প্রমাণের ভিত্তিতে রচিত হয় একটি প্রবাদ। "রাখে হরি মারে কে? ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।" এগুলি একই জাতীয় বাংলা প্রবাদ। এগুলির সত্যতা প্রমাণের জন্যই মুজিবের গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে বাঙালি সুলভ আবেগ ও সেনাসুলভ সাহসে জ্বলে ওঠে মেজর জিয়াউরের মন। চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশ শিশুটির জীবিত অবস্থায় জন্মের ঘোষণা মুজিবের নামে তিনি দিলেন। নবজাত সেই শিশুটিকে মারার জন্য পাক আর্মি ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাও তিনি জনসাধারণকে জানিয়ে দিলেন। সেই নবজাত শিশুটিকে বাঁচাবার জন্য সর্বশক্তি নিয়ে রুখে দাঁড়াতে দেশবাসীর কাছে মুজিবের নামে আবেদনও জানালেন। এভাবেই তিনি মুজিবের নামে স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণা দিলেন সেই চরম মুহূর্তে। সেই আবেদনে সাড়া দিতে ও শিশুটিকে বাঁচাতে রক্ত শপথ নিয়ে বাঙালি রুখে দাঁড়াল দিকে দিকে। শুরু হল স্বাধীনতা সংগ্রাম আর ভারতের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ স্বাধীন হল।

সময়মতো জিয়াউরের ঘোষণা, পাক আর্মির প্রাথমিক তাণ্ডব, ও বাঙালি যুবকদের যুদ্ধ ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহস ও আবেগ দেখে তাজুদ্দিন, নজরুল ইসলাম সহ আওয়ামি লিগ নেতারা ও বিশেষ বিশেষ ছাত্র নেতারা সাহায্যের জন্য ভারতে ছুটে আসে। তার জন্য চিত্তবাবু আগেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। আওয়ামি লিগ নেতারা দিল্লীতে পৌঁছে সেই আবেগী স্বভাবকে সাহায্য ও মদত পাওয়ার আশ্বাসে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করে ১২ই এপ্রিল আর শপথ

নেয় ১৭ই এপ্রিল '৭১। সেই সরকারের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমান, ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদ এবং মন্ত্রী ছিলেন ক্যাপ্টেন মনসুর আলি, কামারুজ্জমান, মুস্তাক আহম্মদ ও আব্দুস সামাদ আজাদ।

সেদিন ইসলামিক জাতীয়তাবাদের কথা ভুলে আবেগে সাময়িকভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে ভিত্তি করেই ছাত্র যুবকদের দল স্বাধীনতা ঘোষনা করেছিল। তখন ছাত্রজনতার চাপে জিয়াউর রহমান শেখ মুজিবের নামে স্বাধীনতা ঘোষনার খবরটি প্রচার করেছিলেন। ঠিক সেই একই আবেগ নিয়ে বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত হল। সেদিন জিয়াউর যেমন মুজিবের নাটকের শেষ অঙ্ক দেখেননি বা জানতে পারেননি তেমন প্রায় সব নেতাসহ তাজুদ্দিনও সে নাটকের শেষ অঙ্কের কথা জানতে পারেননি। আর ভারত সরকার সব বুঝতে পেরেও হয়তো সব না বোঝার ভান করেছে। কেননা তা জানার কথা বলতে গেলেই তাতে সমস্যা বাড়বে। আর তাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বানচাল হতে পারে। তখন ছুঁচো গেলার মতো অবস্থা ভারতের।

মুজিবের স্বেচ্ছায় গ্রেফতার বরণ

মজুত অস্ত্র হাতে নিতে ও অস্ত্রধারীদের বশ্যতা স্বীকার করাতে ঢাকার পিলখানার ই. পি. আর হেড কোয়ার্টার ও রাজারবাগ পুলিশ হেড কোয়ার্টারে অপারেশন চালাতে পাক সেনাদের প্রায় ১ ঘন্টা সময় লাগে। তার পরে তারা লাল সবুজ সাদা রং-এর হাউই আলো উপরে ছাড়তে ছাড়তে, তার সঙ্গে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে বিভিন্ন দিকে অপারেশন চালাতে অগ্রসর হতে থাকে। ৫ তলা একটি বাড়ির ছাদের উপর উঠে সেই আলোর চমকানি দেখে ও গুলির শব্দ শুনে আমরা তাদের গতিবিধি দেখতে থাকি। আমরা দেখতে পেলাম যে রাজারবাগ পিলখানার প্রথম শেলিং-এর শব্দের প্রায় ১ ঘন্টা পরে পাক আর্মি মুজিবকে গ্রেপ্তার করে। এত সময় পেয়েও মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন না। আর আত্মগোপনেও গেলেন না।

সত্য কথা হল প্রথমদিকে বাধা পেলেও মাঝের দিকে মুজিবের ৬ দফা ঘোষণার সাফল্যের সুযোগ অনেক নেতাই তার বলিষ্ঠ ডাকে সাড়া দিতে এগিয়ে আসেন। কিন্তু শেষের দিকে তার দ্বিমুখী নীতি দেখে অনেকেই গোপনে স্বাধীনতার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। মুজিবকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে কেউ সাহস পায় না। তাই মুজিবের ব্যর্থতা পর্য্যন্ত তাদের অপেক্ষা করতে হয়। তার জন্য ছাত্রজনতাকে তারা বেশি করে উসকে দিতে থাকেন। আর আবেগী যুবকের

দলও যৌবনসুলভ সাহসও মনোবল নিয়ে সেই অভিযানে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে থাকে। তাদের স্বার্থে তারা মুজিবকে সামনে রাখে আর নিজ নেতৃত্বের স্বার্থে ছাত্রদের কথা শুনতে বাধ্য হন মুজিব।

পূর্ববাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রথম দিকে আওয়ামি লিগ পার্টির কার্যত কোন ভূমিকা ছিল না। ৬ দফা আন্দোলনের পরেই মুজিব আওয়ামি লিগসহ অন্যান্য দলের নেতাদের পিছনে ফেলে রাজনীতিতে সবার সামনে চলে আসেন। তিনি প্রথম দিকে ভালভাবে বুঝেছিলেন আওয়ামি লিগের নেতৃবৃন্দ তার ৬ দফাকে সমর্থন জানাবে না। তাই ৬ দফা দাবি ব্যক্তিগত দায়িত্ব নিয়ে লাহোরে গিয়ে ঘোষণা করেন। সাথে সাথে আওয়ামি লিগের মধ্যে ৬ দফার বিরুদ্ধে ঝড় ওঠে। অনেকে প্রাকাশ্যে বিরোধিতা করেন। অনেকে নীরব হয়ে যান। অনেকে গোপনে সমর্থন জানালেও খুব কম সংখ্যক নেতাকে সামনে এসে প্রকাশ্যে বক্তব্য রাখতে দেখেছি। এমনকি লিগ দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। মুজিব জেলে যাওয়ার পরে একমাত্র মহিলা নেত্রি আমেনা বেগমই সাহস নিয়ে ৬ দফার আলোটি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু আওয়ামি লিগের নেতৃবৃন্দ বিশেষ কোনো সাড়া না দিলেও ছাত্র জনতা দুর্জয় সাহস নিয়ে এগিয়ে আসায় বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক নেতা ও ছাত্রনেতারা সেই জাগরণের মধ্যে এই ৬ দফার সঙ্গে সঙ্গে গোপনে পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতার কথা প্রচার করতে থাকেন। শেষের দিকে সেই গোপন প্রচার যখন আন্দোলনের রূপ নিল তখন অনেক আওয়ামি লিগ নেতা তার সমর্থনে এগিয়ে আসেন। অনেকে নীরব থাকলেন। কিন্তু মুজিব কোনোদিন স্বাধীন বাংলাদেশের কথা সদরে বলেননি। ছাত্রজনতার চলার তালে তালে তিনি তাল মিলিয়ে চলেছেন মাত্র। আর শেষ মুহূর্তে তার আজন্ম পোষিত ইসলামিক সংস্কৃতি বাঁচাতে অটুট পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার শেষ চেষ্টা তিনি করলেন।

বিবাহ বন্ধন ছেদ করে কোনো নারী বাড়ির বাইরে চলে গেলে তার দুর্বলতার কারণে অনেক পুরুষ তার ইচ্ছায় ও অনেক সময় অনিচ্ছায় তাকে ভোগ করার সুযোগ নেয়। তার গর্ভে সন্তান এলে সেই অবৈধ সন্তানের পিতৃত্বের দাবি নিয়ে কেউ এগিয়ে আসে না। কারণ নারীটি তো অনেকের সাহচর্যে এসেছে। কাজেই তার খাঁটি পিতার পরিচয়ের কথা কেউই বলতে পারে না। তবে একজন বিশেষ পুরুষ ও উক্ত নারী একই রাতে স্বপ্ন দেখে যে উক্ত শিশুটির জন্মের পরে তার প্রকৃত পিতার মৃত্যু সমূহ সম্ভাবনা আছে, নারীটিও চিরপঙ্গু হয়ে যাবে, তবে শিশুটি মৃত অবস্থায় জন্ম নিলে বা জন্মের পরেই তার মৃত্যু হলে সে আশঙ্কা থাকবে না। তারপর নিশ্চয়ই উক্ত পুরুষ নারীর গর্ভপাত ঘটিয়ে শিশুটির মৃত্যু কামনা করবে।

তাতে নারীটিও চির পঙ্গুত্ব থেকে রক্ষা পাবে। পুরুষটির জীবনও রক্ষা পাবে। আর সুস্থ শরীরে নারীটিকে পুরুষটি ইচ্ছামতো ভোগ করতে পারবে। উভয়ের এ সিদ্ধান্তের পরে যদি সমাজ উক্ত পুরুষটিকে সেই অবৈধ সন্তানের পিতা হওয়ার জন্যই পুরুষটির উপর চাপ সৃষ্টি করে তবে পুরুষটি কিছুতেই রাজি হতে পারে না। মুজিব সেই পুরুষটির ভূমিকাই পালন করলেন। ছাত্রজনতা চাপ দিতে থাকল। সেই চাপের কাছে মুজিব তখন নত হলেন না বরং ভাবী বাংলাদেশ শিশুটিকে হত্যার ভার ইয়াহিয়ার উপর ছেড়ে দিয়ে নিজের জীবন বাঁচাতে ও নিরাপদে সময় কাটাতে চলে যান ইসলামাবাদে।

গ্রেফতারের পরে

মুজিবের স্বেচ্ছায় গ্রেপ্তার বরণের পরেই পাক আর্মি তার হিংস্র মূর্তি ধারণ করেই রাস্তায় নামে। কোরান নির্দেশিত পথে কাফেরের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেই তারা অপারেশন শুরু করল। তারা ভালভাবেই জানত যে সব হিন্দুই পাকিস্তানকে ভাঙতে চায়। কিন্তু সব মুসলমান তা চায় না। পাকিস্তানকে অখণ্ড রাখতেই তাদের এ অপারেশন। তাই সারাধণ মুসলমানদের উপর তারা কোনো অত্যাচার চালাবে না। বিনা কারণে তাদের উপরে কোনো আঘাত তারা করবে না। তবে তাদের আক্রমণ করলে কোনো মুসলমানকেও তারা রেহাই দেবে না। তাই বিভিন্ন জায়গায় মজুত ■ অন্যের হাতে অস্ত্র কেড়ে নিতে প্রথম দিকে তারা যে আঘাত হানে তাতে কিছু সংখ্যক মুসলমান মারা যায়।

একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু সংখ্যক অবাঙালি মুসলমানকেও তাদের মারতে হয়। কেননা তা ছিল তাদের নিজেদের জীবনের নিরাপত্তার ব্যাপার। অন্যথায় পরে বিনা কারণে কোনো মুসলমানকে তারা মারেনি. একারণেই প্রথম রাত্রে তাদের চলার পথে সামনে যাকে দেখেছে তাকেই তারা গুলি করে মেরেছে। কিন্তু ও দিন রাত থেকে তারা হিন্দু পাড়ায় ঢুকে তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে গুলি করে পাখির মতো মেরেছে। তাদের হাত থেকে আবাল বৃদ্ধ নারী শিশু কেউ রক্ষা পায়নি। পরে জেহাদের ডাক দিয়ে সাধারণ মুসমানদের হাতে অস্ত্র দিয়ে সেই জেহাদে অংশ নিতে তারা সাধারণ মুসলমানদের আহবান জানিয়েছে। সেই জেহাদে সাড়া দিতে রাতারাতি গড়ে উঠল আল বদর, আল সামস, আনসারও রাজাকর বাহিনী। সেনাদের কাছ থেকে অস্ত্র পেয়ে ■ তাদের নির্দেশে সেই জেহাদী বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল হিন্দুদের উপরে। নৃশংস ভাবে তারা গুলি করে হিন্দুদের মারতে থাকল। মা বোনদের উপরে পাশবিক অত্যাচার চালাল। আর অবাধে হিন্দু বাড়ি লুটের পরে তা জ্বালিয়ে দিতে

থাকল। সাথে চলল ধর্মান্তরিত করার অভিযান। এই অবাধ লুটের লোভে হাজার হাজার মুসলমান জেহাদি খাতায় তাদের নাম লেখায়। সে তালিকায় নাকি তাদের সংখ্যা ১ লক্ষর উপরে ছিল।

পাক আর্মির পরিকল্পনা ছিল হিন্দুদের উপরে জেহাদী অত্যাচার চালিয়ে মুসলমানদের মনে ভয় সৃষ্টি করা। সেই নৃশংস অত্যাচার দেখে সাধারণ মুসলমানরা স্বাধীন বাংলাদেশের কথা বলা তো দূরের কথা চিন্তা করতেও তাদের গা শিউরে উঠবে। আর সে হিংস্র রূপ দেখে হিন্দুরা তাদের প্রাণ বাঁচাতে ভারতে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হবে। সে ভাবেই হিন্দুরা তাদের প্রাণ বাঁচাতে ভারতে চলে আসতে থাকল। আর ভারতে ১ কোটি হিন্দু চলে আসার পরেই পাক আর্মি নিশ্চিন্ত হল আর সান্ত্বনা পেল যে সংখ্যাধিক্যের শক্তির বলে ভবিষ্যতে কোনোদিন পূর্বপাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের উপর নেতৃত্ব বা কর্তৃত্ব করতে সুযোগ পাবে না। আর পাকিস্তান ভাঙার জন্যও ভবিষ্যতে চেষ্টা করার সাহস ও সুযোগ পাবে না।

পূর্ব পরিকল্পনা নিয়েই তারা এভাবে হিন্দুদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আর সেই পরিকল্পনা মতোই ১ কোটি হিন্দুর ভারতে চলে আসার পরেই তাদের হিংস্রতা কমিয়ে দিল। ঐ পরিকল্পনা মতোই তারা মুসলমানদের উপরে কোনো আঘাত করেনি। দেখায়নি কোনো হিংস্রভাব। তারা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল যে মুসলমানদের প্রতি হিংস্রভাব দেখালেই আবেগী বাঙালি স্বভাব তাদের মনে জেগে উঠবে। তাদের সাময়িক আবেগে ইসলামিক বন্ধন একটু আলগা হলেও সে বন্ধন কাটার কথা কেউ বলেনি। তাদের মনের সেই সাময়িক আবেগ ফুরিয়ে গেলেই ইসলামিক বন্ধনকে তারা আবার দৃঢ় করবে। তার জন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন তাই তখন মুসলিমদের প্রতি হিংস্রভাব দেখালেই তারা শুধু জ্বলেই উঠবে না। তার প্রতিশোধ নিতে তারা চরম পথ বেছে নিতে পারে। সেই চরম পথ হলো ইসলামিক বন্ধনকে পুরোপুরি অস্বীকার করে প্রথমে তারা একেবারে বাঙালি হয়ে যেতে পারে তখন পূর্ব পাকিস্তান তো ছিন্ন হয়ে যাবেই, সঙ্গে সঙ্গে তারা ইসলাম ধর্মের বাইরে চলে যাবে। সেদিনের লেখকেরা অবশ্য ধারাবাহিকভাবে লিখে চলেছিলেন যে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সব বাঙালির উপরে সমানে অত্যাচার চলেছিল। বাস্তবে হিসাব কষলে দেখা যায় যে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের কারো গায়ে কোনো আঁচড় লাগেনি। আওয়ামি লিগের সব নেতাদের বেলাও তাই, তাদের নিজেদের বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনদের কোনো জীবন হানি হয়নি। কারো বাড়ি লুট বা পোড়ানো হয়নি। যদি কোথাও হয়ে থাকে তা ব্যাতিক্রম মাত্র। নয়ত্রো পূর্বের ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটানোর জন্য সুযোগের ব্যবহার তারা করেছে। লোকে জানে পাক সেনাদের এ

নম্বরের শত্রু ছিল আওয়ামি লিগের নেতা ও কর্মীবৃন্দ। তাদের গায়ে কোনো আঁচড় পড়েনি। সেখানে সাধারণ মুসলমানদের উপরে অত্যাচারের কথার মধ্যে কোনো সত্যতা থাকতে পারে না। আর কোরান ও হাদিসে স্পষ্ট করেই লেখা আছে বিশেষ কারণ ছাড়া কোনো মুসলমান কোনো মুসলমানকে মারতে পারবে না। মারলে স্বর্গের দ্বার তার জন্য চিররুদ্ধ হবে। তাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

সেদিনের সেই ভয়াবহ রাতের ঘটনার কথা আবার বলছি, সেই ■ তলা ছাদের উপরে বসে আমরা দেখতে পাই যে উত্তর দিক থেকে নবাবপুর রাস্তা ধরে দক্ষিণের সদর ঘাটের দিকে সেনারা আসছে। পথ ■ ছাদের অবস্থা দেখতে লাল সবুজ ও সাদা রংয়ের হাউই আলো জ্বালাতে জ্বালাতে তারা আসতে থাকল। সেই হাউই-আলো দেখে ও মাঝে মাঝে গুলির শব্দ শুনে আমরা তাদের অগ্রগতির কথা জানতে পারি। শাঁখারি বাজারের মুখে এসেই একটা বাড়ির উপরে শেল ছাড়ে। তা ফেটে সেই বাড়ির একটা অংশ ভেঙে পড়ে। সেই শেলিং-এর শব্দে আমরা শিউরে উঠি। পরের দিন জানতে পারি যে, ঐ বাড়িতে ■ জন মারা যায় ও ৫/৬ জন আহত হয়। তারপর সদর ঘাটের দিকে তারা চলে যায়। সদর ঘাটে লঞ্চ ঘাটে শত শত যাত্রীকে তারা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে গুলি করে মারে ও লঞ্চঘাটের দখল নেয়। তারপরেই সদর ঘাটের কাছেই কোতয়ালী থানা আক্রমণ করে। কিছু সংখ্যক পুলিশকে গুলি করে মারে। বাকিরা সারেণ্ডার করার পরে সমস্ত অস্ত্র তারা নিয়ে নেয়। এভাবে অন্যান্য থানাগুলিও তারা রাত্রে আক্রমণ করে সব অস্ত্র নিয়ে নেয়। সেদিন রাত্রে হাউই বাজির নিশানা দেখে ও গুলির শব্দ শুনে আর বাংলাদেশ হওয়ার পরে কিছু প্রত্যক্ষদর্শী বা আহত মানুষের কাছে শোনার ওপর নির্ভর করেই এ লেখা। তবে সেদিনের হাউই আলো দেখে ও গুলির শব্দ শুনে বুঝতে পারি যে হিন্দু মহল্লায় তারা বেছে বেছে আক্রমণ চালায়।

পরে জানতে পারি মুজিবের গ্রেপ্তারের পরেই পাক আর্মি প্রথম আক্রমণ চালায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলে। কেননা ছাত্রনেতৃত্বের মূল ঘাঁটি ছিল এই ইকবাল হল। সেখানে ছাত্রদের হাতে কিছু অস্ত্রও ছিল। সেই অস্ত্র কেড়ে নিতেই সেখানে প্রথমে গুলি চালায়। তাতে বেশ কিছু সংখ্যক মুসলিম ছাত্র হত ও আহত হয়। তারপরেই ছাত্ররা সারেণ্ডার করে। তখন ঘরে ঘরে ঢুকে অস্ত্র তল্লাসী চালায় ও যেসব অস্ত্র পায় তারা নিয়ে যায়। সারেণ্ডার হওয়ার পরে মুসলিম ছাত্রদের উপর কোনো অত্যাচার তারা চালায়নি। তবে তারা চরম ভাবে হুঁশিয়ারি দিয়ে যায়। থানা দখলের সময় তারা যে ভাবে পুলিশের উপরে আক্রমণ চালায় সেভাবেই তারা ইকবাল হলে আক্রমণ চালায়। হিংস্র বাঘের মতো তারা সাধারণ মুসলিম

ছাত্রদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েনি। কিন্তু হিন্দু ছাত্রদের তারা রেহাই দেয়নি। সেই গভীর রাতে হিন্দু হোস্টেল জগন্নাথ হলে ক্ষুধার্ত হিংস্র বাঘের মতো তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেখানে তারা কাউকে রেহাই দেয়নি। ঘরে ঘরে ঢুকে যাকে পেয়েছে তাকেই পাখির মতো গুলি করে মেরেছে অথবা ধরে নিয়ে এসে মাঠে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে ৩/৪ শত হিন্দু ছাত্রকে মেরেছে। ছাত্রদের যেমন রেহাই দেয়নি তেমন মিনিয়াল কোয়ার্টারের কাউকেও তারা ছাড়েনি। আবাল বৃদ্ধ শিশু নির্বিশেষে সবাইকে তারা গুলি করে মেরেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু পুরোনো ক্যান্টিনে বৃদ্ধ মালিক সবার পরিচিত ও ছাত্র শিক্ষক সবার মধুদাকেও তারা নৃশংস ভাবে গুলি করে মারে। এখানেই শেষ নয়। সে রাত্রে হিন্দু শিক্ষকদের তারা আক্রমণ করে ও গুলি করে মারে। জগন্নাথ হলের প্রাক্তন প্রভোষ্টও দর্শন বিভাগের প্রধান প্রোফেসর ডঃ গোবিন্দ দেব ইংরেজি বিভাগের প্রোফেসর ডঃ জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, অধ্যাপক ঘোষ ঠাকুর, অধ্যাপক অনুদ্বিপ্যায়ন ভট্টাচার্য ও পরে সন্তোষ ভট্টাচার্য কে তার গুলি করে মারে। সে রাত্রে কোনো মুসলমানের উপরে কোনো আক্রমণ তার চালায়নি। তবে ভুলক্রমে ডঃ অজয় রায়কে মারতে গিয়ে অধ্যাপক মনিরুজ্জমানকে তারা মারে।

ঐরাতে ঢাকার সাধনা ঔষধালয়ের ৮০ বছরের বৃদ্ধ মালিক ডঃ যোগে ঘোষকে তারা মারে। ডঃ হরিনাথ দে, ডঃ এস কে সেন, (জাতীয় পরিষদের প্রাক্ত সদস্য) ডঃ নতুন বাবু, ডঃ কমল সরকার, ডঃ নরেন ঘোষ, অ্যাডভোকেট লালমোহ শিকদার, ব্যবসায়ী চিত্ত সিংহরায়, সমাজ সেবক বিপ্র ভৌমিক সহ অনেক গণ্যমা হিন্দুকে গুলি করে মারে। হাজার হাজার সাধারণ হিন্দুকে মারলেও সাধারণ গণমান্য কোনো মুসলমানদের উপরে কোনো আঘাত তারা হানেনি। ঢাকা ছা গ্রামের দিকে তাকালে সে ইতিহাস আরও বেশি ভয়াবহ। কুমিল্লার প্রাক্তন ম ধীরেন দত্ত, অতীন রায়, বরিশালের রায় সাহেব, ললিত বল (প্রাক্তন এম এল , প্রোফেসর চিত্ত রায়, রাজসাহীর অ্যাডভোকেট বীরেন সরকার, টাঙ্গাইলের র বাহাদুর আর পি সাহা সহ হাজার হাজার গণ্যমান্য হিন্দুকে তারা গুলি করে মেরে এমনকি পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী প্রশান্ত শূরের বাবা রায় বাহাদূরকে তারা মেরে সব নাম লিখতে গেলে ৩০ লক্ষ মানুষের নাম লিখতে হয়। তবে তার মধ্যে ৯৫ শতাংশই হিন্দু।

এভাবে শুধু হিন্দু হত্যা করেই তারা থামেনি। হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর তারা আঘাত হেনেছে। আর হিন্দুদের ধর্মস্থানেও তারা আঘাত হেনেছে। ডিনাম দিয়ে তারা গুঁড়িয়ে দিয়েছে রমনা কালীমন্দিরের ২১১ ফুট চূড়াসহ গোটা মন্দির

১২০০ বছরের অতীত ইতিহাস বহনকারী ও হিন্দু ঐতিহ্যের সাক্ষাৎ প্রমাণ দিতে যার চূড়া মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল ঢাকার বিখ্যাত রমনামাঠের মধ্যখানে। রমনা কালীমন্দিরের পাশেই ছিল মা আনন্দময়ীর মন্দির। গভর্নরের বাড়ির সামনের শিবমন্দির, ঢাকা স্টেশনের পাশের শিবমন্দির ও সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়িসহ অনেক মন্দির তারা ধ্বংস করে দেয়।

ঢাকার সেই জল্লাদ বাহিনীর চলাচল দেখতে দেখতে ও চারিদিকে বিপন্ন হিন্দুদের কান্না ■ চিৎকার শুনতে শুনতে রাত কেটে গেল। ভোরেই রেডিওতে খবরে জানতে পারলাম সমস্ত ঢাকায় কারফিউ জারি করা হয়েছে। সেদিন সমস্ত রাতেই উক্ত ছাদের উপরে বসে কাটাই। সেই আশ্রয়বাড়ির পাশের বাড়ি ছিল আমার শ্বশুর বাড়ি। আর ৩/৪ টা বাড়ি পরেই ছিল আমার নিজের বাড়ি। আমার স্ত্রীকে ছেলে মেয়ে নিয়ে শ্বশুর বাড়ি আসতে খবর দিই। খবর পেয়েই তারা শ্বশুর বাড়িতে চলে আসে। কেননা তাদের আসতে রাস্তায় নামতে হয় না বাড়ির ভিতর দিয়ে তারা চলে আসে। আমার স্ত্রীর কাছে তখন আমি জানতে পারি যে আমাকে মারতে পাক আর্মি সে রাতে আমার বাড়িতে হানা দেয়। প্রথমেই আমার ভ্রাইভার রসিদকে ধরে। তার কাছে আমার অবস্থানের কথা জানতে চায়। রসিদ তাদের জানায় যে আমি বাড়িতে নেই। সত্যিই আমি বাড়িতে ছিলাম না। রসিদ মুসলমান হওয়ার জন্য রেহাই পায়। সে মুসলমান তার প্রমাণ তাকে দিতে হয়। অন্যান্য পাড়ার মতো শাঁখারি বাজারের কোন বাড়িতে ওদিন ঢুকে কোনো তল্লাশি চালায়নি বা ঢুকে বাড়ির ভিতরে গিয়ে কাউকে ঐ রাতে গুলি করে মারেনি। কারণ তাদের মনে হয়তো ভয় ছিল। কেননা দুর্ধর্ষ বলে শাঁখারিদের পরিচিতি আছে আর সেখানের ঘুপচি ঘরগুলিতে প্রবেশ করাও ছিল কঠিন সমস্যা। সেখানে যেকোনো মুহূর্তে যেকোনো দিক থেকে আক্রমণ আসতে পারে। ওদিন বাড়ি থাকলে ভয়ে নিশ্চয়ই রসিদ আমার বাড়িতে থাকার কথা বলত। তাহলে ওদিনই আমার মৃত্যু ছিল অনিবার্য।

পরের দিন ভোর থেকেই কিছু সময় পর রাস্তায় সেনাদের গাড়ি টহল দিতে থাকলো। ছাদ থেকে বা জানলায় মাথা বাড়িয়ে যারা তাদের দেখতে গেল আর সেনাদের তা নজরে পরলেই সঙ্গে সঙ্গে গুলিতে তাদের মাথার খুলি উড়ে গেল। ওদিন কারফিউ-এর মধ্যে শাঁখারি বাজারের বেশ কিছু বাড়িতে ঢুকে ১২৭ জন হিন্দুকে ডেকে নিয়ে এক বাড়িতে জড়ো করে। এক সঙ্গে তাদের সবাইকে গুলি করে মারে। তাদের মধ্যে একজন জীবিত ছিল। গুলি করার আগেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়ার জন্য সে বেঁচে যায়। এখবর শুনে শিউরে উঠি। শ্বশুর বাড়িতে ঢুকলে আমাদেরও মৃত্যু ছিল অনিবার্য। ভগবানের আশীর্বাদে সমূহ মৃত্যুর হাত

থেকে পর পর দুদিন বেঁচে গেলাম।

পরের দিন ভোরে অর্থাৎ ২৭ শে মার্চ কারফিউ তুলে নেওয়া হয়। রেডিওতে সে খবর শুনেই বাড়ির দিকে আর না তাকিয়ে আমার পরিবার, শ্বশুর বাড়ির পরিবার ও সঙ্গে ২/৩ টি পরিবারের লোক আমরা জীবন বাঁচাতে ঢাকা ত্যাগ করে বুড়িগঙ্গার অপর পাড়ে যাওয়ার জন্য বেড়িয়ে পড়ি। গাড়ি বাড়ি সঞ্চিত সম্পদ সব ত্যাগ করে বেড়িয়ে পড়ি। নদীর ঘাটে পৌঁছেই একটা বড় নৌকায় তাড়াতাড়ি আমরা উঠে পড়ি। নৌকাটিকে তাড়াতাড়ি অপর পাড়ে পৌঁছে দিতে মাঝিরাও সাধ্যমত চেষ্টা করল। অন্য পাড়ে পৌঁছিবার ৫/৬ গজ থাকতেই আমরা গুলির শব্দ শুনতে পাই। সঙ্গে মাঝনদী থেকে কান্নার ও আর্ত চিৎকার ধ্বনি কানে আসে। সেদিকে না তাকিয়ে মাঝিরা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নৌকা তীরে ভিড়িয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ও মাঝিরা নেমে দৌড়িয়ে শুভড্ডার শুকনো খালের মধ্যে চলে যাই। শুভড্ডা গ্রামে না থেমে ২/৩ মাইল দূরের বাঘোর গ্রামে চলে যাই। সেখানে ওদিন থাকি ও পরের দিন খুব ভোরে সে গ্রাম থেকে দক্ষিণ দিকে হেঁটে দুপুরে বরইহাজি গ্রামে পৌঁছাই। এর মধ্যেই আমি আমার শ্বশুর পরিবারের লোকজন নিয়ে বরিশালের গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। বরইহাজিতে পৌঁছোবার ১/২ ঘন্টা পরেই দেখতে পাই শত শত ভয়ার্ত মানুষ (হিন্দু) তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আহত মানুষও বরইহাজিতে পৌঁছে যায়। তাদের কাছে জানতে পারি যে আমরা বাঘোর গ্রাম ছেড়ে আসার কিছুক্ষণ পরেই সে গ্রামে সেনা অপারেশন হয়। তাতে শতশত মানুষ যেমন মারা যায় তেমন আহতও হয়। বাঘোর গ্রামটি ছিল হিন্দুগ্রাম। তাই ঢাকার হাজার হাজার হিন্দু গিয়ে সে গ্রামে প্রথমদিন আমাদের মতো আশ্রয় নেয়। পাক আর্মি তা জানতে পেরে পর দিন খুব ভোরে ওই গ্রামে অপারেশন চালায়। আর ভগবানের একান্ত আশীর্বাদে তার কিছু সময় আগেই সে গ্রাম ত্যাগ করে আমরা চলে আসি। হিন্দুগ্রাম জেনে ও হিন্দুরা সেখানে আশ্রয় নেওয়ার খবর পেয়েই তারা নির্দয়ভাবে গুলি চালায়। পাশের মুসলিম গ্রামে বা শুভড্ডার হিন্দু মুসলমানের মিলিতভাবে বাসের জন্য সে গ্রামে তারা এভাবে একচেটিয়া গুলি চালায়নি। তবে হিন্দু বাড়িতে ঢুকে তারা গুলি চালিয়েছে। সেই সব আহত রোগীদের কাছে জানতে পারি যে তাদের বন্দুকের নল থেকে শতশত গুলি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বেরিয়ে আসে। সামনে যারা থাকে তারা সবাই হত বা আহত হয়। এভাবে প্রথম থেকে বেছে বেছে তারা হিন্দু গ্রাম আক্রমণ করে হিন্দুদের মারতে থাকে। এসব খবর শুনেও বাস্তব ঘটনা নিজ চোখে দেখে বরিশালের গ্রামের বাড়িতে পৌঁছাতে চলার গতি বাড়িয়ে দিই। পথে রাত্রি কাটাই প্রথমে বাঘোর, বরইহাজি, পরে যাযিরা,

বরমুগুরিয়া , মাঠিডাঙা। এই সুদীর্ঘ পথ ছোট ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে হেঁটেই ৭ দিন পরে আমার বাড়ি সামন্তগাতীতে পৌছাই ২ রা এপ্রিল ৭১ এ।

সংগ্রাম শুরু কলকাতায়

আমার বাড়িতে পৌছানোর খবর পেয়েই সেই গোপন সংবাদবাহক হামিদ আমার বাড়িতে এসে পৌছায় ৬ই এপ্রিল। তার কাছে জানতে পারি ২৪ শে মার্চ সকালে সে কলকাতা থেকে ঢাকার পথে যাত্রাকরেছিল। একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খবর ২৫শে মার্চের আগেই ঢাকায় পৌছে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল তার। পথে অসুস্থ হয়ে পড়ায় সে যশোর থেকে ঢাকা যাওয়ার প্লেন ধরতে পারে নি। তার জন্য পরের দিন ভোরের প্লেন ধরার জন্য যশোরে একটি হোটেলে সে থাকে। ওদিন রাত্রেই যশোরে মিলিটারি অপারেশন শুরু হয়। শেলিং এর শব্দ শুনে অন্যান্য হোটেলবাসীদের সঙ্গে সেও ঐ রাত্রে হোটেল ত্যাগ করে অন্ধকারে গ্রামের দিকে ছুটে যায়। সেনার ভয়ে সীমান্ত পেরিয়ে কলকাতা ফিরে আসার সাহস সে হারিয়ে ফেলে। তাই কলকাতার দিকে না গিয়ে সোজা বাড়িতে চলে যায়। তার কাছে সব শুনে খবরটি খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করেই পরের দিন আমরা কলকাতার পথে যাত্রা করি। কারণ হামিদের কাছে পাঠানো খবরটি যে নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট জায়গায় পৌছায়নি সে খবরটি কলকাতায় পৌছানো একান্ত প্রয়োজন ছিল।

পথে যান বাহন না থাকায় সমস্ত পথই আমাদের হেঁটে আসতে হয়। পূর্ববাংলার সীমানা অতিক্রম করে দুপুরে ইছামতী নদী পার হয়ে টাকিতে পৌছাই। সেখান থেকে বাসে বিকাল বেলায় কলকাতার ২১ নং ডাঃ রাজেন্দ্র রোডে পৌছাই। তখন চিত্তবাবু সে বাড়িতে বাস করতেন। এই চলার পথে খুলনা জেলার কচুয়া থানার জোবাই গ্রামে আমরা প্রথম রাত কাটাই। পরে রামপাল থানার হুকড়া ও বিদ্যার বাহন , দাকোপ থানার বাজুয়া, পাইকগাছা থানার হড্ডা ও দেবহাটা থানার দেবী শহরে রাত কাটাই। আগেই বলা হয়েছে নির্বাচনের অনেক আগে চিত্তবাবু কলকাতায় আসেন। এবং এই বিশাল বাড়িটি ভাড়া নিয়ে সেখানে বাস করতে থাকেন। কেননা এই বিশাল বাড়ির প্রয়োজনীয়তার কথা আমাদের জানা ছিল। আমরা কলকাতায় পৌছাই খুব সম্ভব ১৩ই এপ্রিল ৭১। আমাদের কলকাতা পৌছাবার আগেই ১২ই এপ্রিল বাংলাদেশে সরকার ঘোষিত হয় আর ১৭ ই এপ্রিল মন্ত্রীরা শপথ নেন। আগেই বলা হয়েছে সে সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন তাজুদ্দিন আহম্মদ। সেই সরকার ঘোষিত হওয়ার পূর্বে তিনি চিত্তবাবু ও ছাত্রনেতাদের সঙ্গে প্রাথমিক কোনো আলোচনা করেননি। চিত্তবাবু ছিলেন মুজিবের স্বীকৃত নিজস্ব প্রতিনিধি।

স্বাধীনতার প্রাথমিক প্রস্তুতি নিতেই কলকাতা আসেন তিনি। আর ছাত্রদের মধ্যে যে ৪ জন নেতার একান্ত প্রচেষ্টায় মুজিবের আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে তারা কেউই এই সরকার গঠনের প্রাক্কালে কিছুই জানতে পারল না। আর চিত্তবাবু ও আমি সুদীর্ঘ দিন ধরে স্বাধীনতার প্রাথমিক চিন্তা থেকে শেষ পর্যন্ত কাজ করেছি। আমরাও কিছু জানতে পারলাম না। বিশেষত চিত্তবাবু মুজিবের স্বীকৃত প্রতিনিধি হয়েও কিছু জানতে পারলেন না। ছাত্রনেতারা প্রথমদিকে ভীষণভাবে চটে যায়। তারা প্রকাশ্য ভাবে তাজুদ্দিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করার কথা চিন্তা করতে থাকে। আর চিত্তবাবু মনে মনে দুঃখ পেলেও তা হজম করেন বৃহত্তর স্বার্থের দিকে তাকিয়ে। বিশেষ করে ভারতের মদতে সরকার ঘোষিত হওয়ার কারণে মনে মনে দুঃখ পেলেও তা প্রকাশের সুযোগ তার ছিল না। তাই তিনি নিজে ও ভারতের ভারপ্রাপ্ত একজন অফিসার মিলে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ছাত্রনেতাদের নিবৃত্ত করেন।

এই ছাত্রনেতারা হল (১) সিরাজুল আলম খান (২) আবদুর রেজ্জাক (৩) শেখ মনি ও (৪) তোফায়েল আহম্মদ। এই ৪ জন নেতার নেতৃত্বের ঐতিহাসিক অবদানের জন্যই মুজিব ধীরে ধীরে ও ধাপে ধাপে এত উঁচুতে উঠতে পেরেছিলেন। সরকার গঠনের আগে পর্যন্ত তাদের কথাই ছিল শেষ কথা অথচ সরকার গঠনের সময় তাদের মতামত নেওয়া তো দূরের কথা, তারা কিছুই জানতে পারল না। তাতে তাদের ব্যক্তিত্বে চরম আঘাত লাগে। চিত্তবাবুর বেলায়ও তাই। বৃহত্তর স্বার্থে তারা নিবৃত্ত হলেও তাদের মনে বেদনা থেকে গেল। সেকারণেই উক্ত ৪ জন ছাত্রনেতা ও চিত্তবাবু পরস্পরের বেশি কাছে এল। চিত্তবাবু এই ছাত্রনেতাদের ওপর ভর করে তার মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে চান আর ছাত্রনেতারাও চিত্তবাবুর ওপর ভর করে তাদের মর্যাদা ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তারা এভাবে তাজুদ্দিনের ওপর চটে গেলেও শান্ত হয়। আমার সেদিন মনে হয়েছিল যে ভারত সরকার সেদিন বুঝেছিল মুজিব স্বেচ্ছায় গ্রেপ্তার বরণ করেছেন। তাই আগরতলা থেকে বি.এস.এফ. প্লেনে উক্ত ৬ জন নেতা দিল্লীতে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে ভরত সরকার তাদেরকে দিয়ে তাড়াতাড়ি স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। সেভাবে সরকার গঠিত ও ঘোষিত হয় ১২ই এপ্রিল ৭১। মুজিব নিজে বিশ্বাসভঙ্গ করেছিল জেনেই তার বিশ্বস্ত প্রতিনিধি চিত্তবাবু ও ৪ জন ছাত্রনেতা কেন, কারো সাথে আলোচনার জন্য সময় ও সুযোগ ভারত সরকার এই মন্ত্রীদের দেয়নি। তখন ভারত সরকারের সামনে প্রথম ও প্রধান কাজ ছিল বাংলাদেশ সরকার গঠন ও ঘোষণা।

এই ৪ জন ছাত্র নেতার মধ্যে সিরাজুল আলম খান ছিল কিছুটা চরমপন্থী, চিন্তাশীল, পরিশ্রমী, সৎ, নির্ভীক আপোসহীন বিশেষ ব্যক্তিত্বশালী নেতা। জন্মগত

চেতনা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে নিজের গুণেই সে জননেতা হওয়ার অধিকার অর্জন করে। সাংগঠনিক শক্তি তার মধ্যে বিশেষভাবে দেখা যায়। সমাজবাদে তার বিশ্বাস ছিল। চীনপন্থী বিশেষ করে ট্রটস্কিপন্থী বলেই তাকে মানুষ অভিহীত করত। আমার কাছে সে ছিল একজন আয়রন ম্যান। আব্দুর রেজ্জাক ছিল নরমপন্থী, সৎ, কর্মঠ ও আপসকামী নেতা, সাংগঠনিক শক্তি ও তার খুব ভালো ছিল। সেও সমাজবাদে বিশ্বাসী ছিল। তবে সে ছিল রাশিয়াপন্থী। শেখ মণি ছিল চিন্তাশীল, চতুর, সুযোগ সন্ধানী নেতা। সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল কিন্তু পূর্বোক্ত দুজনের মতো নয়। তবে মামার জোরে সে পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করত। কেননা সে ছিল মুজিবের ভাগনে ও সমাজবাদের কট্টোর বিরোধী। সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে ছিল ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের সংঘাত। তোফায়েল আহম্মদ এদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। তার মধ্যে তখনও তেমনভাবে কোনো বিশেষ গুণ ধরা না গেলেও তার মধ্যে সাংগঠনিক শক্তি ছিল তা নিশ্চিন্তে বলা যায়। সে ছিল চতুর ও কিছুটা সুযোগ সন্ধানী নেতা। সেও কট্টর সাম্যবাদ বিরোধী।

কলকাতা পৌঁছবার ২/১ দিনের মধ্যেই গণমুক্তি দলের কিছু সংখ্যক নেতা ও কর্মী উক্ত ৪ জন ছাত্রনেতা ও কিছু সংখ্যক আওয়ামী লিগ নেতা চিত্তবাবুর বাড়িতে পৌঁছে যায়। তারপর অন্যরা পরপর আসতে থাকল। তাদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় মুজিবের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের জন্য বাড়ি ভাড়া করে সে সব বাড়িতে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রথমে আসে মুজিবের ভগ্নীপতি আব্দুর রব সেরনিয়াবাত। তারপরে আসেন ভাই নাসির ও চাচা খান সাহেব মোশারফ হোসেন খান। তারপর প্রথমে বড় ছেলে কামাল। তার বেশ কিছুদিন পরে আসে ছোট ছেলে জামাল।

কলিকাতা পৌঁছে প্রথম দিন গভীর রাত পর্যন্ত গণমুক্তি নেতা ও উক্ত ৪ জন ছাত্রনেতা ও আওয়ামি লিগ নেতাদের সঙ্গে যৌথভাবে বসে বিশেষ আলোচনা হয়। আলোচনার বিশেষ আলোচ্য বিষয় সেই ভয়াবহ পরিস্থিতির মোকাবিলা কিভাবে করা যায়?

সে সভা ভেঙ্গে যাওয়ার পরে চিত্তবাবু ও আমি গভীররাতে একান্তে আলোচনায় বসি। তখন চিত্তবাবুকে আমি জানাই মুজিব স্বেচ্ছায় গ্রেপ্তার বরন করেছেন তখন তিনি তা বিশ্বাস করতে পারেননি। তখন আমার ঢাকায় দেখা ও শোনার অভিজ্ঞতার কথা তাকে বলি। তাকে আরও বলি যে হয়তো স্বাধীনতা ঘোষণার ঝুঁকি নিতে তিনি সাহস পাননি। আর আমাদের আশ্বাসে হয়তো আস্থা রাখতে পারেননি। নয়তো আমাদের পূর্ব ধারণামত পাকিস্তান অখন্ড রাখতে না

পরে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার লোভে তিনি সেচ্ছায় গ্রেপ্তার বরণ করেছেন।

এসব বলা সত্ত্বেও তিনি বিশ্বাস করতে পারেননি। চিত্তবাবু ঢাকায় থেকে কাছে বসে মুজিবের নাটকের শেষ অঙ্ক দেখেননি আর হয়তো বা বিশেষ কারণে সব জেনেও আমার কাছে তা স্বীকার করতে তার বিশেষ অসুবিধা ছিল। কেননা তিনি তখন গোপনীয়তা রক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। সেদিন তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, সেসব সন্দেহের কোনো প্রমাণিত ভিত্তি ছাড়া তা বিশ্বাস করা যায় না। তার উত্তরে আমি তাকে বলেছিলাম—মুজিবের কাছে পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতার ঘোষণাটুকু শুধু আমরা চেয়েছিলাম। তিনি সে ঘোষণা না করলেও পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা ঘোষণার পরিবর্তে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়েছে। সে স্বাধীনতাকে কেউ আর ঠেকাতে পারবে না বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। চিত্তবাবুর বিশ্বাসও সেরূপ ছিল।

মুজিবের স্বেচ্ছায় গ্রেপ্তার বরণের কথা যেমন চিত্তবাবুকে বলেছিলাম তেমন ভারতের অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সচিব পি.এন. ব্যানার্জী (নাথবাবু) কেও আমি তা বলেছিলাম। তিনি আমতা আমতা করে আমার কথা অবিশ্বাস করলেও সেদিন আমার মনে হয়েছিল যে তার মনেও কিছু সন্দেহ দানা বেধেঁছিল।

তারপর একদিন গণমুক্তি দলের কর্মী ও নেতাদের বৈঠকে বাংলাদেশের নাম নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা হয়। ভারতের খেয়ে পরে ও ভারতের সাহায্যের সব রকমের আশ্বাস পেয়ে ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে তারা তাদের দেশের নাম বাংলাদেশ ঘোষণা করল। সে নামের স্বীকৃতিও ভারত সরকার দিল। একটা অংশ হয়ে গেল সম্পূর্ণ। কেননা পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ নিয়েই প্রকৃত বাংলাদেশ। সে দেশের নাম পূর্ববঙ্গ হতে পারে। সোনার বাংলা, আদর্শ বাংলা হলেও তা হত যুক্তিযুক্ত। এই বাংলাদেশের নামের স্বীকৃতি ভারত দেওয়ার পরেও বাস্তব পক্ষে কাগজ কলমে তারা পশ্চিমবঙ্গকে বিনা যুদ্ধে কেড়ে নিল। আর বাংলা ভাষার একমাত্র অধিকারী তারাই হল। আমাদের সেদিনের অভিমত ছিল একদিন এই ভুলের মাসুল ভারতকে গুণতে হবে।

প্রথমদিকে হিন্দু ও মুসলিম শরণার্থীর দল সীমান্ত পেরিয়ে বিভিন্ন পথে ভারতে প্রবেশ করতে থাকল। তারা প্রায় সবাই আশ্রয় পেল। রোজই লক্ষ লক্ষ রিফুজী প্রাণ বাঁচাতে ভারতে ছুটে আসতে থাকল। তাদের করুণ অবস্থা দেখতে ও বাংলাদেশের ভিতরের অবস্থা জানতে আমরা সীমান্তে ছোটাছুটি করতে থাকলাম। আমরা দেখলাম প্রথম দিকে কিছু সংখ্যক মুসলমান রিফিউজি এলেও তখন কোনো মুসলিম রিফিউজি আসছে না। কারণ সেখানের মুসলমানরা দেখতে পেল যে বিনা

কারণে পাক আর্মি বা জেহাদী বাহিনী কোনো মুসলমানকে মারছে না। অধিকন্তু কোনো মুসলমানের উপর কোনো অত্যাচার চালাচ্ছে না।

এর মধ্যে গণমুক্তি দলের নেতা কর্মীবৃন্দ ও হিন্দুরা তাদের আত্মীয় স্বজন নিয়ে বেশির ভাগই ভারতে চলে এল। তারা সবাই ক্যাম্পে আশ্রয় নিল। সেই সব ক্যাম্পবাসীরা পূর্ববঙ্গে তাদের উপরে অমানবিক অত্যাচারের কথা চিৎকার করে বলতে থাকল।

সেখানে মুসলিম লিগ 'আওয়ামি লিগ' ন্যাপ কমুনিষ্ট পার্টি ও জামাতে ইসলাম দল মত নির্বিশেষে তাদের কর্মী সমর্থকরা হিংস্র বাঘের মতো কেবল মাত্র হিন্দুদের উপরে ঝাপিয়ে পরেছে। আর নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছে। সেসব শুনে পূর্বে এসে যেসব মুসলমানরা ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছিল তারা দেশে ফিরে গেল। কেননা তারা বাস্তবে দেখতে পেল কোন মুসলমান রিফিউজি তখন আর ভারতে আসছিল না। দলমত নির্বিশেষে সেদিন হিন্দুদের উপরে অত্যাচার চালিয়েছে সে কথা সত্য হলেও সব মুসলমান তাতে অংশ নেয়নি। বরং অনেকেই হিন্দুদের রক্ষা করতে ও তাদের প্রাণ বাঁচাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। অনেকে বিপদ জেনেও অনেক হিন্দুকে তারা এই চরম মুহূর্তে আশ্রয় দিয়ে তাদের প্রান বাঁচাতে সাহায্য করেছে। তবে তাদের সংখ্যা খুব কম আর শক্তি ছিল আরও বেশি কম। এই অত্যাচার যখন হিন্দুদের ওপর চলছিল তখন বৃহত্তর স্বার্থে ভারতের সব মিডিয়া প্রচার চালিয়েছে যে সেখানে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে বাঙ্গালিদের উপর অত্যাচার হয়েছে। কেননা এই পরিপ্রেক্ষিতে সত্য খবর প্রচারিত হলেই ভারতে সাম্প্রদায়িক পরিবেশ ক্ষুণ্ণ হবে তাতে বানচাল হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। পাকিস্তান চেয়েছিল সেই অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায় ভারতের সাম্প্রদায়িক পরিবেশ ক্ষুণ্ণ করতে। কিন্তু পরবর্তীকালে সেই জঘন্যতম ইতিহাস কেউ জানতে পারল না।

ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরে হিন্দু শরনার্থীদের করুণ অবস্থা দেখে ও বাংলাদেশে তাদের নৃশংস অত্যাচারের কাহিনি তাদের মুখে শুনে বিচলিত হয়ে পড়ি। মনে বিদ্রোহ জেগে ওঠে। এই পরিস্থিতির আলোচনার জন্য গণমুক্তি দলের নেতাকর্মীদের নিয়ে আলোচনায় বসি। সে বৈঠকে প্রায় সবাই মত প্রকাশ করে যে মুসলিম বাংলাদেশে হিন্দুরা ফিরে গিয়ে সেখানে তারা আর শান্তিতে বাস করতে পারবে না। যারা ওরূপ নৃশংস অত্যাচার করতে পারে তাদের উপর হিন্দুরা কোনোদিন তাদের বিশ্বাস আনতে পারবে না। তার জন্য তাদের দেশে ফিরে যাওয়া উচিৎ হবে না। আর বেশির ভাগ হিন্দু চলে এসেছে। তাই কোনো ভয়ে ভীত না হয়েই

বৃহত্তর স্বার্থে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাতে হবে কেননা বাংলাদেশ স্বাধীন হলে পাকিস্তান দুর্বল হবে। সঙ্গে সঙ্গে ইসলমিক শক্তিও দুর্বল হবে। অন্য দিকে ক্যাম্পে ক্যাম্পে গোপন প্রচার চালাতে হবে যে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে হিন্দুরা ওই মুসলিম বাংলাদেশে আর ফিরে যাবে না। তারা স্বেচ্ছায় ফিরে না গেলে ভারত সরকারও তাদের জোড় করে তাড়াতে পারবে না। কেননা জাতিসংঘের ঘোষণামতো শরণার্থী হয়ে ভারতে সাময়িকভাবে বাস করার মৌলিক অধিকার তারা অর্জন করেছে। তারা হোমল্যান্ড গঠন করে স্বাধীনভাবে সেখানে গিয়ে বাস করবে। তাই বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে বক্তব্য তুলে ধরতে হবে। তার আগে পর্যন্ত অতি গোপনে প্রচার চালিয়ে ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। কেননা পূর্বের প্রস্তুতি না থাকলে সময়মতো সে দাবি তুলে ধরা যাবে না।

চিত্তবাবু এই দাবির পক্ষে মত দিলেন না। এই প্রথম আমার ও তার মধ্যে চিন্তার ভিন্নতা দেখা গেল। সুদীর্ঘ দিন ধরে আমরা একমত ও একপথে চলে আসছি। উভয়েই জাতির স্বার্থে অনেক ঝুঁকি মাথা পেতে নিয়েছি। এতদিন পরস্পরের প্রতি আমাদের বিশ্বাস অচল ও অটল ছিল। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে হোমল্যান্ড দাবি গণমুক্তি দলের ঘোষণাপত্রে ইঙ্গিতে বলা হয়েছে।

চিত্তবাবু ছিলেন আমার চেয়ে দুই এক বছরের বড় ও স্বীকৃত জনপ্রতিনিধি। তাই তাকে আমি বয়োজ্যেষ্ঠের সম্মান দিয়েছি শ্রদ্ধা জানিয়েছি। কলকাতা আসার আগে তাকে আমি উঁচুতে সম্মান দিলেও তিনি আমাকে সমসম্মান দিয়ে আসছেন এবং আমাদের সব কাজেই আমরা ছিলাম পরস্পরের পরিপূরক তথা সম মর্যাদাধারী। কিন্তু কলকাতা আসার পরেই বুঝতে পারলাম যে মর্যাদার কিছু উন্নতি অবনতি হয়েছে।

ঠুনকো মর্যাদার মতো ছোটখাট বিষয় নিয়ে তখন চিন্তা ভাবনার সময় ছিল না। তবে তার কথা পূর্বের কথা মনে করে কিছু সান্ত্বনা পাই। তিনি মানুষের মধ্যে বার বার বলতেন যে গাড়ি, বাড়ি, কড়ি, ফোন ও নারী যার থাকে তার সাধারণ মানুষের স্বার্থের পক্ষে বলার সুযোগ বা অধিকার থাকে না। তার পরিমাণ পর্যাপ্ত হলে ফল কি দাঁড়ায় তা নিজ চোখেই দেখলাম। সব কিছু হারিয়ে তখন আমি পথের ভিখারী তাঁর আশ্রিত আর পাঁচ জনের মতো আমিও একজন সাধারণ মানুষ। তাই নিজের ওজন বুঝে আমি খুব সংযতভাবে চিত্তবাবুকে বলেছিলাম, লক্ষ লক্ষ হিন্দু তারা কেউ তার আত্মীয় স্বজনকে হারিয়েছে, কেউ আহত হয়েছে। আর সবাই তাদের সর্বস্ব হারিয়ে এদেশে এসে আশ্রয় নিয়েছে ও দুর্বিষহ ক্যাম্প জীবন যাপন

করছে। ক্যাম্পে গিয়ে তাদের সঙ্গে আমাদের বাস করতে হবে। এই তেতলায় বসে শুধু আলোচনায় কোন কাজ হবে না। তেতলার কথা বলায় চিত্তবাবু কিছুটা অসন্তুষ্ট হন। তারপর আমাদের উভয়ের মধ্যে কিছু কথা কাটাকাটি হয়। তাতে আমরা উভয়ে কিছুটা উত্তেজিত হই। সেই উত্তেজনার মধ্যে আমি বৈঠক থেকে বেরিয়ে যাই। আমার সঙ্গে তার বংশেরই এক ভাই বিষ্ণু সূতার বেরিয়ে আসে। আমার বক্তব্যে অনেকে একমত হলেও তারা আমার সঙ্গে বেরিয়ে এল না। কিন্তু বৈঠকে পূর্ব আলোচনা চলল না। তবে কি ভাবে আমাদের ফিরিয়ে নেওয়া যায় সে আলোচনাই চলতে থাকল। শেষ পর্যন্ত যে কোনো উপায়ে আমাকে ফিরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হল।

চিত্তবাবুর বাড়ি থেকে বেড়িয়ে আমি সোজা সল্টলেকের ক্যাম্পে চলে যাই। সেখানে রাত কাটাই। ৩/৪ দিন ধরে বিভিন্ন ক্যাম্পে ঘুরে শারীরিক ও মানসিক দূর্বলতা অনুভব করি। তাই বিশ্রাম নিতে আমাদের বঁনগায়ের অফিসে আমি যাই। এই অফিস বাড়িটি বিরাট একটি দোতলা বাড়ি। ২৫ শে মার্চের আগেই আমাদের কাজের জন্য চিত্তবাবু এই বিরাট বাড়িটা ভাড়া নিয়েছিলেন। এই অফিসটি ছিল শ্রীনির্মল দাসের তত্ত্বাবধানে। স্বাধীন বাংলাদেশের নিশ্চয়তার কথা জেনে শ্রীদাস স্থায়ী শিক্ষকতার চাকরিতে পদত্যাগ করে ২৫ শে মার্চের আগে এসে এই অফিসের দায়িত্ব ভার নেন। তিনি পিরোজপুর টাউন হাইস্কুলের স্থায়ী বি.এস.সি. শিক্ষক ছিলেন। সেই অফিসে আমাদের কর্মীদের থাকা খাওয়ার ব্যাবস্থা ছিল। আর অফিসের প্রধান কাজ ছিল পূর্ববঙ্গের ভিতরের খবর আদান প্রদান করা ও ভারতের এবং বাংলাদেশের সীমান্তের উভয় পাশের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করা। পরে অবশ্য শরনার্থীদের সব রকমের সুযোগ সুবিধার আশু ব্যবস্থা করা। এভাবে আগরতলা অফিসের দায়িত্বে ছিলেন চিত্তবাবুর ভাগ্নে দিলীপ সরকার (ঘরামী)। তিনিও হাই স্কুলের শিক্ষকতা ত্যাগ করে নির্মল বাবুর সঙ্গে চলে আসেন। আর বাটনাতলা ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান পীযুষ সূতার তার চেয়ারম্যানের পদ ত্যাগ করে এই কাজের জন্য বনগাঁ সীমান্তের ধানেশ্বরপুরে ঘাটি গাড়েন। তিনি ছিলেন আমার স্কুলের সহপাঠি।

শরণার্থী কল্যাণ সমিতি

বনগাঁ অফিসে আমার পৌছানোর পরেই চিত্তবাবু সে খবর পেয়ে যান এবং আমাকে কলকাতা ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য অধ্যক্ষ বীরেন বিশ্বাস, মুকুন্দ সরকার ও ষড়ানন ঠাকুরকে বনগাঁ পাঠান। চিত্তবাবু নিজেও পত্র লিখে আমাকে কলকাতা যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। চিত্তবাবুর পত্র পেয়ে ■ তাদের অনুরোধে আমি

আবার চিত্তবাবুর বাড়িতে যাই। আগেই বলা হয়েছে আমরা দুজনে সম্পূর্ণভাবে পরস্পরের পরিপূরক ছিলাম। কাজেই আমি চলে আসার পরে নিজে যেমন দুর্বল হয়ে পড়ি চিত্তবাবুও সেরূপ দুর্বলতা অনুভব করেন। আর কর্মীদের সঙ্গে আমার বেশি যোগাযোগ ছিল। তাই কর্মীরা দুজনকে সঙ্গে না পেলে তারাও দুর্বলতা অনুভব করে।

আবার আমরা সবাই একত্রে বসি ও খোলা মনে আলোচনা শুরু করি। সেই আলোচনার সিদ্ধান্তমতো ওই দিনই 'বাংলাদেশ শরণার্থী কল্যাণ সমিতি' নামে একটি সংস্থা গড়ি। সবার অনুরোধে আমার অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমি তার কনভেনর হই। সংস্থাটি মানবিক হলেও হিন্দুদের পক্ষে আলাদাভাবে গোপনে কাজ করার জন্য সবাই প্রতিজ্ঞা করি। আমরা সবাই সে আলোচনায় একমত হই যে বাংলাদেশে আমরা আর ফিরে যাব না। আমরা সবাই আরও একমত হই যে বাংলাদেশে মুসলমানেরা স্বাধীনতা পাবে। কিন্তু হিন্দুরা প্রকৃত স্বাধীনতা পাবে না। হিন্দুদের সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য গোপনে প্রস্তুতি নিতে হবে। সেভাবে গোপনে প্রচার চালাতে হবে। তবে এ কর্মসূচীর কথা থাকবে সম্পূর্ণ গোপন। কেবল মাত্র বিশেষ বিশেষ পরীক্ষিত লোকের মধ্যে তা থাকবে সীমাবদ্ধ। আর সদর কর্মসূচী থাকবে ক্যাম্পে বা ক্যাম্পের বাইরের শরনার্থীর জন্য আশু রেশন কার্ড পাওয়ার ব্যাবস্থা করা। তাদের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করা। আর বিশেষ কাজ হবে ক্যাম্পে ক্যাম্পে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা। এই স্কুল গড়ার কাজকেই আমরা বেশি গুরুত্ব দিই।সেই সিদ্ধান্তমত ক্যাম্পে স্কুল গড়ার পরিকল্পনাটি ভারত সরকারের কাছে পেশ করি। সেই পরিকল্পনামত আমরা ভারত সরকারকে জানাই যে শরণার্থীদের এই ক্যাম্প জীবন কতদিন চলবে তা কেউ বলতে পারে না। তাই স্কুলে যাওয়ার যোগ্য ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্কুল একান্ত প্রয়োজন। স্কুলে প্রকৃত শিক্ষা কতটুকু দেবে সেদিকে না তাকালেও একথা মানতে হবে যে তারা দিনের একটা বিরাট সময়ব্যাপি আইন শৃঙ্খলার মধ্যেই থাকবে। তারজন্য পরে তারা উচ্ছৃঙ্খল বা সমাজবিরোধী হবার সুযোগ পাবে না। আর বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার শিক্ষক ও শিক্ষিত মানুষ এসে ক্যাম্পে অলস জীবন যাপন করছে। তারা ক্যাম্পে খাবার পেলেও তাদের সামনে কোন কাজ নেই। তাই সামান্য পারিশ্রমিক পেলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা শিক্ষকতা করতে এগিয়ে আসবে। ত্রিপল দিলে ও বাঁশ কেনার জন্য কিছু টাকা দিলে ক্যাম্পবাসীরাই তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য নিজেরা ঘর করে স্কুল বসাবে। তবে শিক্ষার্থী ছেলেমেয়েদের স্লেট-খাতা পেন্সিল বইপত্র সরকারকে দিতে হবে। শিক্ষকদের বসার জন্য চেয়ার টেবিল আর ছাত্রছাত্রীদের বসার ও ঘরের

ছাউনির জন্য ত্রিপল সরকারকেই দিতে হবে। এভাবে আনুমানিক খরচসহ একটি পূর্ণ পরিকল্পনা সরকারের কাছে পেশ করার পরে ভারত সরকার সঙ্গে সঙ্গে তার অনুমোদন দেয়। সরকারের আর্থিক অনুমোদন পেয়েই ক্যাম্পে স্কুল গড়তে আমাদের কর্মীরা কাজে নেমে পড়ে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ১৪০ টি প্রাইমারী স্কুল ও ৪টি হাইস্কুল তারা প্রতিষ্ঠা করে। তাতে অনেক অচেনা অজানা মানুষের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নতুনভাবে হয়।

এই সব মানুষদের মধ্যে অতি সিমিত কিছু ঘনিষ্ঠ চেতনাশীল মানুষের সামনে আমাদের কর্মীরা অতি গোপনে হোমল্যান্ডের প্রচার চালায়। অতি গোপনে তাদের কাছে বলা হয় যে একদল মানুষ হিন্দুদের জন্য হোমল্যান্ডের কথা বলছে কিন্তু এসব পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাতে অনেকেই সায় দেয় যে তা সম্পূর্ণ অসম্ভব ও সত্যিই তা পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু অনেকেই আবার উত্তরে বলেছে সেটাই খাঁটি পথ। তারা বলেছে যে বাংলাদেশ সরকার গঠন হলো তাতে কোনো হিন্দু মন্ত্রী তারা রাখল না। কোনো ক্যাম্পে কোনো মুসলমান নেই কিন্তু সব ক্যাম্পের কমান্ডার মুসলমান। শত শত ক্যাম্প কমান্ডারের মধ্যে একজনও কমান্ডার হিন্দু নেই। অথচ সব ক্যাম্প কমান্ডার মাসিক মাইনে পাচ্ছে। বাংলাদেশের সব মুসলমান কর্মচারী মাসিক মাইনে পাচ্ছে অথচ হিন্দুরা মাইনে পাচ্ছে না। মুক্তি ফৌজদের রিক্রুটিং অফিসার সব মুসলমান। কোনো হিন্দু অফিসার সেখানে নেই আর তারা বেছে বেছে কেবল মুসলমান ছেলেদের রিক্রুট করছে। হিন্দু ছেলেরা সে সুযোগ পাচ্ছে না। অধিকন্তু হাজার হাজার রেজাকার ওখানে হিন্দু বাড়ি লুঠ করার পরে তারা ভারতে ঢুকছে। ভারতে এসে তারা অস্ত্র শিক্ষা নিচ্ছে-আর অস্ত্রনিয়ে তারা দেশে যাবে। দেশ স্বাধীন হলেই তারা সে অস্ত্র আবার হিন্দুদের উপর চালাবে। তারা এখানকার সব খোঁজ খবর নিয়ে পাকিস্তানে খবর পাচার করছে ও সাবোটেজ করার সব সুযোগ তারা সহজে পাচ্ছে। আর ২৫ শে মার্চের পর যে নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছে তা ভোলা সম্ভব নয়। কাজেই হোমল্যান্ড ছাড়া হিন্দুরা সেখানে আর সুখে শান্তিতে বাস করতে পারবে না। এরূপ যুক্তি থাকতেও আমাদের দুর্বলতার জন্য কিছুটা দায়ী যেমন আমরা নিজেরা, তেমনি দায়ী ভারত সরকার ও ভারতবাসীর অচেতনতা ও অজ্ঞানতা। এই চেতনাহীনতার জন্যই বাংলাদেশ দেড়কোটি হিন্দুকে বিতাড়নের সাহস পায়। তারা ভারতে এসে সাধারণ মানুষের রুজিরোজগারে ভাগ বসিয়েছে। যার ফলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপর তারা চাপ সৃষ্টি করেছে, যাতে আইন শৃঙ্খলারও অবনতি ঘটেছে। তারপরেও ভারত সরকার ও তার জনগণের হুঁশ হচ্ছে না। যার শেষ পরিণতি একদিন হবে ভয়াবহ।

এইসব স্কুল গড়ার মধ্যে ছদ্মনামে বসিরহাট থেকে নদিয়ার বেতাই পর্যন্ত সীমান্তের সর্বত্র আমরা ছোটাছুটি করতে থাকি। আর অনেক দিন সীমান্তে আমাদের রাতও কাটাতে হয়েছে। ছদ্মনামে চলাফেরার প্রধান কারণ ছিল যে আমরা মনে করতাম যে পাকিস্তানি চরেরা তখন ভারতের সীমান্তে সর্বত্র ঢুকে পড়েছে। সুযোগ পেলেই তারা চিত্তবাবু ও আমাকে খতম করে বাংলাদেশে চলে যাবে। চিত্তবাবুর ছদ্মনাম ছিল সত্যব্রত রায় আমার নাম রতন রায়। এসব ভয় থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের ভিতরের দৈনন্দিন বাস্তব খবর নিতে আমরা সীমান্তে দৌড়াদৌড়ি করেছি। আর বাংলাদেশের ভিতরে হিন্দুদের উপর নৃশংস অত্যাচারের ভয়াবহ খবর শুনে আমরা বিচলিত হয়ে পড়ি। তার জন্য চিত্তবাবু ও আমি এক গোপন আলোচনায় বসি। সেই ভয়াবহ পরিস্থিতিকে কিভাবে মোকাবিলা করা যায় সেই পথের অনুসন্ধানই ছিল আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়। সেদিনের আলোচনায় দুটি পথের কথা আমরা চিন্তা করি। তার প্রথমটি হলো হিন্দু ছেলেদের আলাদাভাবে গোপনে ট্রেনিং এর ব্যাবস্থা করা। আর দ্বিতীয়টি হলো মুক্তি বাহিনী ছাড়াও আরও একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাহিনী গঠন করা। তারা একদিকে যেমন উন্নত ধরণের সামরিক শিক্ষা পাবে তেমন অন্যদিকে অসাম্প্রদায়িক হওয়ার জন্য তাদের বাস্তব শিক্ষা দিতে হবে। এই অসাম্প্রদায়িক বাহিনী বাংলাদেশের প্রকৃত সামরিক ক্ষমতা তাদের হাতে নেবে। বাংলাদেশকে তারাই চালাবে সাম্প্রদায়িক মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তি খর্ব করে। তাদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা যাতে যায় প্রথম থেকেই সেরকম ব্যাবস্থা নিতে হবে। তার ফলে সেখানে অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ থাকবে।

বৈঠকের শেষের দিকে চিত্তবাবু প্রস্তাব করেন. এই বাহিনীর নাম হবে মুজিব বাহিনী। সঙ্গে সঙ্গে আমি তার স্বীকৃতি জানাই। ওদিন আরও আলোচনা হয় সেই মুজিব বাহিনীর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব থাকবে উক্ত ৪ জন ছাত্রনেতার হাতে। ওদিন আমরা বিশেষ ভাবে আলোচনা করি যে প্রথমে সিরাজুল আলমের সম্মতি পেলেই প্রস্তাবটির পক্ষে ৪ ছাত্রনেতার সমর্থন পাওয়া সহজ হবে। কেননা শেখ মণি তার মামার নামের বাহিনীর বিরোধিতা কখনই করবেন না। মণি ও সিরাজুল-একমত হলে রেজ্জাক ও তোফায়েল কোনো বিরোধিতা করবে না। এই প্রস্তাবে সম্মতি আদায় করার দায়িত্ব চিত্তবাবু নিজেই নিলেন। চিত্তবাবু তাদের সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে আলোচনা শুরু করলেন। অন্যান্য কথা প্রসঙ্গের মধ্যে একেবারে গুরুত্বহীন ভাবে প্রথমেই সিরাজুল আলমের কাছে তিনি প্রসঙ্গটি তুললেন। সঙ্গে সঙ্গে সিরাজুল

আলম তা লুফে নেন। ভাবখানা এমন যে ওই প্রস্তাবই উত্তম কিন্তু ভারত সরকার কি তা মেনে নেবে? আর ভারত সরকার যদি মেনেই নেয় তবে ব্যাবস্থাটি হবে সম্পূর্ণ গোপনে। অবশ্য একটা বিশেষ সময়সীমা পর্যন্ত সে গোপনীয়তা থাকবে। চিত্তবাবুও একটু ঘোরা পথে আলাদাভাবে তাদের প্রত্যেককে জানিয়ে দেন যে ব্যাবস্থাটি তাদের পক্ষে একটি আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছুই না। শেষের দিকে চিত্তবাবুর পরোক্ষ নির্দেশ মতো সিরাজুল আলম খানের প্রস্তাবে সবাই সম্মতি জানায়।

এই প্রস্তাবটি গ্রহণের পরে ছাত্রনেতারা মনে করল ভারত সরকার প্রস্তাবটির অনুমোদন দিলে ও সেভাবে কাজ করলে বাংলাদেশের সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদের হাতেই যাবে। ফলে বাংলাদেশ সরকার তাদের মতের বাইরে কখনও যেতে পারবে না। আর আমাদের চিন্তা থাকল - দুই বাহিনীর অর্থাৎ মুজিব বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর মধ্যে রেষারেষি চলতে থাকবে। সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের সাথেও মতানৈক্য চলবে। হিন্দুবাহিনী গঠন করতে পারলে তারা হবে মধ্যশক্তি। তাদের কথা তখন শেষকথা। সিরাজুল আলমের কথামত তারা চিত্তবাবুকে জানিয়ে দেয় যে এই ট্রেনিং এর কথা সম্পূর্ণ গোপন রাখতে হবে। ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি কেউ তা জানতে পারবে না। আর জানতে পারবে শুধু ভারপ্রাপ্ত ট্রেনিং অফিসার। বাংলাদেশ সরকার ও তার সেনাবিভাগের কেউ তা জানতে পারবে না। বাংলাদেশের প্রধান সেনাপতিও নয়। এই প্রস্তাবটি পরের দিনই বিশেষ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির মাধ্যমে অতি গোপনে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে তার অনুমোদন দেন। তার পরেই জেনারেল উবানের অধীনে তাড়াতাড়ি মুজিব বাহিনীর গোপন ট্রেনিং শুরু হয়। খুব সম্ভব মে মাসের মাঝামাঝি সে ট্রেনিং শুরু হয়।

ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুজিব বাহিনীর সেনারা দলে দলে বাংলাদেশে গোপনে ঢুকতে থাকলেও একটি বিশেষ দলকে বিশেষ কারণে কলকাতায় রেখে দেওয়া হয়। কারণটির কথা পরে জানা যাবে। এ ভাবে বাংলাদেশের ভেতরে গোপনে ঢোকার সময় একটি দল হঠাৎ সজাগ বি.এস.এফ.-এর নজরে পড়ে। বি.এস.এফ.-এর জোয়ানরা তাদের চ্যালেঞ্জ করে। তখন বাধ্য হয়ে মুজিব বাহিনীর সেনারা সারেন্ডার করে। পরে একটি বিশেষ ফোন পেয়ে বি.এস.এফ.-এর জোয়ানরা তাদের বাংলাদেশের ভিতরে ঢুকতে সাহায্য করে সত্য কিন্তু ইতিমধ্যে ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে যায়। তাতে বাংলাদেশ সরকার ও তার প্রধান সেনাপতি ভীষণ চটে যান। চটে যান ভারতের পূর্বাঞ্চলের সেনা প্রধান জেনারেল আরোরাও। তারা মুজিব বাহিনীর প্রতি

কঠোর ব্যাবস্থা নিতে গিয়ে প্রত্যেকেই বুঝতে পারেলন যে মুজিব বাহিনীর খুঁটি বড় শক্ত। তা জেনে তারা প্রত্যেকেই সেই সেনাদের ক্ষমতা অটুট রেখেই মুজিব বাহিনীর সঙ্গে সমঝোতায় আসতে বাধ্য হন।

আমাদের পূর্বে আলোচিত ২টি পথের দ্বিতীয়টি তাড়াতাড়ি কার্যকরী হলেও প্রথম পথটির ব্যাবস্থার অনুমোদন পেতে অনেক দেরি হয়েছে। অনেক চেষ্টার পরে, দেরি হলেও শেষ পর্যন্ত অনুমোদন ভারত সরকারের কাছে পাওয়া গেল।

কর্ণেল ওসমানির সীমান্ত পরিক্রমা

বাংলাদেশের প্রধান সেনাপতি কর্ণেল ওসমানির গাইড হয়ে তার সঙ্গে সীমান্তের বিভিন্ন জায়গায় যাই। কেননা ভারতের সীমান্ত অঞ্চল ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। একবার বসিরহাটের দক্ষিণে তকিপুর যাই। সেখানে একটা স্কুলে মুক্তিবাহিনীর একটা ক্যাম্প ছিল। সেখানের ছেলেরা থাকা খাওয়ার অনেক অভিযোগ জানালো। আবার অনেকে তাড়াতাড়ি ট্রেনিং নিয়ে বাংলাদেশের ভিতরে ঢোকার তাগিদের কথাও বলল।

একবার হাসনাবাদ যাই। সেখানে একটি বড় লঞ্চে বসে সাতক্ষীরার সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল তার কমান্ড অফিস চালাতেন। সেই লঞ্চে তিনি বাসও করতেন। কর্ণেল ওসমানি ভিতরের একটি কামরায় ঢুকে প্রায় ১ ঘন্টা ধরে মেজর জলিলের সঙ্গে গোপন আলোচনা চালালেন। তার পর দুপুরের খাওয়া সেরে আমরা চলে আসি। তার একদিন পরে আবার আমরা হাসনাবাদ যাই। পথে কর্ণেল ওসমানি আমাকে জানান যে কেন তিনি আবার হাসনাবাদ যাচ্ছেন। তিনি বললেন — আগের দিন ইছামতি নদীর ওপারে খুলনার একটি নির্দিষ্ট জায়গায় অস্ত্রসস্ত্রসহ যুদ্ধসরঞ্জাম পৌছে দিতে নির্দেশ দিয়ে আসেন। সে নির্দেশ মত কাজ করার জন্য পরের দিন অস্ত্রসস্ত্র গোলাবারুদ সহ বিভিন্ন যুদ্ধসামগ্রী নিয়ে একটি লঞ্চ তার ওখানে সময় মত পৌছায়। তিনি ৩০/৪০ জন মুক্তি যোদ্ধা নিয়ে রাত্রে সে লঞ্চে ওঠেন। লঞ্চটি নাকি বাংলাদেশের ভিতরে কিছুদুর গেলেই দুদিক থেকে দুটি পাকিস্তানি গানবোট লঞ্চটিকে আক্রমণ করে। সঙ্গে সঙ্গে মেজর জলিল ও কিছু সংখ্যক মুক্তিসেনা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ও সাঁতার দিয়ে কূলে উঠেই অন্ধকারের মধ্যে পালিয়ে আসতে পারে। অন্যদের পরিণতির কথা মেজর জলিল কিছুই জানে না। একথা বিশেষ দূতের কাছে শুনেই তাঁর আবার হাসনাবাদ যাওয়া। সেদিনও প্রায় ১ ঘন্টা মেজর জলিলের সঙ্গে তার আলোচনা হয়। সেদিন কি আলোচনা হল তিনি তা আমাকে বলেননি। আর আমিও জানতে চাইনি।

কিছুদিন পরে জানতে পারি যে ভারত সরকার মেজর জলিলকে পাকিস্তানের সমর্থক মনে করে তার উপরে কড়া নজর রাখার সব ব্যাবস্থা করে। আর প্রায় অকেজো করেই তাকে রাখা হয়। সব জেনেও ভারত সরকার তার বিরুদ্ধে কোনো কড়া ব্যবস্থা নেয় নি, কেননা তাতে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে মেজর জলিল ভারত বিরোধী চরম বক্তব্য রাখতে শুরু করেন ও বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি হন। অবশ্য পরবর্তীকালে ভারত সরকার কর্ণেল ওসমানিকে পাকিস্তানের সমর্থক বলে চিহ্নিত করে। সে দলে বাংলাদেশের অনেক এম পি ও নেতা গোপনে যোগ দেয়। ভারত সরকার তাদের চিহ্নিত করলেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যাবস্থা নেয় নি।

একবার কর্ণেল ওসমানিকে খোজাডাঙার ওপারে সাতক্ষীরার ভোমরায় নিয়ে যাই। সেখানে একটা মুক্তি ফৌজের ক্যাম্প ছিল। সেখানে মুক্তিযোদ্ধারা প্রধান সেনাপতিকে পেয়ে খুসি হল। কিন্তু খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে তারা তাকে অভিযোগ জানাল। তারা সবাই বলল যে আধপেটা খেয়ে সেখানে তারা পাহাড়া দিচ্ছে। তারা তাদের প্রধান সেনাপতির কাছে অভিযোগ জানাল সাতক্ষীরার ব্যাঙ্ক লুট করে তারা ৬০,০০০০০ (ষাট লক্ষ) টাকা নেতাদের হাতে দিল। অথচ তারা সেখানে না খেয়ে থাকছে তা দেখতে কোনো নেতা আর সীমান্তে গেল না । এমনকি কোনো খোঁজ খবরও নিচ্ছে না।

এভাবে সীমান্তের অনেক বি এস এফ ক্যাম্পেও আমরা যাই। প্রথমে বসিরহাটে ও পরে বনগাঁ। সেখানে বি এস এফ জোয়ানরা তাদের সামরিক অভিবাদনসহ সম্মান দেখায় ও খুব ভালো খাবারের ব্যবস্থা করে।

গণমুক্তি বাহিনী

কল্যাণ সমিতির বিশেষ উপদেষ্টা ছিলেন ভারতের প্রাক্তন ডেপুটি মন্ত্রী অরুণ গুহ। তখন তার বয়স ৮০ বৎসরের কাছাকাছি। এই বয়সেও তিনি স্কুল গড়ার কাজে সব রকম সাহায্য করতেন। আমাদের সঙ্গে অনেক জায়গায় যেতেন। ভারত সরকারের নির্দেশ ছিল তার চাহিদামতো অর্থ ও গাড়ির যোগান তিনি পাবেন। তিনি কল্যাণ সমিতিকে সব রকম সাহায্য করলেও বাংলাদেশ সরকারের হিন্দুদের প্রতি বিমাতৃসুলভ ব্যবহার স্বচক্ষে দেখে ও সব জেনেও তিনি কখনও তাদের সমালোচনা করতেন না। আর হিন্দুদের জন্য আলাদাভাবে কিছু করার কথা তাকে

বললে তিনি দুর্বল হয়ে পড়তেন। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ায় তার ছিল আপ্রাণ প্রচেষ্টা।

এই অরুণবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আমাদের দুইজন কর্মী দিল্লি গিয়েছিল। সময়টা ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হওয়ার অনেক আগে। তখন তিনি দিল্লির একজন মন্ত্রী। বরিশালের বিখ্যাত উকিল ও এককালের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা শ্রী অবনী ঘোষের একখানা চিঠি নিয়ে সেই কর্মীরা তার সঙ্গে দেখা করতে যায়। অবনীবাবু সম্পর্কে তার দাদা হলেও অরুণবাবু তাকে বড় ভাইয়ের মত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন। অবণীবাবু পত্রে লিখেছিলেন যে পত্র বাহকেরা তার নির্দেশমত দিল্লি যাচ্ছে। একান্তে তাদের কথা শুনে তার জন্য উপদেশ ও যথাসাধ্য করার জন্য অবনীবাবু অনুরোধ জানান। অবনীবাবু আরও লিখলেন যে তারা কোনোদিন দিল্লি যায়নি, তাদের জন্য তাকে থাকা খাওয়া ও যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে হবে। চিঠিখানা পেয়ে অরুণবাবু সেদিন তাদের নিয়ে আলাদা ঘরে গেলেন। প্রাথমিক আলোচনার পরেই তারা তাকে জানাল যে কিছু দিনের মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হবে। তার জন্য তিনি কিভাবে সাহায্য করতে পারেন? আর বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তাতে হিন্দুদের বিশেষ কোনো লাভ হবে না। তাই ঐ সংগ্রামে হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার জন্য কিভাবে কি করা যায় সেজন্যও তার কাছে তারা উপদেশ চায়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা শুনেই তিনি অসম্ভব অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেন। তারপর হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার কথা শুনেই তিনি বেজায় চটে যান ও মন্তব্য করেন, অবনীদা একজন পাগল। তোমরাও পাগল। বাংলাদেশকে স্বাধীন করা কি সহজ কাজ যে চিন্তা করলেই দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে? এই মন্তব্য করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিছু সময় পরে আর্দালী এসে খবর দেয় যে বাবু আর আসবেন না। আপনাদের তিনি চলে যেতে বলেছেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পরেই সেই অরুণবাবু সেই বৃদ্ধ বয়সেও যুব সুলভ শক্তি নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পঞ্চমুখে তিনি আওয়ামি লীগের প্রশংসা করতেন। তার মুখে বার বার আওয়ামি লিগের প্রশংসা শুনে আমরা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি আর বলেছি, ভারতের মাটিতে মুখোশপরা আওয়ামি লিগকে আপনারা দেখছেন। পাকিস্তান হওয়ার পরে যুগ যুগ ধরে পাকিস্তানের মাটিতে ওদের সঙ্গে একত্রে বাস করে ওদের আমরা ভালোভাবে জেনেছি। বর্তমান বাংলাদেশ সরকারও আওয়ামি লিগ নেতাদের হিন্দু বিরোধী কার্যকলাপ ভারতের মাটিতে বসে চালাতে দেখেও আপনারা বুঝতে পারেন না। বুঝতে চান না স্বাধীনতার

পরে দেশে ফিরে গিয়ে তারা হিন্দুদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে? তাই হিন্দুদের ভবিষ্যৎ স্বার্থে ও হিন্দুদের বাঁচার জন্য তাদের জন্য আলাদা গোপনে সামরিক শিক্ষার ব্যাবস্থা আপনাকে করতে হবে। আপনি সে প্রস্তাব রাখলে ভারত সরকার হয়তো তা নাকচ করবে না। তা করতে তিনি রাজি হলেন না।

এভাবে বিভিন্ন জায়গায় ধরনা দিয়ে বার বার বিফল হলেও আমাদের চেষ্টা আমরা চালিয়ে যাই। শ্রী শক্তি সরকার, এম পি কে আমরা দেশরক্ষা মন্ত্রী জগজীবন রামের কাছেও পাঠাই। শক্তিবাবু ছিলেন শ্রী রামের একান্ত স্নেহের পাত্র। হিন্দু ছেলেদের আলাদাভাবে গোপনে ট্রেনিং এর প্রস্তাবটি শ্রীরাম সেদিন শক্তিবাবুর সঙ্গে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেন। সেই পরিবেশে প্রস্তাবের পক্ষের যুক্তিকে স্বীকার করে নেন ও প্রস্তাবটিকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি নাকচ করেন। তিনি শক্তিবাবুকে পরিষ্কারভাবে বলেন যে হিন্দুদের ভবিষ্যৎ রক্ষার জন্য এরূপ ব্যবস্থা নেওয়া একান্ত দরকার। আর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হয়েও তিনি তা পারছেন না বলে দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি শক্তিবাবুকে বলেন সিদ্ধান্তটি নিতে পারেন একমাত্র প্রধানমন্ত্রী। তিনি ছাড়া অন্য কারো হাতে কোনো ক্ষমতা নেই। প্রস্তাবটি নাকচ করলেও শ্রীরাম নাকি নম সমাজের বীরত্বের কথা বার বার উল্লেখ করে বলেছিলেন যে তারা ছিল মার্শাল শ্রেণীর মানুষ, হিন্দু সমাজের গর্ব। তারাই অতীতে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের রক্ষা করত। হিন্দুদের আলাদা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে পারলে তারাও সুযোগ পেলে ফিরে পেত তাদের হারানো অতীতের বলবীর্য।

এভাবে বার বার ব্যর্থ হলেও আমরা চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকি। আর দেরি হলেও বাংলাদেশ সরকার ও সেখানের নেতাদের বিমাতৃসুলভ ব্যাবহার দেখে ভারত সরকার ভালোভাবে বুঝতে পারে যে বাংলাদেশে হিন্দুদের ভবিষ্যৎ আরও করুণ হবে। তা বিশেষ করে বুঝতে পারেন ভারত সরকারের সেই বিদেশ সচিব নাথবাবু। তারই একান্ত প্রচেষ্টায় হিন্দু ছেলেদের আলাদাভাবে গোপন ট্রেনিং এর ব্যবস্থা হয়। সে ব্যবস্থামত সপ্তাহে ৬০০ জন ছেলে ট্রেনিং নিতে যাওয়া শুরু করে। এভাবে ২৫,০০ (পঁচিশ শত) জন যাওয়ার পরে তাদের পূর্ণ ট্রেনিং পাওয়ার আগে ভারত-পাক যুদ্ধ শুরু হয়। আর ট্রেনিংও বন্ধ হয়ে যায়। তবে সময় প্রায় আগত।

ট্রেনিং এর প্রস্তাবটি অনুমোদনের সঙ্গে সঙ্গে এ বাহিনীকে আমি গণমুক্তি বাহিনী নাম দিই। যেহেতু একটি গোপন বাহিনী সেহেতু নামও গোপন থাকলো। এখানে উল্লেখ করার বিশেষ প্রয়োজন আছে যে চিত্তবাবু আড়াল থেকে মুজিব বাহিনী চালানোর দায়িত্ব নেন। আমার উপর দায়িত্ব পড়ে সেই গণমুক্তি বাহিনীকে

আড়াল থেকে চালান। তবে মুজিব বাহিনী শেষ পর্যন্ত গোপনীয়তা ত্যাগ করে সদরে আসল কিন্তু গণমুক্তি বাহিনী সদরে আসার সুযোগ আর পেল না। কুম্ভকর্ণের ঘুমের মত সে ঘুমিয়ে পড়ল। সে ঘুম কবে ভাঙবে তা কেউ জানে না।

পাক-ভারত যুদ্ধের প্রস্তুতি ও যুদ্ধ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পরেই ভারত সরকার যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। তার জন্য সবদিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেই সে প্রস্তুতি চালাতে থাকে। ভারত সরকার ভালোভাবেই জানত, বাঙালি সুলভ সাময়িক আবেগের ফলে স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষিত হয়েছে। ইসলামিক মানসিকতা তারা সহজে ভুলতে পারে না। স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণা না করে মুজিবের অযৌক্তিক গ্রেফতার বরণ ভারত সরকারকে ভাবিয়ে তুলেছিল। তারা গোয়েন্দা মারফত জানতে পারে সে পর্দার আড়ালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ও অখন্ড পাকিস্তানের পক্ষে ষড়যন্ত্র ভারতের মাটিতে শুরু হয়েছে। তাতে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রী মোস্তাক আহমেদ ও তার সচিব মহবুল হক চাষী। আই. এস. আই. এর মাধ্যমে মুজিবের সঙ্গেও নাকি তাদের যোগাযোগ হয়েছে। মুজিবের সঙ্গে পাকিস্তানের বোঝাপড়ার খবর মুস্তাক বিশেষ বিশেষ নেতার কাছে জানায়। ফলে বেশ কিছু সংখ্যক নেতা মুস্তাকের পক্ষে এসে যায়। এমনকি বাংলাদেশের প্রধান সেনাপতি কর্ণেল ওসমানিও সে দলে নাম লেখায়। এসব খবর গোয়েন্দা মারফত পেয়েও ভারত তাদের বিরুদ্ধে কোনো কড়া ব্যবস্থা নেয়নি। কিন্তু পরে বাংলাদেশের স্বীকৃতির বক্তব্য জাতিসংঘে বলতে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের প্রতিনিধি হিসাবে মোস্তাকের নাম বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করার পরে ভারত সরকার তার পাশপোর্ট দেয়নি। তার জন্য তিনি সে দলের প্রধান তো দূরের কথা সাধারণ প্রতিনিধি হয়েও যেতে পারলেন না। ভারতের আশঙ্কা ছিল তিনি জাতিসংঘে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ও অখন্ড পাকিস্তানের পক্ষে বক্তব্য রেখে পাকিস্তানে চলে যাবেন। ভারতে আর ফিরবেন না। তাই শেষ মূহুর্তে লন্ডনের বাংলাদেশের অস্থায়ী হাই কমিশনার আবু সঈদ চৌধুরী বাংলাদেশ ডেলিগেট টিমের প্রধান হন ও বক্তব্য রাখেন। আর লেঃ জেঃ নিয়াজীর অস্ত্র সহ আত্মসমর্পণ কালে বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর নেতৃত্ব দেন কাদের সিদ্দিকী। কিন্তু বাংলাদেশের প্রধান সেনাপতি কর্ণেল ওসমানিকে ভারত সে সুযোগ দেয়নি।

১৯৭১ সালের অক্টোবরের দিকে পূর্ববঙ্গে সর্বত্র শান্তভাব ফিরে এল। সামরিক বাহিনীর হিংস্র রূপের পরিবর্তন ঘটল। কোর্ট কাছারি, অফিস আদালত হাট বাজার স্বাভাবিক ভাবে চলতে শুরু করল। পূর্ব পাকিস্তানের ভিতরে কোথাও

কোনো উত্তেজনা নেই। সেখানের জীবনধারা সাধারণভাবেই চলতে শুরু করল। মুক্তি ফৌজের কোনো নাম গন্ধ সেখানে ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের কোনো প্রশ্নই আসে না। সে তখন সম্পূর্ন শান্ত। আর পাকিস্তান সরকার বিদেশী সাংবাদিকদের পূর্ব পাকিস্তানের বাস্তব রূপের দৃশ্য দেখানোর জন্য ও তার প্রচারের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে থাকে। ভিতরের শান্ত ভাব দেখেই পাকিস্তান সেনাদের সীমান্তে পাঠাতে থাকল। ভিতরের সেনা একেবারে কমে গেল। তা দেখেই বাঘা সিদ্দিকী মধুপুর জঙ্গলের আশ্রয়স্থল থেকে বেরিয়ে নতুন করে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে। ভারতীয় প্রচার মাধ্যম তা ফলাও করে বিশেষ কারণে প্রচার করে। যাতে বাংলাদেশ সরকার ও তার জনগণের মনোবল অটুট থাকে। কিন্তু ভারতে চলছে তখন উত্তেজনা। ভারতে আশ্রিত এক ১ কোটি শরনার্থীর কান্না। কেউ তাদের আপন আত্মীয়কে পাখির মতো গুলি করে মারতে দেখেছে। কেউ নিজে আহত হয়েছে। পরিবারের অনেককে কেউ হারিয়েছে। তাদের সামনেই তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। তারপর সর্বস্ব হারিয়ে এখানে এসে ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের কান্নায় ভারতীয় রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংস্থা, ব্যক্তি মানুষ সবাই প্রতিকারের জন্য চিৎকার করে চলেছে। ভারতের সংবাদপত্র, সংবাদমাধ্যম বিশেষ করে আকাশবাণীর দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সমানে পাক সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন আকাশবাণীর প্রচারের মাধ্যমে।

সেই শান্ত পরিবেশ পূর্ববঙ্গে ফিরে এলেই ইয়াহিয়া ও ভুট্টো মুজিবকে বলেন যে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা সম্পূর্ণভাবে শান্ত। মুজিবও চারিদিকের খবর নিয়ে জানতে পারেন যে তাদের কথা সত্য। বিভিন্ন দেশের টি. ভি. দেখে সংবাদপত্র পড়ে ও রেডিও শুনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রকৃত অবস্থার খবর তিনি জানতে পেরেছিলেন। কেননা তার বন্দিত্ব ছিল সাজানো এবং এসব দেখাশোনার সম্পূর্ণ সুযোগ তার ছিল। আর ঢাকায় সীমিত প্রচার ছিল যে ছদ্মবেশে তিনি গোপনে ঢাকা গিয়েও সব দেখেছিলেন। জেনারেল ওসমানিও হয়তো তা জানতেন। তাই পূর্ব পাকিস্তানে সেই শান্ত অবস্থা দেখে এবং শুনে মুজিব বুঝেছিলেন যে স্বাধীন বাংলাদেশ হওয়ার কোনো আশঙ্কা আর নেই। তখন পূর্ব সিদ্ধান্ত মতো ইয়াহিয়া ও ভুট্টো পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য মুজিবকে অনুরোধ জানান। মুজিবও সেই প্রস্তাবে রাজি হন। আর মুজিবের মতানুসারেই পাকিস্তানের চিফ মার্শাল ল. অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ইয়াহিয়া খান ২৮ শে ডিসেম্বর ১৯৭১, ঢাকায় পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকেন। উক্ত অধিবেশনের আগে মুজিব জাতীয় পরিষদের নেতা নির্বাচিত হবেন ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী রূপে শপথ নেবেন। এই কথাই তাকে বলা হয় ২৮শে ডিসেম্বরের জাতীয় পরিষদের ঢাকার অধিবেশনে মুজিবের যোগদানের সংবাদে

পাকিস্তানের গোয়েন্দা শাখার (I.S.I) মাধ্যমে ঢাকা ও কলকাতায় অনেক আগে পৌঁছে যায়। কলিকাতায় আওয়ামি লীগের জাতীয় পরিষদের সদস্যরা যাতে বেশি সংখ্যক ঢাকায় ফিরে গিয়ে উক্ত অধিবেশনে যোগদান করেন তার জন্য গোপনে ব্যাপক প্রচেষ্টা শুরু হয়। কলিকাতায় বাংলাদেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র অনেক আগেই পররাষ্ট্র মন্ত্রী মুস্তাক আহমেদ ও তার সেক্রেটারি মাহবুল হক চাষীর নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল। তা আগেই বলা হয়েছে।

ভারত সরকারও তার গোয়েন্দা বাহিনীর মারফত সে খবর আগেই জেনেছিল। তার জন্য ঢাকায় পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকারের ইঙ্গিতে কলকাতায় থাকা সেই মুজিব বাহিনীর ছেলেরা জাতীয় পরিষদের সদস্যদের পাহাড়া দিতে শুরু করে ও রিভলভার দেখিয়ে হুমকি দেয়। ঢাকায় যাবার জন্য যারা চেষ্টা করবে তাদের গুলি করে মারা হবে। কারণ ভারত সরকার ভালোভাবেই বুঝেছিল যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার আগে মুজিব প্রধানমন্ত্রীর শপথ নেওয়ার পরে পাকিস্তান ভাঙার বা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। ফলে এক কোটি শরনার্থীর বোঝা ভারতকে চিরকাল বহন করতে হবে। ইয়াহিয়া খান, ভুট্টো বুঝেছিলেন ঢাকায় অধিবেশনের সফলতার পরে স্বাধীন বাংলাদেশ হওয়ারও কোনো আশঙ্কা আর থাকবে না। তখন কলকাতার অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীরা একে একে ধীরে ধীরে ক্ষমা চেয়ে পাকিস্তানে ফিরে যাবেন। পূর্ব পরিকল্পনা মত মুজিবও সবাইকে সাদরে ফিরিয়ে নেবেন। মৃত্যু হবে কলকাতায় গড়া বাংলাদেশ সরকারের। মুক্তি যোদ্ধারা তা দেখে সবাই দেশে ফিরে যাবে।

সেদিন ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত সরকার একটি কঠিন ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছিল। তাই আওয়ামি লিগের জাতীয় পরিষদের প্রতিটি সদস্যকে পাহাড়া দেওয়ার জন্য একদিকে মুজিব বাহিনীকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। অন্যদিকে ভারতের সর্বস্তরে গোয়েন্দা বিভাগকেও তাদের চলাফেরার প্রতি সতর্কভাবে বিশেষ দৃষ্টি রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। যাতে তারা কেউ ঢাকায় ফিরে যেতে না পারে। তাতেও নিশ্চিত না হয়ে বাস্তবমুখী কর্মসূচী নিতে বাংলাদেশ ও ভারত সরকার ৭ দফার একটি চুক্তিপত্র সই করে। সেই ৭ দফার সংক্ষিপ্ত রূপ হল :-

(ক) যারা মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছে, তারাই যোগ্যতানুসারে প্রশাসনে থেকে সরকার চালাবে। অন্যরা চাকরিচ্যুত হবে। দরকার হলে ভারতের অভিজ্ঞ কর্মচারিরা শূন্যপদ সাময়িক পূরণ করে বাংলাদেশকে সাহায্য করবে।

(খ) ভারত ও বাংলাদেশের সেনা মিলে যৌথ বাহিনী গঠিত হবে। তার প্রধান হবে ভারতীয় সেনা বাহিনীর প্রধান। তার নির্দেশে যুদ্ধ পরিচালিত হবে।

(গ) বাংলাদেশে কোনো সামরিক বাহিনী থাকবে না।

(ঘ) তার বদলে প্যারামিলিশিয়া থাকবে। দেশের শান্তিশৃঙ্খলার কাজে তারা সাহায্য করবে।

(ঙ) উভয় দেশে থাকবে খোলা বাজার তবে মাঝে মাঝে আলোচনার মাধ্যমে নীতি নির্ধারিত হবে।

(চ) ভারতের সেনা অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বাংলাদেশে থাকবে। তবে প্রতিবছর আলোচনার মাধ্যমে তাদের ধাপে ধাপে ফিরে আসার সময়কাল নির্দিষ্ট হবে।

(ছ) উভয় দেশের সরকারের পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত মতো একই পররাষ্ট্র নীতিতে চলবে।

এই চুক্তি সই করার পরেই শ্রীমতি গান্ধী যুদ্ধের ব্যাপক প্রস্তুতি নেন। ঢাকার জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের সফলতাকে বানচাল করতেই ৩রা ডিসেম্বর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। শেখ মণি, আমি, তোফায়েল, রেজ্জাক, সিরাজুল আলম খান সহ আরও অনেকে ১৯৭১ এর ৩রা ডিসেম্বর সন্ধ্যায় চিত্তবাবুর বাড়িতে একটি ঘরে বসে ইন্দিরা গান্ধীর কলকাতার বিগ্রেডের জনসভায় ঐ দিনের বক্তব্য ও অন্যান্য নানা বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনায় যখন ব্যস্ত তখন হঠাৎ অন্য একজন ঘরে ঢুকেই খবর দিল যে, ভারত-পাক যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশের ভিতর অনেক দূর পৌঁছে গেছে। তখন তার প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোফায়েল চিৎকার করে বলেছিল : " ভারতের সেনা বাংলাদেশের ভিতরে ঢুকবে তা তো আমরা চাইনি। আমরা যুদ্ধ করেই আমাদের দেশ দখল করব। তাতে যতদিন লাগে লাগুক। " একটু পরেই আবার তোফায়েল মন্তব্য করে, ভারতীয় সেনা সহজে আর ভারতে ফিরবে না।" আমার দিকে তাকিয়েই একটু অস্বস্তির ভাব দেখিয়ে তোফায়েল আরো বলেছিল : " দাদা কি বলেন" আমি কোন কথা না বলে গম্ভীর ভাব দেখিয়ে তাকে বোঝালাম তাতে তার মতো আমিও বিশেষ চিন্তিত। কিন্তু মনে মনে বলেছিলাম হাজার বছর ধরে যুদ্ধ করেও বাংলাদেশ বাহিনী কোনোদিনই বাংলাদেশ দখল করতে পারবে না। ভারত বাংলা চুক্তিমতো উভয় দেশের সেনা নিয়ে যৌথবাহিনী গঠিত হয়। তার নেতৃত্বে থাকেন ভারতের সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল মানেক স। তখন ভারতের সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন লেঃ জেঃ জে আরোরা। তার নেতৃত্বে ভারতীয় বাহিনী

তথা যৌথ বাহিনী উক্ত চুক্তির ভিত্তিতে বাংলাদেশে প্রবেশ করে ৩রা ডিসেম্বর। রক্তক্ষয়ী তুমুল যুদ্ধের পরে ২৮শে ডিসেম্বরের অনেক আগে ১৬ই ডিসেম্বর তারা বাংলাদেশ দখল করে। পূর্ব পাকিস্তানের সেনা প্রধান লে. জে. নিয়াজী, লে. জে. আরোরার কাছে অস্ত্র সহ আত্মসমর্পণ করেন। সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের সার্বভৌম ক্ষমতার দলিলটিও তুলে দেন লে. জে. আরোরার হাতে। অন্যান্য জেনারেল সহ ৯০ হাজার পাক সেনা বন্দি হয়। সেই আত্মসমর্পণ ও সার্বভৌম দলিলটি হস্তান্তরের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের রাষ্ট্রদূতেরা। বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্র, রেডিও টেলিভিশন সহ বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠানের এমন কি রেডক্রশের প্রতিনিধিরা! তাদের সামনে এই সার্বভৌম দলিলটি হস্তান্তরিত হল। সবাই তার সাক্ষী থাকলেন। কিন্তু ঐ দলিলটি ভারত সরকারের বাংলাদেশ সরকারকে ফিরিয়ে দেওয়ার কোনো খবর আজ পর্যন্ত জানা যায়নি। কাজেই বাংলাদেশের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রকৃত আইনে এখনও ভারতের হাতে। আর প্রাপ্ত সেই অধিকারেই সেদিনের বন্দি পাক সেনাদের ভারতের মাটিতে বিশেষ কারণে নিয়ে আসা হয়। আর সেই কারণটি হল মুজিবের ভাবী কর্মপন্থার প্রতি ভারতের সন্দেহ ছিল। উক্ত যৌথ বাহিনী ভেঙে দেওয়ার খবরও আজ পর্যন্ত প্রচারিত হয়নি। এমন কি সেই ৭ দফা চুক্তিও আজ পর্যন্ত কোনো সরকার এককভাবে বা যৌথভাবে নাকচ করেনি।

২৮শে ডিসেম্বরের জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের কথা ঢাকায় প্রচারিত হওয়ার পরেই ঢাকার মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মানুষ উক্ত অধিবেশনকে বানচাল করার জন্য গোপনে প্রচেষ্টা চালায়। পাকিস্তান গোয়েন্দা বিভাগ (I.S.I) তা টের পায়। তার জন্য তাদের নামও তালিকাভুক্ত করে। তাই বাংলাদেশ থেকে তাদের শেষ বিদায়কালে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পূজারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ও তাদের গুলি করে মারে। এভাবে শেষকালে সেইসব মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের ওপরে শেষ আঘাত হনে তারা পাকিস্তানে চলে যায়। এর আগে জ্ঞাতসারে কোনো উল্লেখযোগ্য মুসলমানের উপরে বিশেষ কোনো কারণ না থাকলে তারা আঘাত করেনিবললেই চলে। তাও হিন্দু বুদ্ধিজীবীর সংখ্যার অনুপাতে তাদের সংখ্যা ছিল অনেক কম। তবে এই মুসলিম হত্যালীলার খবরটি ভালো ভাবে খুব গুরুত্ব সহকারে প্রচারিত হয়েছে। বিশেষ করে ভারতের সংবাদ মাধ্যমে। কেননা মৃতদের প্রায় সবাই মুসলিম ছিলেন। সেখানে হিন্দু মরলে প্রচার হয় না। আর মরার স্বীকৃতি পায় না। পাক সেনারা কাফেরের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে ঝাপিয়ে পড়েছিল। মরল হিন্দুরা কিন্তু স্বীকৃতি পেল বাঙালিরূপে। হিন্দু রূপে নয়। অবশ্য তখনকার প্রচার ছিল সময়োপযোগী। কিন্তু পরবর্তীকালে তথ্যবহুল ইতিহাস প্রকাশিত হল না।

শরনার্থীদের ভবিষ্যত

ভারতে এক কোটি শরণার্থী তথা পূর্ববাংলার হিন্দুরা আশ্রয় নেওয়ার পরেই আমরা নিশ্চিত হয়েছিলাম যে বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই; তার জন্য পাক ভারত যুদ্ধের কথাও আমাদের মাথায় ছিল। তাই যুদ্ধের অনেক আগের থেকেই আমাদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে চিন্তাভাবনা শুরু করি ও তার প্রস্তুতি নিতেই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

ভারতে এসে মুক্তিযুদ্ধ চালাতে মুজিবের অনিচ্ছা প্রকাশ, তার অযৌক্তিক গ্রেফতারবরণ, মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে সেখানে ইসলামী জেহাদের রূপ দেখে ও ভারতের মাটিতে মুসলিম নেতাদের ব্যবহারে আমরা সিদ্ধান্ত নিই ভবিষ্যৎ নিশ্চিত না করে আমরা দেশে আর ফিরে যাব না। সেজন্য সন্তোষপুরে ডাঃ ঋষিকেশ মজুমদারের বাড়িতে, দমদম লক্ষ্মীনগর কলোনীর সন্তোষ মল্লিকের ভাইয়ের বাড়িতে, ঠাকুরনগর হাইস্কুলে, দমদম ক্যান্টনমেন্ট ডঃ কে. পি. রায়ের বাড়িতে, বনগাঁয় চাকদা রোডে একটা হাইস্কুলে, তিলজলা হাইস্কুলে, গোবরডাঙার সরকার পাড়ার একটি বাড়িতে, বগুলা বেতাই সহ বিভিন্ন জায়গায় সভা করে আমাদের দেশে ফিরে না যাওয়ার পক্ষে দাবি তুলতে তাদের কাছে অনুরোধ জানাই। অনুরোধ জানাই সেই সময়ের পশ্চিমবাংলার কংগ্রেসের একদা জেনারেল সেক্রেটারি গান্ধিজির ঘনিষ্ঠ সহকারি স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রী সুধীর ঘোষ ▪ জনসংঘের সভাপতি (পঃ বঙ্গ) শ্রী হরিপদ ভারতী, শ্রী পি আর ঠাকুর (প্রাক্তন মন্ত্রী), শক্তি সরকার, এম.পি., শ্রী মনীন্দ্র বিশ্বাস, প্রাক্তন এম. এল. এ., পশ্চিমবঙ্গ পরিষদের স্পীকার শ্রী অপূর্ব মজুমদার, মন্ত্রী শ্রী আনন্দ বিশ্বাস, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী অরুণ গুহ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতার কাছে। বাংলাদেশে আমাদের আবার ফিরে যাওয়ার বিপক্ষে সোচ্চার হতে তাদের অনুরোধ জানাই। তারা প্রত্যেকেই আমাদের আশ্বাস দেন ধর্মনিরপেক্ষ নীতিতে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ভারতের সাহায্যে। কাজেই সেখানে সাম্প্রদায়িক মনোভাব দেখাতে ও সেরূপ আচরণ করতে কেউ আর সাহস পাবে না। এভাবে তাদের কথায় আশ্বস্ত না হয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের পশ্চিমবঙ্গ শাখার বিশেষ কর্মকর্তা ডঃ সুজিত ধরের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তার নির্দেশে আর. এস. এস. নেতা শ্রী বংশীলাল শোনি ও শ্রী অজিত বিশ্বাস আমাদের নিয়ে মানিকতলার একটি বাড়িতে যান। সেখানে গিয়ে আমরা শ্রী ভাওরাজের সঙ্গে দেখা করি। তিনি ছিলেন আর এস এস প্রধান বালাসাহেব দেওরসের ভাই ও ভারতের পূর্বাঞ্চলের আর এস এস প্রধান।

আমাদের আশংকার কথা তাকে জানাই। আমাদের বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার বিপক্ষে যুক্তিপূর্ণ জোরালো দাবী ভারত সরকারকে জানাতে অনুরোধ করি। তিনি বলেছিলেন : " মুসলমানদের বিশ দাঁত ভেঙে গিয়েছে। সেখানে তারা আর হিন্দুদের উপরে অত্যাচার করার সাহস পাবে না। আপনারা নিশ্চিন্তে দেশে ফিরে যান।" পরে আমাদের অনুরোধে শ্রী শোনি ও শ্রী অজিত বিশ্বাসের প্রচেষ্টায় একটি সংস্থার মাধ্যমে শাঁখারীবাজারের সর্বহারা শাঁখারীদের জন্য ৬ লক্ষ টাকার শঙ্খ দানের ব্যবস্থা হয়। সেই শঙ্খ বিতরনের সভায় আমি ছিলাম সভাপতি আর মন্ত্রী কামরুজ্জমান নিজ হাতে সে শঙ্খ বিতরণ করেন। সেই শঙ্খ বিতরনের সভায় শ্রী শোনি ও শ্রী অজিত বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন।

এইভাবে চারিদিকে অনুরোধ জানানোর পরেও কোনো উল্লেখযোগ্য সাড়া না পেয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেরাই বসে আমরা সিদ্ধান্ত নিই, স্বাধীনতার সংগ্রাম আমাদের শেষ হয়নি; বাংলাদেশের হিন্দুদের অবস্থা পরে ভয়াবহ হবে। তার জন্যই অতীতের মতো ভবিষ্যতেও সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। আমাদের উল্লেখযোগ্য কর্মীদের সেখানে বাস করা উচিত হবে না। বিশেষ করে চিত্তবাবু ও আমার পক্ষে সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করা মোটেই উচিৎ হবে না। আর অতীত ইতিহাসকে চিরতরে মুছে ফেলতে মুজিব আমাদের দুজনকেই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পারেন। তার অনেক গোপন ইতিহাস আমাদের কাছে ধরা পড়ার ভয় তার মনে ছিল।

ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি, তাদের জেহাদি অতীত ইতিহাস, বিশেষ করে ভারতে তাদর শাসনকালের ইতিহাস, পাকিস্তানের পরিকল্পিত অনেক গুলি দাঙ্গা ও অত্যাচার, ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চের পরে পূর্ববঙ্গে ইসলামিক জেহাদের বাস্তব রূপ ও ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে যে হিন্দু বিরোধী আচার আচরণ অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের মুসলিম নেতারা দেখিয়েছেন তা নিয়ে সেদিন বিষদভাবে আলোচনা হয়। আলোচনান্তে সবাই অভিমত প্রকাশ করেন যে বাংলাদেশের হিন্দুরা সেখানে আর সুখে শান্তিতে বাস করতে পারবে না। তাই সেদিন ১৪ জন সদস্য একটি প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করি। প্রতিজ্ঞাপত্রে লেখা হয়. "আমরা আর স্থায়ীভাবে দেশে ফিরে যাব না। হিন্দুদের মুক্তির জন্য কাজ আর বাংলাদেশের ভিতরে বসে করা যাবে না। তাই এখানে বসেই পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের মুক্তির স্বার্থে কাজ করব।" সে শপথ পত্রে চিত্তবাবু ও তার স্ত্রী শ্রীমতি মঞ্জুশ্রী দেবীও সই করেন। যতদূর মনে পড়ে নীরদ মজুমদার, বীরেন বিশ্বাস , চিত্ত সুতার, মঞ্জুশ্রী সুতার, নারায়ন সুতার, ধীরেন মন্ডল, নির্মল দাস, ডাঃ কালিদাস বৈদ্য নগেন মন্ডল, বিপদ বিশ্বাস, কার্তিক

দেব, অধীর খান, দিলিপ সরকার (ঘরামী) ও চিত্ত হালদার তাতে সই করেণ। নিয়তির কি পরিহাস জন্মভূমিতে মৌলিক অধিকার নিয়ে মাথা খাড়া করে বাস করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে ■ জন বন্ধু কলকাতা থেকে দেশে ফিরে গিয়েছিলাম। ব্যাক্তিগতভাবে চার পাঁচবার সমূহ মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসেছি। সাময়িক জেলে গিয়েছি, ভগবানের আশীর্বাদে সেখানে বেঁচে গিয়েছি। জেল থেকে ফিরে এসেছি ও বার বার জেলে যাওয়ার সম্মুখীন হয়েছি। আর অন্য দুজন বার বার জেলে গিয়েছেন ও অনেকদিন ধরে কারার অন্তরালে তাদের থাকতে হয়েছে। এভাবে আমরা জীবনের ঝুঁকি নিয়েছি। তবুও দেশ ত্যাগ করিনি। কলকাতায় এসে সুন্দর জীবন যাপনের সুযোগ পেয়েও তা উপেক্ষা করেছি। কেননা আমাদের মাথায় ছিল পাকিস্তান ভেঙ্গে পূর্ববাংলাকে স্বাধীন করার সাধনা। আর সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়েই বুঝেছি যে সে সংগ্রামে হিন্দুরা স্বাধীনতা পাবে না, তা হবে মুসলিমদের স্বাধীনতা সংগ্রাম। সেই তিনজন সহ চোদ্দোজন শরণার্থী কর্মী ও নেতা সেদিন নতুন করে আবার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা নিই।

শ্রীমতি গান্ধীর কাছে স্মারকলিপি

এভাবে প্রতিজ্ঞার পরে আমরা বসে থাকি নি। তথাকথিত বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরণার্থী কল্যাণ সমিতির প্রচেষ্টায় পূর্ববঙ্গের নেতৃস্থানীয় হিন্দুদের কলকাতায় আয়রন সাইড রোডের রিলিফ কমিশনার শ্রী এ. কে. দত্ত চৌধুরি মহাশয়ের বাড়িতে একটি সভার আয়োজন করি। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মতো শ্রীমতি গান্ধীর কাছে একটি স্মারকলিপি পাঠানো হয়। তাতে নকাঠিত তথাকথিত বাংলাদেশে হিন্দুদের ভাবি করুণ পরিণতির কথা উল্লেখ করে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল। তা থেকে মুক্তির জন্য বিশেষ ব্যবস্থার কথাও তাতে বলা হয়েছিল। স্মারকলিপিটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন ক্ষীতীশ চন্দ্র রায় আই. এ. এস.। সেদিনের সেই স্মারকলিপিটির বিশেষ গুরুত্ব ছিল বা আছে মনে করেই তা পরিশিষ্টে দেওয়া হল।

সেদিনের স্মারকলিপিতে যে বক্তব্য আমরা প্রধানমন্ত্রী শ্রী মতি ইন্দিরা গান্ধীকে দিয়েছিলাম পরবর্তীকালে তা সবই বাস্তব সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের সেই দিনের সন্দেহ মতোই হিন্দুরা অত্যাচারিত হয়েই আবার দেশ ত্যাগ করতে শুরু করে। আমাদের কথামত সেইদিন জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে হিন্দুরা তাদের দেশে ফিরলে আজ জাতিসংঘকেই দেখতে হত। সেইদিন আমরা পরিষ্কার ভাবায় বলেছিলাম যে সেখান থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী তুলে আনার পরেই বাংলাদেশ আবার সামরিক শাসনের অধীন হবে এবং সেই সামরিক শাসকরা তাদের গদি

বাঁচাতে হিন্দু ও ভারত বিরোধী প্রচার চালাবে। তাদের গদিতে থাকার জন্য এসব প্রচেষ্টা তারা চালাবেই। স্মারকলিপির শেষের দিকে শ্রীমতি গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। তার সাক্ষাতেই হিন্দুদের সেখানে বাস করার জন্য হোম ল্যান্ড দাবির পরিকল্পনার কথাও বলা হত। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সাক্ষাতের অনুমতি আমরা সেদিন পাইনি। তবে স্মারকলিপিটি পড়লেই ভালোভাবে বোঝা যায় যে মুজিবের প্রতি আমাদের বিশ্বাস ছিল না। আমাদের ভবিষ্যত অন্ধকার জেনেই আমাদের এ হুঁশিয়ারী। কেননা মুজিবকে আমরা ভালোভাবে জানি।

ষড়যন্ত্র ব্যর্থ জেনেই মুজিবের শেষ চেষ্টা

মুজিবের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তিনি ছাড়া কেউ বাংলাদেশ স্বাধীন করতে পারবে না। আর তাজুদ্দিন মুজিবের মনের কথা বুঝতে পারেননি। যে ভাবাবেগে জিয়াউর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণা করেন, সেই ভাবাবেগেই তিনিও মুক্তি সংগ্রাম চালাবার জন্য ভারতের মদতে বাংলাদেশ সরকার গঠন করেন ও সাফল্যের সঙ্গে মুক্তি সংগ্রাম চালিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত ভারতের সাহায্যে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। ফলে মুজিবের নিজ হাতে গড়া সেই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বাসনা চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেল। অধিকন্তু পাকিস্তানের নাম গন্ধও আর বাংলাদেশে থাকলো না। তাতে মুজিব পুত্রশোকের মত দুঃখ পান। ভারত সরকার ও তাজুদ্দিনের বিরুদ্ধে তিনি চটে যান, কিন্তু চটে গেলেও তখন আর কিছু করার ছিল না। স্বাধীন বাংলাদেশকে নাকচ করার ক্ষমতাও তার হাতে ছিল না। তাই ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর সঙ্গে আলোচনা করে ভবিষ্যত কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি লন্ডনে যান। সেখানে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তিনি আলোচনা করেন ও ভাবী কর্মসূচী নিয়েই দেশে ফেরেন। আনুমানিক হলেও সম্ভাব্য কর্মসূচী নিয়ে একটু আলোচনার প্রয়োজন আছে। কেননা সেই সিদ্ধান্তমতোই মুজিব দেশে ফিরে কাজ করেছেন। কয়েকটা বিষয়ে তারা তিনজনই একমত পোষণ করেছিলেন যে ভারতীয় সেনা বাংলাদেশ থেকে সহজে ভারতে আর ফিরে যাবে না। ভারতীয় সেনা বেশিদিন বাংলাদেশে থাকবে। তার জন্য মুজিবকে ঢাকার মাটিতে পা দিয়েই ভারতের সেনাদের ভারতে ফিরে যাওয়ার ও ভারতের মাটিতে বন্দি পাক সেনাদের পাকিস্তানে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা নিতে হবে।

তারা বুঝেছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বাংলাদেশকে স্বাধীন রাখা যাবে না। ইসলামিক সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেই বাংলাদেশকে স্বাধীন রাখা যাবে। কেননা ইসলামিক জাতীয়তাবাদের ভিতের ওপর ঐ সীমারেখা দাঁড়িয়ে

আছে। ইসলামিক প্রচার বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রচারে তথা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বন্যায় দেশ ভাগের সীমারেখা ধুয়ে মুছে যাবে। তাই মুজিবের ঢাকায় নামার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম শব্দটি উচ্চারণ করতে হবে। ভারতীয় সেনাদের তাড়াতাড়ি ভারতে পাঠাবার তাগিদও দিতে হবে। আর পরবর্তীকালে সেখানে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও রক্তাক্ত বিপ্লবের ইতিহাস ধুয়ে মুছে ফেলতে বাংলাদেশকে পাকিস্তানের সাকৃসেসর সরকার রূপে ঘোষণা করতে হবে। ইসলামিক ভাবধারায় শিক্ষিত ও উদ্বুদ্ধ পাক সেনাবাহিনীর সমস্ত বাঙালি সেনাদের বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করে ও ইসলামিক জেহাদিদের মুক্তি দিয়ে ইসলামিক প্রচারকে জোরদার করলেই বাংলাদেশ আলাদা ভাবে স্বাধীন থাকতে পারবে। আর বাংলাদেশকে পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে আবার আনতে সবার চেষ্টা চালাতে হবে। এই সব বিষয় একমত হয়েই মুজিব ইসলামাবাদ থেকে লন্ডন যান। সেখান থেকে ব্রিটিশ বিমানে অল্প সময়ের জন্য লৌকিকতা দেখাতে দিল্লি হয়ে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার মাটিতে পা দেন। লন্ডন থেকে ব্রিটিশ বিমানে মুজিব সোজা ভারতে আসেন।

মুজিবের ঢাকা গমন

দিল্লিতে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি মুজিবকে ব্রিটিশ বিমান ত্যাগ করে ভারতীয় বিমানে ঢাকা যাওয়ার অনুরোধ জানান। শ্রীমতী গান্ধীর যুক্তি ছিল যেহেতু ব্রিটিশ সরকার তখনো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি সেহেতু তার বিমানে মুজিবের ঢাকা যাওয়া উচিত হবে না। মুজিব সে প্রস্তাব নাকচ করেন ও ব্রিটিশ বিমানে ঢাকা যান। ঢাকার মাটিতে পা দিয়েই ঘোষণা করলেন যে, বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। কিছুদিন পরে তিনি আরও ঘোষণা করেন যে ভারতের সেনা এক মাসের ভিতরেই ভারতের মাটিতে বাংলাদেশ ছেড়ে ফিরে যাবে। এই শেষের ঘোষণার সুরটি ছিল একটু চড়া তা যেন অনেকটা হুকুমের সুর। পাকিস্তানে বসে ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর সঙ্গে আলোচনা করে যে সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছিলেন সেই মতোই বিমান বন্দরে নেমে তার ইঙ্গিত দিলেন।

এই ঘোষণার পরেই সেখানের সজাগ ও চিন্তাশীল হিন্দুরা চমকে উঠলেন। চিন্তাশীল মুসলিমরাও অবাক হয়ে গেলেন আর সেখানের মৌলবাদীদের মনে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল। মুজিবের বক্তব্যটি সম্পূর্ণভাবে তার মনের ইসলাম প্রীতির আভাস দেয়। ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের প্রথম ভাষণে তার ইসলাম প্রীতির আভাসকে অনেকে অপ্রাসঙ্গিক মনে করলেও তিনি ইচ্ছা করেই

ইসলাম প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। পাকিস্তান থেকে ফিরে আসার সময় তিনি সে পাঠ নিয়ে এসেছেন। ইসলাম নামের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মুসলমানদের কান খাড়া হয়ে যায়। ইসলামিক একাত্মবোধের কথা তাদের মনে জাগে। এই ইসলামিক চেতনার কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার কিছুদিন পরই ভারতের সেনাদের তাদের দেশে ফিরে যাওয়ার ঘোষণা দিলেন অথচ পূর্বের ৭ দফা চুক্তির ভিত্তিতে ভারতীয় সেনার বাংলাদেশে থাকার অধিকার তখন ছিল।

পূর্ব চুক্তিমতে। দুটি বন্ধু রাষ্টের মধ্যে আলোচনা করে যে বিষয় সিদ্ধান্ত নিতে হবে সে বিষয়ে ভারত সরকারকে কিছু না জানিয়ে এককভাবে তিনি ঘোষণা করলেন, তাও অনেকটা হুমকির মতোই শোনা গেল। এই দুটি ঘোষণার পরেই মুজিবদের মূল যৌথ পরিকল্পনা যা রূপায়নে ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর আলোচনা শুরু হয়েছিল মুক্তি যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই, যুদ্ধকালে ইসলামাবাদে বসে সে আলোচনা চলছে। পাক ভারত যুদ্ধের পরেও সে আলোচনা চলে। তারপর দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তার বক্তব্যে সে পরিকল্পনার কথা সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। তাদের মূল পরিকল্পনা হল ইসলামিক সংস্কৃতিকে বাঁচাতে বাংলাদেশকে ও পাকিস্তানকে বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে হবে। যাতে পরবর্তীকালে সহজে এই উভয়রাষ্ট্র আবার একই কাঠামোর মধ্যে আসতে পারে। এভাবে ইসলামকে তিনি বাঁচালেন বটে, কিন্তু ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব রেখে ইসলাম বাঁচানো যাবে না জেনেই ভারতের সঙ্গে সংঘাতের ইঙ্গিত তিনি দিলেন। কোরানের নির্দেশ ও জেহাদকে বাদ দিয়ে মুসলিম থাকা যায় না। ভারতের সেনা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রত্যাহার না করলে তিনি ভারত বিরোধী প্রচার শুরু করবেন। পাকিস্তান সহ বিভিন্ন দেশের বিশেষ করে ইসলামিক দেশের বিজ্ঞ নেতৃত্বের মদত পেয়ে বিশেষ শক্তিশালী হয়েই এই ঘোষণা করতে সাহস পেয়েছিলেন।

মুজিবের ভারতীয় সেনা প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে মুজিবের ঘোষণার পর আমি শ্রী পি. এন. ব্যানার্জীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ব্যাপারটি কেমন হল? তিনি সংক্ষেপে জবাব দিয়েছিলেন, বাঙালিদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া তা আর কিছুই না। তার জন্য বাঙালিদের পরে ভুগতে হবে। তিনি একটি বিশেষ মন্তব্য করেছিলেন ত এখন প্রকাশ করা যায় না। এই সেনা ফেরত পাঠানোই শুধু নয় দেশে ফিরেই দু দেশের মধ্যে যুদ্ধপূর্ব ৭ দফার বাংলা-ভারত চুক্তিটিও তিনি অকেজো করে রাখলেন

ইংল্যান্ড, আমেরিকা, চীন এমনকি রাশিয়াও হয়তো তাকে শক্ত হাতে মদত দিয়েছিল। ইংল্যান্ড তার নিজের হাতে গড়া পাকিস্তানের বিভাজনে সুখী হতে পারেনি

আমেরিকা এতদিন পাকিস্তানকে সমর্থন করে এসেছে। সেই পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ হওয়ার ফলে ভারতীয় শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় আমেরিকাও খুশি হতে পারেনি। আর রাশিয়ার তীক্ষ্ণনজর ছিল — ভারতের সঙ্গে বন্ধুভাবে চললেও এই দেশটিতে এককভাবে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার দিকে। কারণ দেশভাগের সময় তাদের নির্দেশেই ভারতের কমুনিষ্ট পার্টি দেশভাগকে সমর্থন করেছিল। চীনও ভারতের শক্তি দেখে বিচলিত হয়েছিল। তার পরেও প্রতিটি শক্তিশালী দেশ চেয়েছিল বাংলাদেশের নতুন বাজারটি তাদের হাতে রাখতে। তাই দেশে ফেরার আগেই লণ্ডনে তাদের সঙ্গে মুজিবের আলাদা আলাদা কথাবার্তা হয়। এবং প্রত্যেকেই মুজিবকে শক্ত মনোভাব নেওয়ার পরামর্শ দেয়। বাংলাদেশের মঙ্গলের চেয়েও ভারতকে নাকাল করার প্রচেষ্টাই তাদের প্রবল ছিল।

মা, তার প্রাণের প্রিয়তম সন্তানকে রাগের মাথায় বার বার তার মৃত্যুর কথা চিৎকার করে বললেও কোনো মা তার ছেলের মৃত্যু মনেপ্রাণে কামনা করে না। ঐ মায়ের উপরে ছেলের নিষ্ঠুর ব্যবহারেও কোনো সময় সে তার ছেলের মৃত্যু চায় না। মা সব সময়ই মৃত্যুর হাত থেকে তার সন্তানকে বাঁচতে চেষ্টা করে। শেখ মুজিবও যখন দেখতে পেলেন তার নিজ হাতে গড়া পাকিস্তান ভেঙে যাচ্ছে বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাকিস্তানের নাম গন্ধ মুছ যাচ্ছে, নিষ্ঠুর ছেলের মৃত্যুকালে যেমন মায়ের প্রাণ কেঁদে ওঠে এবং তাকে বাঁচাতে ঐ মা আপ্রাণ চেষ্টা করে, মুজিবের প্রাণও পাকিস্তান ভাঙার শোকে কেঁদে উঠেছিল , আর সেই পাকিস্তানকে বাঁচাতে শেষ মুহূর্তে তিনি আপ্রাণ চেষ্টাও করেছেন। আর পাকিস্তান ভাঙার কথা তিনি নিজের মুখে মানুষের সামনে কোনোদিন উচ্চারণও করেননি। জাতীয় পরিষদে আশাতীত অধিক সংখ্যক সিট পেয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার লোভে যখন তিনি পাগল হয়েছেন তখন জনগণ আরও পাগল হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের শ্লোগান দিতে থাকল। স্বাধীন বাংলাদেশের কথা তিনি কোথাও না বললেও অন্যান্য নেতারা ও ছাত্র যুবকের দল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রচার চালায় চারিদিকে। তার ফলে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষ মুহূর্তে তা স্বাধীনতার আন্দোলনের রূপ নিল। তিনি নাটকের অভিনয় করেছেন। তাজুদ্দিন তার মনের কথা বুঝতে না পেরেই ভারতের সাহায্যে বাংলাদেশকে স্বাধীন করলেন। তাই মুজিবের সব রাগ তাজুদ্দিন ও ভারত সরকারের উপর পড়ল। ভারতের বিরুদ্ধে সরাসরি কিছু করার ক্ষমতা না থাকলেও আকারে ইঙ্গিতে তা তিনি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাজুদ্দিনকে তিনি রেহাই দিলেন না। পাকিস্তান ভাঙার উপযুক্ত শাস্তি দিতেই কিছুদিন পরে মন্ত্রিসভা থেকে তাজুদ্দিনকে তাড়িয়ে দিলেন। যে তাজুদ্দিন ছিলেন ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একমাত্র নির্ভর

ও বিশ্বাসযোগ্য যোগসূত্র, যে প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিনের সুদক্ষ পরিচালনায় বাংলাদেশ স্বাধীন হলো, যে প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিনের কথায় ১৭ হাজার ভারতীয় জোয়ান জীবন দিল, যার কথায় ভারত ১ কোটি মানুষকে অশ্রয় দিল, এদের খাওয়ালো আর বিশ্বযুদ্ধের হুমকি মাথায় রেখে ভারত যার কথায় যুদ্ধে নামল, তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোনো অভিযোগ না তুলে কেন মুজিব তাকে মন্ত্রিসভা থেকে কুকুরের মত তাড়িয়ে দিলেন? অথচ পাকিস্তানকে অটুট রাখতে কলকাতায় বসে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে মোস্তাক আহমেদ ষড়যন্ত্র চালান তার কোনো শাস্তির ব্যবস্থা না করে বরং তাকে মুজিব মন্ত্রিসভায় রাখলেন।

এই কারণ খুঁজতে হলে পর্দার আড়ালে অভিনীত নাটক সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান রাখতে হবে। যারা একদিন মুজিবের নেতৃত্বে কলকাতার (মুজিব বন্ধুরা) মহা দাঙ্গায় নেমেছিল, তারা যখন সার্কাস এভিনিউ কে মুজিব এভিনিউ করার জোরালো দাবী জানাচ্ছিলেন, তখন মুজিব ঢাকার রমনা মাঠে তাজুদ্দিন নির্মিত পাকাপোক্ত ও স্থায়ী যে ইন্দিরা মঞ্চটি যা যুগ যুগ ধরে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস, ভারতের জনগণ তার প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি গান্ধীর অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দিত, সেই পাকাপোক্ত স্মারক মঞ্চটি ভাঙার আদেশ কেন দিলেন? তার নিগূঢ় রহস্যের কথাও তাদের জানতে হবে। কেননা তা ছিল ভারত তথা হিন্দুর কাছে মুসলমানের পরাজয়ের স্মারক স্মৃতি।

যে প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন ঢাকা পৌছে দেশে দেশে প্রতিনিধি পাঠিয়ে মুজিবের মুক্তির জন্য প্রবল আন্তর্জাতিক চাপের সৃষ্টি করে মুজিবকে দেশে ফেরাবার ব্যবস্থা করলেন, যে প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন সস্বাধীনতা সংগ্রামে কোনো ভূমিকা না নেওয়া সত্ত্বেও মুজিবকে বাংলাদেশের প্রেসিডন্ট করে রামভক্ত ভরতের মতো বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চালিয়েছছিলেন (অবশ্য সে সময় তার দরকার বিশেষভাবে ছিল। কেননা আবেগী বাঙালিরা তাকেভুল বুঝতে সুযোগ পায়নি।) শেখ মুজিবুর রহমান কেন তাকে বিনা দোষে মন্ত্রিসভা থেকে তাড়ালেন সে কথা গভীরভাবে সবাইকে ভাবতে হবে এবং পর্যালোচনা করতে হবে। আর দরকার হলে বিশেষ গবেষণারও প্রয়োজন আছে। শোনা যায় মুজিবের একক ইচ্ছায় (Law Continuation order of ১৯৭১)ঘোষিত হয়। যার বলে বাংলাদেশ পাকিস্তানের সাকসেসর সরকার হল তাতেও নাকি তাজুদ্দিন চরমভাবে বাধা দিয়েছিল। আর পাকিস্তান ভাঙার জন্য রাগ তার ওপরে তো ছিলই। তাজুদ্দিন পাকিস্তানকে ভেঙে ইসলামের প্রতি আঘাত দিয়েছেন, তাই তাকে মুজিব ক্ষমা করতে পারেননি। সেদিন ইসলামিক জাতীয়তাবাদ ভুলে তাজুদ্দিন বাঙালি জাতীয়তাবাদী হতে পেরেছিলেন। কিন্তু মুজিব ইসলামিক

জাতীয়তাবাদ ভুলতে পারেননি আর বাঙালি জাতীয়তাবাদকে মনেপ্রাণে স্বীকার করতে পারেননি। তাই ৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আলজিয়ার্সে গিয়ে মুজিব ঘোষণা করেন,-বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিলেও সভাবতঃ আরব আমাদের ভাই। সেমতে পাকিস্তানও ভাই হওয়ার কথা, কিন্তু সেদিনের পরিবেশে সে কথা বলা মুজিবের প্রক্ষে সম্ভব ছিল না।

মুজিবের ইসলাম প্রীতি

প্রচারের দিকে না তাকিয়ে মুজিবের কার্যাবলীর বিচার করেই দেখা যায় মুজিব তার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ইসলামিক পথেই চলেছেন। হিন্দু ভোট পাওয়ার জন্য তার লোক দেখানো রাজনৈতিক বক্তব্য দেখে সাধারণ মানুষ ভুলতে পারে কিন্তু বিচক্ষণেরা তা ভুলতে পারে না। তার সংস্কৃতিতে যখন আঘাত পড়েছে তখনই তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছেন। এই সংস্কৃতির জন্যই গুরু গোবিন্দ সিং হাসি মুখে জীবন দিতে পেরেছেন। অতীতে বিশ্বের মহান দার্শনিক সক্রেটিস তার জীবন দিয়েও বিশ্বাস ও বক্তব্য ঠিক রেখেছেন। আর মহীয়সী তসলিমা নাসরিনও তার জন্মভূমি ছেড়ে বিদেশে বাস করছেন।

মুজিবের ইসলামিক সংস্কৃতি মনেপ্রাণে গাঁথা ছিল। আর সেই ইসলামিক প্রীতির জন্যই খুনি রাজাকার, আলবদর, আল সামস ও আনছারদের খুনি জেনেও তাদের শাস্তি না দিয়ে বিনা বিচারে ঢালাও ভাবে মুক্তি দিলেন। এরাই হিন্দুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পরে ইসলামিক জেহাদ ঘোষণা করে লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে খুন করেছেণ। তাদের বাড়ি ঘর লুঠ করে তা জ্বালিয়ে দিয়েছে। হিন্দু মা বোনদের ওপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে। পাক সেনাবাহিনীকে পথ দেখিয়েছে। তাদের সব রকমের সাহায্য করেছে। এই জেহাদ ঘোষণার দ্বারা প্রমাণ করেছে, তারাই ইসলামের খাঁটি জেহাদী সেনা। তাই মুজিব ভালোভাবেই বুঝেছিলেন সেই পরীক্ষিত খাঁটি জেহাদি মুসলিম সেনার দলই বাংলাদেশকে ইসলামিক রাখতে পারবে। ইসলাম পন্থী মুজিব জেহাদি মুসলমানদের শাস্তি দিতে পারেন না। এইভাবে একদিকে ইসলাম প্রীতি ও অন্যদিকে ভারতভীতি তাকে আচ্ছন্ন করেছিল। ন্যূনতম সৌজন্য, কৃতজ্ঞতা ও দায়িত্ববোধ তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তার উচিত ছিল ঢাকা পৌছবার পরেই দিল্লি গিয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট রূপে স্ব-পরিবারে তাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কারণ শ্রীমতি গান্ধীর বিশেষ নির্দেশে একজন জেনারেল মুজিব পরিবারকে রক্ষার জন্য নিযুক্ত হন। তাই ভারতীয় বাহিনী ঢাকা পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে তার অধীনের বাহিনী নিয়ে সেই জেনারেল মুজিবের বাড়ির পাহাড়ার

দায়িত্ব নেন ও পরিবারের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। একথা সেই জেনারেল মুজিবের স্ত্রীকে বলেছিলেন। আরও বলেছিলেন যে বিদায়কালে মুজিব পরিবারের উপর পাক আর্মি চরম আঘাত হানতে পারে। সে আশঙ্কা শ্রীমতি গান্ধির ছিল। বিদায়কালে পাক বাহিনী বাঙালি বুদ্ধিজীবিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেও মুজিব পরিবারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেনি। তবে স্ব-পরিবারে সৌজন্য দেখাতে দিল্লি না গেলেও ঢাকা পা দেওয়ার পরেই তিনি ছুটে যান ঢাকার কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে বন্দি পাক আর্মির বাঙালি সেনাদের দুরবস্থা দেখতে আর বন্দিত্ব থেকে তাদের আশু মুক্তির আশ্বাস দিতে।

দেশে ফেরার অল্প কিছুদিন পরেই ভাসানীর সঙ্গে মুজিবের এক গোপন বৈঠক হয়। তাতে দুজনে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন যে দেশে ইসলামিক প্রচার জোরদার করতে হবে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ দ্বারা বাংলাদেশকে স্বাধীন রাখা যাবে না। সেই সিদ্ধান্ত মতো ইসলামিক প্রচার, তার সাথে ভারত বিরোধী তথা হিন্দু বিরোধী প্রচারের জন্য কোটি কোটি টাকা ভাসানীর হাতে দিয়ে তাকে প্রচারে নামালেন। এই টাকা পাকিস্তান ও তৈল সমৃদ্ধ ইসলামিক দেশগুলি পূর্ব সিদ্ধান্ত মতো দিতে থাকে। ভাসানী সেই টাকা পেয়ে উক্ত পরীক্ষিত সদ্য জেল মুক্ত জেহাদি সেনাদের নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে নতুন করে জেহাদ ঘোষণা করে প্রচারে নামেন। অন্যদিকে একইভাবে মুজিবের হিন্দু বিরোধী সরকারী কাজও চলতে থাকে । সেইসব ক্রিমিনালদের মুক্তি দিয়েও তিনি থামেননি। নব্বই হাজার যুদ্ধ অপরাধীদের (Prisoners of War) মুক্তি দিতেও তিনি শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধিকে অনুরোধ করেছিলেন। এই P.O.W দের থাকার কথা বাংলাদেশের বন্দী ক্যাম্পে কেননা যুদ্ধ হয়েছিল বাংলাদেশের মাটিতে বাংলাদেশের বিপ্লবী সরকারের সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের। ভারত এ যুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারকে সাহায্য করেছে মাত্র। বিচারের ক্ষমতা বাংলাদেশের হাতে ছিল। কিন্তু ভারত বিশেষ কারণে P.O.W দের বাংলাদেশের মাটিতে না রেখে ভারতের মধ্যে নিয়ে আসে। আর আন্তর্জাতিক নিয়ম মত তাদের থাকা খাওয়া সহ সবরকমের দায়দায়িত্ব সাময়িকভাবে নেয়। মুজিবের অনুরোধ তাদের সবাইকে বিনা বিচারে মুক্তি দিতে হবে। ভারত তার অনুরোধ না রাখলে তিনি নিশ্চয় তাদের মুক্তি দিতে নয়তো বিচারের জন্য বাংলাদেশে ফেরত পাঠাবার জোরালো দাবি জানাতেন। শেষ পর্যন্ত ভারত তাদের বিনা বিচারেই মুক্তি দিতে বাধ্য হত নয়তো বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে হত। কারণ ভারতের হাতে বিচারের ক্ষমতা ছিল না। তা ছিল বাংলাদেশ সরকারের হাতে।

ভারত - বাংলাদেশের ৭ দফা চুক্তি দেখেই চিৎকার করে মুজিব তাজুদ্দিনকে বলেছিলেন — "তাজুদ্দিন তুমি বাংলাদেশকে ভারতের কাছে বিক্রি করে দিয়ে এসেছ। আমি ওসব মানব না।" এই চুক্তিকে অস্বীকার করেই তিনি কাজ শুরু করেন। পরে বিশেষ চিন্তাভাবনা করে নিজস্বার্থে বিরোধীদের দমন করতে প্যারা মিলিটারি (রক্ষীবাহিনী) গঠন করেন। তারপর আরও বেশি চিন্তাভাবনা করে ভারত বাংলাদেশের মধ্যে একটি লোক দেখানো বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তিতে ১৯ শে মার্চ ১৯৭২, তিনি ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী স্বাক্ষর করেন। যা ইন্দিরা মুজিব চুক্তি নামে খ্যাত।

ইতিমধ্যে ভুট্টো বেসামরিক মানুষ হয়েও পাকিস্তানে সামরিক সরকারের প্রধান শাসনকর্তা হয়েছেন। তখন ভারতের সামনে কোনো সহজ পথ খোলা ছিল না। তাই ভুট্টো কে দিয়ে তাড়াতাড়ি সিমলা চুক্তি সই করে P.O.W দের সব মুক্ত করে দেওয়া হয়। হয়তো ভারত আগেই বুঝেছিল এবং ভয়ও পেয়েছিল যে মুজিব তাদের মুক্তির জন্য খোলাখুলি জেহাদ ঘোষণা করবেন। অথবা তাদের বাংলাদেশ ফেরত পাঠাবার দাবি করবেন। ভারত কিন্তু পাক সেনাদের বাংলাদেশ যাওয়ার সুযোগ দিল না। সরাসরি তাদের পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে মুক্তিযুদ্ধ চালাতে মুজিবের অনিচ্ছা, অযৌক্তিক ও অচিন্তানীয় ভাবে তার গ্রেফতার হওয়া, সময়কালে স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণা না করা, ভারতে বসে গোপনে মুস্তাকের পাকিস্তানের পক্ষে ও স্বাধীন বাংলাদেশের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাওয়ার প্রমাণ হাতে পেয়েই মুজিবের প্রতি ভারত সরকারের সন্দেহ দানা বাঁধতে থাকে। কেননা মুস্তাক ছিলেন পাকা ইসলাম পন্থী, তাই ইসলামিক জাতীয়তাবাদকে হত্যা করে তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। মন্ত্রী মুস্তাকের এ মানসিকতার কথা সবাই জানত। মুজিবও তা ভালো ভাবে জানতেন। তাই মুজিবও শেষের দিকে তার পাকিস্তানকে অখন্ড রাখার গোপন পরিকল্পনার কথা একান্তে মুস্তাককে বলেছিলেন। আর তার ভাবী গ্রেফতারের নাটকের কথাও তাকে বলেছিলেন। তার জন্য মুস্তাক আহমেদ ভারতে বসে ষড়যন্ত্র চালাবার সাহস পায়। ভারত সন্দেহ করেছিল যে ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে পার্লামেন্টের সভা মুজিবের ইচ্ছা মতোই ডাকা হয়েছিল। তার জন্য ভারত সন্দেহ করে যে বন্দি পাক সৈন্য যদি বাংলাদেশের মাটিতে থাকে আর মুজিব দেশে ফিরেই যদি ভারতের সেনা ভারতে ফেরত পাঠাবার পরে তাদের মুক্তি দেয়, তার পরই যদি মুজিব অখন্ড পাকিস্তানের ঘোষণা দেয়, তখন ভারতের হাতে করার মতো কিছুই

থাকবে না। তার জন্যই হয়তো বন্দি পাক সেনাদের ভারতের মাটিতে আনা হয়েছিল। আর ভারত থেকেই তাদের সোজা পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।'

সে সময়ের অনেক বাস্তব ঘটনা মানুষ দেখেছে, অনেক মানুষের মনে তা এখনও গাঁথা আছে। তার কিছু কিছু উল্লেখ প্রয়োজন আছে। বাংলাদেশ সৃষ্টির কয়েক মাস পরেই মুজিব ইসলামিক সম্মেলনে যোগ দিতে ইসলামাবাদে যান। সেখানে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ভুট্টোর সাথে চুম্বন বিনিময়ের মাধ্যমে প্রমাণ করেন তার মনের গভীর ইসলামিক মানসিকতা ও প্রীতির কথা। ঢাকার প্রতিটি সংবাদপত্রে এই চুম্বনের ছবি ছাপানো হয়েছিল। অথচ এই সম্মেলনের মাত্র কয়েক মাস আগেই এই পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল। ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ গড়তেই সেই স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছিল। সে যুদ্ধে যেমন সতেরো হাজার ভারতীয় সেনার জীবন বলি দিতে হয়েছিল, তার পূর্বে প্রায় ত্রিশ লক্ষ হিন্দুর বাংলাদেশের ভিতরে জীবন বলি দিতে হয়েছিল। বাংলাদেশের মাটি সে সব শহীদের রক্তে লাল হয়েছিল। তা তখনও মুছে যায়নি। আকাশে বাতাসে তখনও হিন্দুদের করুণ কান্নার প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। বুড়িগঙ্গা সহ সমস্ত নদীর জল হিন্দুর রক্তে তখনও রক্তাভ ছিল। শহিদদের রক্তে রঞ্জিত সেই লাল মাটি মাড়িয়ে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের পিতা হয়ে শেখ মুজিব গেলেন ইসলামাবাদে ইসলামিক বন্ধুত্ব দৃঢ় করতে।

ইসলামিক ধ্বজা উড়িয়ে মুজিব গেলেন বন্ধু ভুট্টোর ডাকা ইসলামিক সম্মেলনে। এই বন্ধু তাকে এক বছর খাইয়েছিলেন, পরিয়েছিলেন এবং তাকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ারও আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু ভারত সরকার তাজুদ্দিনকে শিখণ্ডি দাঁড় করিয়ে তার নিজের হাতে গড়া তার সাধের পাকিস্তানকে ভেঙে দিলেন। তার সঙ্গেই তার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আজীবনের আশাও চিরতরে লুপ্ত হয়ে যায়। যার ফলে ইসলামিক সংস্কৃতির সামনে এসে পড়ে এক বিরাট হুমকি। সেই হুমকির আশু মোকাবিলা করতেই জেহাদি মনোভাব নিয়ে তার এই ধর্মাভিযান।

ইসলামাবাদ থেকে বুদ্ধি ও মদত নিয়ে ঢাকায় ফিরে এসেই ইসলামিক সাংস্কৃতিক শক্তি বাড়াতে ইসলামিক দেশের তেলের টাকা ও পাক বাংলাদেশ সরকারের টাকায় তিনি গড়লেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও মাদ্রাসা বোর্ড। সেই ফান্ডের কোটি কোটি টাকা ইসলামিক সংস্কৃতির শিক্ষা, গবেষণা প্রচার ও প্রসারের জন্য খরচ হতে থাকলো। তাতে জেগে উঠল ঘুমন্ত মক্তব মাদ্রাসাগুলি। সঙ্গে সঙ্গে

সেখানে আরবি হরফ ও উর্দু ভাষার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সর্বত্র চালু হল। কেননা ইসলামিক করনকে দৃঢ় করতে আরবী হরফ ও উর্দু ভাষাই প্রধান মাধ্যম। এই হরফ ও ভাষা চারিদিকে প্রসার ঘটাতে সর্বত্র জেগে উঠল মোল্লা মৌলভির দল। ইসলাম প্রচারের ঝড় উঠল চারিদিকে। টাকা পেয়ে তবলিগের দল(ইসলাম প্রচারের দল) চারিদিকে বেরিয়ে পড়ল। হাটে, বাজারে, ট্রেনে, স্টীমারে, লঞ্চে, বাসে, হাঁটা পথে পাড়ায় পাড়ায় দেখা গেল তবলিগরা দল বেঁধে চলছে পথে পথে। নামাজের সময় নিজেরাও নামাজ পড়ছে। আশে পাশে যারা মুসলমান থাকত তাদেরও প্রায় জোর করে তারা নমাজ পড়াত। এই তবলীগ দলের ১৫-২০ লক্ষ সদস্যের থাকা খাওয়া ও সম্মেলনের ব্যবস্থার জন্য কয়েকশ বিঘা জমি সরকারের পক্ষ থেকে তিনি তাদের দেন। যা প্রায় সবই ছিল একদিন হিন্দুদের সম্পত্তি। কেননা পাকিস্তান হওয়ার পূর্বে টঙ্গি অঞ্চলে একচেটিয়া হিন্দুরা বাস করত। এসব জমির সবই হিন্দুদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বা জবর দখল সম্পত্তি।

পাকিস্তানের সাকসেসর সরকার

সিমলা চুক্তির পরে বন্দি পাক সেনারা দেশে (পাকিস্তানে) ফিরে যায়। আর পাক সেনাবাহিনীর বাঙালি সেনারা মুজিবের আহ্বানে অল্পদিনের মধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে ফিরে এসে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে স্ব স্ব পদে তারা প্রত্যেকেই যোগ দেয়। আবার পাক বাহিনীর অবাঙালি সেনারা পাকিস্তানে চলে যাওয়ার ফলে অনেক পদ শুন্য হয়ে পড়ে। সেই শুন্য পদ পূরণের জন্য বাঙালি সেনাদের কারো কারো দুই তিনটা পদোন্নতিও এক সঙ্গে হয়ে যায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তি ফৌজ তথা যৌথ বাহিনী যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, হাজার হাজার জোয়ান জীবন দিয়েছে, সেই সব শত্রু সেনা সবাই ঢুকে গেল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে। দু তিনটা পাদোন্নতিও অনেকের একসঙ্গে হল। এই কাজটি পূর্ব পরিকল্পনামত অতি সহজভাবেই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই হয়ে গেল। কোনো বিশেষ আলোচনার কথাও মানুষ জানতে পারল না। তাতে তাজুদ্দিন প্রচন্ড বাঁধা দিয়েছিলেন। এভাবেই বাংলাদেশের শত্রু পাকিস্তানি সেনাদের সবাইকে নূতন রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীতে নেওয়া হল। একথা কি কল্পনা করতে পারা যায়? লোকে জানে বিদ্রোহী সেনাদের কোর্টমার্শাল হয়। না পছন্দ সেনাদের ছাঁটাই করা হয়। আর শত্রু সেনাদের জাতীয় বাহিনীতে নিয়োগের কথা পাগলেও চিন্তা করতে পারে না। কিন্তু বাংলাদেশে মুজিবের ইচ্ছায় তা হল। এটা শুধু সেনাবাহিনীতে হয়নি। পাকিস্তান ফেরত সব বিভাগে সর্বস্তরে পাক সরকারের বাঙালি কর্মচারিরা

এ সুযোগ পেয়েছেন। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, দেশে ফিরে কিছুদিন পরেই মুজিব বাংলাদেশে (Law Continuation order of ১৯৭১) ঘোষণা করেন। তার ফলে বাংলাদেশ সরকার পাকিস্তানের সাকসেসর সরকার হয়ে গেল। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তার মানসিকতার মূল ছবিটি সবার সামনে পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠল। বাংলাদেশ বিরোধী হয়েও মিলিটারি সহ সব সরকারি কর্মচারি তাদের চাকরিতে পাকিস্তানি সাংবিধানিক ও মৌলিক অধিকার পেল, আর রক্ত ঝড়া স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস তথা বিপ্লবের ইতিহাস বাংলার মাটি থেকে একেবারে ধুয়ে মুছে গেল। এভাবেই তিনি নিয়াজির দেওয়া সার্বভৌম দলিলটিকে মূল্যহীন করালেন। বাংলাদেশ অলিখিত ইসলামিক রাষ্ট্র রূপে প্রতিষ্ঠিত হল। কারণ ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তান থেকে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায় না। তবু পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের ও পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের অনেকেই আনন্দে নাচতে শুরু করল। যা এখনও নাচছে। ছাগলের তিনটি বা ততোধিক বাচ্চা হলে যেমন মায়ের দুটো বাটের দুধ খেয়ে আনন্দে নাচে, অন্যগুলি দুগ্ধ না খেয়েও দুগ্ধ খাওয়া বাচ্চাদের নাচের তালে তালে লাফাতে শুরু করে, তেমনি তাদের ভবিষ্যৎ ও বর্তমান না জেনেই তথাকথিত হিন্দুরা বাংলাদেশের মুসলমানদের আনন্দের নাচ দেখে তারাও তাদের তালে তালে নাচতে থাকল। আর সুযোগ পেলেই আনন্দে নাচতে নাচতে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চলে আসতে থাকল। এখানে এসেই তারা পলাতকের মত পালিয়ে পালিয়ে চলতে থাকে। প্রাক বাংলাদেশের সবাই মার খেয়ে বা মার দেখে বা শুনে শত শত পুরুষের স্মৃতিধন্য ভিটেমাটি ত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে এসে ভিক্ষালব্ধ আশ্রিত নাগরিকত্ব পেয়েছেন। তারা স্বাধীন ভারতের স্বাধীন নাগরিক বলে গর্ববোধও করেন। তারা ভুলে যান অন্য দেশে পালিয়ে গিয়ে আশ্রিত বা ভিক্ষালব্ধ নাগরিকত্ব পাওয়া যায়। কিন্তু জন্মগত মৌলিক অধিকারের খাঁটি স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। স্বাধীনতা ভিক্ষালব্ধ বা বেচা কেনার সামগ্রী নয়। আর জন্মগত মৌলক অধিকারের জাতিসত্তাও চাপে পড়ে অন্যের ইচ্ছায় পরিবর্তন করা যায় না। তবুও নিজেদের বুদ্ধিমান বলেই তারা মনে করেন। অথচ তাদেরই আত্মীয় স্বজন যাদের সংখ্যা বাংলাদেশে প্রায় দুই কোটি। আর সেই বাংলাদেশ থেকে ১৯৭১ সালের পড়ে এসে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে তাদের সংখ্যা দেড় কোটি। এই সাড়ে তিন কোটি মানুষের দুই কোটি কাঁদছে বাংলাদেশের মাটিতে অত্যাচারিত হয়ে আর এখানে দেড় কোটি কাঁদছে দেশ ছাড়া, রাষ্ট্র হারা, নাগরিকত্বহীন ও সর্বহারা নিরাশ্রয় হয়ে। এদের ব্যথা দেখে ব্যথিত হতে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। যারা আগে এসেছে তাদের আপনজনেরা কাঁদছে তবুও সমবেদনার বাণী তারা কোথাও শুনতে পায় না। আর অনেকে ওখান

থেকে এম এ পাশ করে এসে এখানে নতুন করে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে উচ্চশিক্ষা নিয়ে চোরা পথে নাগরিকত্ব ও চাকুরি পেয়েছে। তারাও দেশের কথা, তাদের আপনজনের কথা ভুলে যাচ্ছেন। এভাবে বিনা প্রতিবাদে বাংলাদেশ তাদের অত্যাচার হিন্দুদের ওপরে আদালতি কায়দায় চালাচ্ছে আর মাঝে মধ্যে তা ফৌজদারি রূপও নেয়। পাকিস্তান সরকার একশো ও পাঁচশো টাকার নোট বাতিল করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলার কালে। কিন্তু বিপ্লবী বাংলাদেশ সরকার তাদের বাংলাদেশ রেডিওর মাধ্যমে বার বার ঘোষণা করে, সেসব অচল নোট বাংলাদেশ সরকার চালু করবে। কিন্তু মুজিব সরকার বাংলাদেশ সরকারের পূর্ব ঘোষণা সত্ত্বেও তা চালু করার হুকুম দিল না। কারণ তিনি ভালোভাবেই জানেন যে সে সব নোট কেবলমাত্র হিন্দুদের কাছে আছে, তখন হিন্দুরা ওখানে শহরের ব্যাঙ্কে গিয়ে সেই নোট বদল করার সুযোগ যেমন পায়নি, তেমনি নোট সঙ্গে করে নিয়ে হিন্দুরা তখন অনেকে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। এই নোট বদল করতে না পেরে হিন্দুরা অনেকে পথের ভিখারি হলেও মুসলমানদের কোনো ক্ষতি হয়নি। একথা জেনেই তিনি সেই নোট চালু করার হুকুম আর দিলেন না। আর বাংলাদেশকে পাকিস্তানের সাকসেসর সরকার রূপে ঘোষণা করায় পাকিস্তান সরকারের হুকুম নাকচ করা যায় না। তাই আইনগত বাধাও দেখা দেয়। ফলে হিন্দুদের কপাল পুরল সঙ্গে আমার ৮৫ হাজার টাকা মূল্যহীন কাগজে পরিণত হল। কারণ আমি পূর্বে ভালোভাবেই জানতাম পূর্ববঙ্গ স্বাধীন হবেই। তার জন্যই ব্যাঙ্কের সব টাকা তুলে ৫০০ টাকার নোট করে সঙ্গে রাখি। সে টাকা বাড়িতে রেখে আমি কলকাতা চলে আসি। সেই নোট নিয়ে আমার স্ত্রী কলকাতা পৌঁছানোর আগে তা বাতিল হয়ে যায়।

দেশ ভাগের সময় পূর্ববঙ্গের মোট জমিজমা ঘরবাড়ি সহ সম্পত্তির শতকরা আশি ভাগ ছিল হিন্দুদের হাতে। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময় মার্শাল ল শাসনের অত্যাচারে যে হাজার হাজার হিন্দু দেশত্যাগ করে, সে সব হিন্দুদের সম্পত্তির মালিকানা সরকার নেয়। এমনকি ওখানে যারা ছিল, তাদেরও অনেকের সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি আইন বলে জবরদখল করে। তা মুসলমানদের হাতে দিয়ে দেয়। এই আইনটি ছিল হিন্দুদের কাছে অভিশাপ। অনেক চাপ দেওয়া সত্ত্বেও মুজিব আইনটি না তুলে তার নামটি শুধু পাল্টে শত্রু সম্পত্তির বদলে অর্পিত সম্পত্তি নাম দিয়ে প্রমাণ করলেন যে, ভারত বাইরে শত্রু নয় কিন্তু ভিতরে শত্রু। কেননা আইনটি তুলে দিলেন না। হিন্দুরাও সে সম্পত্তির মালিকানা ফিরে পাচ্ছে না। সেখানের হিন্দুরা সেই অভিশপ্ত আইনটি তুলে দিতে বছরের পর বছর ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছে। পাকিস্তানের সাকসেসর সরকার হওয়ার জন্য ও হিন্দুর সম্পত্তি বিশেষ ভাবে

মুসলমানরা ভোগ করায় আইনটি তোলা যাচ্ছে না। তুলে দিলেই মুসলমানদের বিশেষ ক্ষতি হবে।

শরনার্থীর কান্না : ভারতে আবার হিন্দু শরণার্থীর ভীড়

মুক্তি যুদ্ধকালে হিন্দু শরণার্থীরা প্রাণের ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে ভারতে ছুটে এসেছিল. প্রাণ বাঁচাতে। এককোটি মানুষ তাদের সর্বস্ব ত্যাগ করে চলে এসেছিল ভারতে। কেননা তারা স্বচক্ষে দেখেছে হিন্দুদের উপর সেই ভয়াবহ নারকীয় জেহাদি অত্যাচার। ভারতে এসেও তারা প্রায় এক বছর ধরে ক্যাম্পে কেঁদেছে। আকাশবাণী ও ভারতের নেতাদের অভয়বাণী প্রচারে তারা অত্যাচারের কথা ভুলে যায়। সঙ্গে বাংলাদেশ রেডিও একইভাবে প্রচার চালায়। তাই বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জন্মমাটির টানে ও নেতাদের আশ্বাসে শরনার্থীরা তখন দল বেঁধে দেশে ফিরে যায়। সে সময় কিছু সংখ্যক আওয়ামি লিগ নেতা ও পরিষদ সদস্য ছাড়া কোনো সাধারণ মুসলমানই তখন ভারতে ছিল না। আর ছিল অস্ত্র চালনা শিক্ষার আশায় আর অস্ত্র হাতে পাওয়ার লোভে কিছু সংখ্যক মুসলিম যুবক। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর লক্ষ লক্ষ হিন্দু তাদের জন্ম মাটির টানে দেশে ফিরে গিয়ে দেখতে পেল যে তাদের দেখার কেউ নেই। সমবেদনার বাণী বা তাদের সাহায্যের মন নিয়ে কেউ এগিয়ে এল না। তারা অনেকেই দখতে পেল তাদের ঘর বাড়ির কোনো চিহ্ন নেই। সেখানে তাদের জমিতে মুসলমানেরা চাষবাস করছে।

তাদের সম্পত্তি ফেরত পাওয়ার জন্য মুজিব কোনো শক্ত শাসনতান্ত্রিক হুকুম দেননি। পুলিশকে কঠোর ভাবে কোনো নির্দেশও দেননি। যার ফলে তারা অতিশীঘ্র বাড়ি ঘরের দখল পায় নি। তাদের জমির দখল পেতে হলে টাইটেল সুট করে তাদের জমি পেতে হবে। তাদের কাছে সেই জমি বা বাড়ির কোন দলিল বা কাগজপত্রও কিছু নেই। সে সব ফেলেই তারা জীবন বাঁচাতে সেদিন পালিয়ে ভারতে এসেছিল। বাড়ি ও জমির দলিল বা কাগজপত্রের চেয়েও জীবনের দাম তখন তাদের কাছে বেশি মূল্যবান ছিল। এভাবেই অনেকেই তাদের জমি বাড়ির দখল না পেয়ে ভারতে আবার ফিরে এল। কোথায় দাঁড়িয়ে বছরের পর বছর ধরে তারা মামলা চালিয়ে জমির দখল পাবে? শরণার্থী নামে পাওনা ত্রাণ সামগ্রীর সিংহভাগ পেতে থাকল লুণ্ঠনকারীরা। আর তারা সব ভাগ করে নেওয়ার পরে পড়ে থাকা ছিটেফোটা তারা পেতে থাকল। তা বুঝতে মুজিবের জনসভায় একটি ভাষণের উল্লেখ করছি। যা দেশের সব কাগজে বিরাট হরফের হেডিং দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল।

"দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্য সাড়ে সাত কোটি কম্বল এসেছে।

তাতে সবাই একটা করে পাওয়ার কথা। কিন্তু আমারটা গেল কোথায়?" ঐ ভাষণেই বোঝা যায় ত্রান সামগ্রী সবার মধ্যে সমান ভাবে ভাগ হয়েছে। সেখানে লুণ্ঠিত হিন্দু শরণার্থী ও লুণ্ঠনকারী মুসলিমদের মধ্যে সমভাবে ভাগ করে নিয়েছে। কিন্তু লুণ্ঠিত শরণার্থীরা তাদের প্রাপ্য ত্রাণ সামগ্রীও পেল না। তাই মুজিবের শাসন কালের প্রথম থেকেই তারা পেটের দায়ে আবার ভারতে আসতে শুরু করে। কলকাতার লেখক সাংবাদিকরা ফলাও করে প্রচার করতে শুরু করেন,তারা সাম্প্রদায়িক কারণে বাংলাদেশ ত্যাগ করে আসছে না, আসছে পেটের দায়ে। অথচ একদিন সেখানে তারা ছিল ধনী ও সম্পদশালী ও সবদিক থেকে উন্নত। পেটের দায়ে তারা কেন দেশ ছাড়ছে তার কারণ খুঁজলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

শরণার্থীর মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের জন্য প্রথমে স্থানীয় এম. এন. এ. রা প্রাপকদের একটি তালিকা অনুমোদন করে ত্রাণ সংস্থার কাছে দিতেন। সেই তালিকা মতো ত্রাণদাতা সংস্থা নির্দিষ্ট তারিখে সেখানে গিয়ে উক্ত এম. এন. এ'র সামনে ত্রাণ সামগ্রী বিলি করতেন। কিন্তু ভারত সেবা আশ্রমের ত্রাণ সামগ্রী দাতা ত্রাণ বিলি করতে গিয়ে দেখতে পান যে ৯৫ শতাংশ মুসলমানরা ত্রাণ পাচ্ছে আর ৫ শতাংশ হিন্দু, অথচ তিনি ভালো ভাবেই জানেন যেসব মুসলমানরা ত্রাণ পাচ্ছে তারা কেউ শরণার্থী হয়ে ভারতে যাননি। আর লক্ষ লক্ষ ফিরে যাওয়া শরণার্থী যারা সেখানে গিয়ে ত্রাণের জন্য কাঁদছে তারা পাচ্ছে না। ২-৩ দিন এভাবে দেওয়ার পরেই তিনি ত্রাণ বিতরণ বন্ধ করে দিলেন। পরে নতুন অঞ্চলের হিন্দুদের খবর দিয়ে এনে নেতৃস্থানীয় লোকদের বলেন যে প্রকৃত শরণার্থীদের নামের তালিকা ভুক্ত করে এম. এল. এ. দের অনুমোদন সহ তালিকাটি তার কাছে পাঠাবে। সেই তালিকায় প্রথমদিকে কয়েকটা ও শেষের দিকে কয়েকটা মুসলমানের নাম থাকবে। এম. এন. এ. দের সাহায্যের দরখাস্ত করলেই তো আর সাহায্য পাওয়া যাবে না সত্য, তবে চেষ্টা করায় ক্ষতি কি? তিনি বললে তারা একটি দরখাস্ত করে দেখতে পারে।

এতে সব এন. এল. এ রা দরখাস্ত করার কথা বলবে। তা বলার পরে তার সামনে দরখাস্তটি ফেলে দিলে তিনি অবশ্যই তাহা অনুমোদন করে দেবেন। এভাবে স্বামীজির উপদেশ মতো তারা এম. এন. এ এদের দিয়ে অনুমোদন করিয়ে দরখাস্ত দিতে থাকল। এভাবে সব দরখাস্ত হাতে নিয়ে স্বামীজি সেই তালিকা মতো ত্রাণ বিলি শুরু করার পরেই এম. এন. এ রা দেখতে পান যে ত্রাণ গ্রহীতা প্রায় সবই হিন্দু। তা দেখে মুসলমানদের মধ্যে চিৎকার আরম্ভ হয়। এবং এম. এন. এ ও ত্রাণ বিলি বন্ধ করতে বলায় স্বামীজি উত্তর দিতেন, ত্রাণ সামগ্রী আরও এসেছে সে সময়

এম. এন. এ সাহেবের ইচ্ছা মতো ত্রাণ বিলি হবে। এ তালিকাটিও আপনার অনুমোদিত তালিকা, আজ আর বন্ধ করে লাভ কি? এম. এন. এ বুঝলেন ত্রাণ যখন আবার আসছে, তখন এখানে বাধা সৃষ্টি করলে তালিকা ভুক্ত হিন্দুরা অসন্তুষ্ট হবে। আর মুসলিমরাও জানতে পারলো আবার ত্রাণ সামগ্রী আসছে। আর বেশি হইচই করল না। ত্রাণ বিনা বাধায় বিলি হল। ঐ দিন ওখানেই ঐ অঞ্চলের ত্রাণ সামগ্রীর বিলির শেষ দিন। এভাবে বিভিন্ন বুদ্ধি করে বিভিন্ন ভাবে স্বামীজি ত্রাণ সামগ্রী বিলি করতে থাকলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে ভারত সেবাশ্রম সংঘ ত্রাণের কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হলেন।

স্বামীজি খুব তেজস্বী প্রকৃতির সাধু ছিলেন। তিনি একজন এম. এন. এ র মুখের পরেই মানুষ জনের মুখের সামনে বলে দিলেন, দেখুন এম. এন. এ সাহেব ভারত সরকার দয়া করে ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়েছেন আর তা বিলি করার জন্য সরকার উপযুক্ত মনে করেই শেষ পর্যন্ত আমার উপর দায়িত্ব দিয়েছেন। ত্রাণ বিতরণ করার কথা শরণার্থীদের মধ্যে। আপনার উপরে যেমন বাংলাদেশ সরকার ক্ষমতা দিয়েছে, সেই মতো ভারত সরকার আমার উপরে ক্ষমতা দিয়েছে, আপনি বাধা দিলে আমি ত্রাণ সামগ্রী দেওয়া বন্ধ করব। তারপর তার উপরে বিভিন্ন দিক থেকে নানা ভাবে চাপ সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত ভারত সেবাশ্রম সংঘ ত্রাণ সামগ্রী বিলি বন্ধ করে দেয়।

আগেই বলেছি যে কোনো স্পেশাল শাসন তান্ত্রিক আদেশ না থাকায় অনেক জবর দখল হিন্দু সম্পত্তির দখল তারা আর ফিরে পায়নি। ঢাকার সাভার বোর্ডিং এর মালিক ছিলেন জগদীশ সাহা, গণমুক্তি দলের কোষাধ্যক্ষ। শত চেষ্টা করেও সে হোটেলের দখল তিনি পাননি। তার হয়ে আমাদের সব প্রচেষ্টাও ব্যার্থ হয়েছে।

ঢাকার কাগজিটোলার I.C.I (Imporial Chemical Industries) এর বিরাট বাড়িটিতে ২৫ ঘর হিন্দু ভাড়াটিয়া বাস করত। গণমুক্তি দলের যুগ্ম সম্পাদক এডঃ শ্রী মলয় রায়ও সে বাড়িতে বাস করতেন। বাংলাদেশ হওয়ার পরে একদিন রাত্রে মুসলমান ছাত্রাবাস আক্রমণ করে হিন্দুদের মেরে ধরে ও বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। সেখানে ছাত্রাবাস তৈরী করে। পরের দিন তিন/চার শত হিন্দু মিছিল করে সাক্ষাতে সব মুজিবকে বলার পরেও হিন্দুরা শেষ পর্যন্ত সে বাড়ির দখল আর ফিরে পায়নি।

এসব দেখে হিন্দুরা দলে দলে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিতে ছুটে আসতে শুরু করল।

ত্রৈলোক্য মহারাজের চিতা ভস্ম

স্বনামধন্য ত্রৈলোক্য মহারাজের চিতাভস্ম কলকাতা থেকে ঢাকা হয়ে তার জন্ম ভিটা কানাসহাটিয়ায় (ময়মনসিংহ) নেওয়ার প্রস্তুতি চলে। সেই ভষ্ম সম্মানের সঙ্গে নেওয়ার ও মহারাজের স্বর্গীয় আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য একটা কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটির সভার শেষে মন্ত্রী ফণীভূষণ মজুমদার মন্ত্রী তাজুদ্দিন ও আমরা দু-তিনজন হিন্দু সদস্য শ্রী ফণীভূষণ মজুমদারের বাড়িতে বসে গল্প করছিলাম। হঠাৎ তাজুদ্দিন সাহেব উত্তেজিত হয়ে সেদিন অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলেছিলেন, ফণীদা, মহারাজের চিতা ভষ্মে সম্মান জানাবার প্রস্তুতিতে মুজিব ভাই খুশি নন। এ কমিটি করাতেও তিনি অখুশি। ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতেও তিনি মানসিক ভাবে চান না। কিভাবে দেশ স্বাধীন হল, ভারত কি ভাবে সাহায্য করেছে তা কোনোদিন আমাকে বা নজরুল ইসলামের কাছে জিজ্ঞাসা করেননি। তা বলতে গেলেও তিনি বিরক্ত ভাবে তাকান। আর হাসতে হাসতে আমাকে একদিন বলেই ফেললেন – "তাজুদ্দিন তুমি বাংলাদেশকে ভারতের কাছে বিক্রি করে দিয়ে এসেছ। তোমার ঐ চুক্তি টুক্তি আমি মানব না।"

সেদিন তাজুদ্দিন মানসিক বেদনায় আপ্লুত হয়ে বলেছিলেন – "ভারতের জনগণ বিশেষ করে তার প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি গান্ধি শতশত কোটি টাকা ব্যয় করে ১৭ হাজার সেনার রক্ত দিয়ে ও বিশ্বযুদ্ধের হুমকি মাথায় নিয়েও বাংলাদেশকে স্বাধীন করে দিল। আমার চামরা দিয়ে জুতো করে তা শ্রীমতি গান্ধির পায়ে পরালেও ঋণ শোধ করা যাবে না। অথচ মুজিব ভাই সে ঋণ স্বীকার করতে নারাজ।"

সে কারণেই লেখককেও ডেকে দেশ কিভাবে স্বাধীন হল কোনোদিন মুজিব কোনো কথা জিজ্ঞাসা করেননি। আর আমিও যেচে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করিনি ও কিছু বলিনি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল মুজিব নিজেকে যতই চতুর মনে করুন না কেন একদিন প্রকৃতির নিয়মের চাপে নিজের ভুল তিনি নিজেই ধরতে পারবেন। সেদিন আমাকে ডাকতেও তিনি বাধ্য হবেন। কিন্তু সে সুযোগ আর এল না।

তাজুদ্দিনের মন্তব্যের পরে বোঝা গেল মুজিব ও তাজুদ্দিনের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। তাজুদ্দিন কঠোর বাস্তবকে স্বীকার করে চলতে চান। আর মুজিব কোরানের অনুশাসন মতো চলতে চান। মুজিবের জীবন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে কোরানের নির্দেশ মতোই তিনি জীবন যাত্রা শুরু করেছেন। কোরাণের জেহাদের ডাকেই কলকাতায় গণহত্যায় খোলা তরবারি হাতে নিয়ে তিনি খাঁটি

জেহাদির ভূমিকা পালন করেছিলেন। সোরাবর্দীর সেনাপতি রূপে জেহাদের মাধ্যমে পাকিস্তান কায়েম করেছিলেন। সেই কোরানের নির্দেশ মতোই তিনি বিধর্মীর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারেন না। পয়গম্বর ■ তাঁর মায়ের আত্মার প্রতি সম্মান জানাতে তাঁর মায়ের কবর জিয়ারৎ করেননি। যেহেতু তাঁর মা মুসলিম হয়ে মরতে পারেননি। কেননা তখন ইসলাম ধর্মই প্রবর্তিত হয়নি।

তাই ভারতের সব রকমের সাহায্যে বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও স্বাধীন হওয়ার পূর্বে ভারতের মাটিতে এসে ভারতের অধীন হয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধ চালাতে চাননি। কোরানের নির্দেশ মতো বিধর্মীকে তিনি বিশ্বাস করতে পারেননি। তার সারা জীবনের ঘোষিত নীতির কথা চিন্তা করেই হয়তো শেষ পর্যন্ত তিনি বুঝেছিলেন যে অন্যের বা বিধর্মীর সাহায্যে তার নিজ হাতে গড়া পাকিস্তান ভেঙে স্বাধীন বাংলাদেশ হলে ইসলামিক সংস্কৃতি দুর্বল হবে। ফলে ভারত উপমহাদেশে ইসলাম বিপন্ন হবে। তার ফলে হয়তো বাংলাদেশ ও পাকিস্তান মুছে যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত মনে প্রাণে একথা বুঝেই তিনি পাক বাহিনীর হাতে সেচ্ছায় আত্ম সমর্পণ করেছেন। গান্ধিজির আশীর্বাদে মওলানা মহম্মদ আলি কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হলেন। তিনি কোরানের নির্দেশমতো প্রকাশ্যে জনসভায় বলতে পারেন "গান্ধিজি মহান, উদার পন্ডিত ও ভারতের সম্মানিত শ্রেষ্ঠ নেতা হলেও আমার কাছে তার স্থান একজন সাধারণ নচ্ছার বকাটে মুসলমানের নিচে।" যেহেতু কোরানের নির্দেশ আছে যে কোন বিধর্মী একজন সাধারণ চরিত্রহীন মুসলমানের উপরে স্থান পাবে না।

এই উক্তিতে মৌলনা মোহম্মদ আলির কোনো দোষ নেই, কারণ তা হল কোরানের নির্দেশ। মুজিবও কোরানকে অনুসরণ করে চলতে চেয়েছিলেন। এতে তার কোনো দোষ থাকতে পারে না। সেই কোরানের নির্দেশের বাইরে তিনি যেতে পারেন না। তিনি কেন, কোনো মুসলমানের পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। গেলেই তিনি আর মুসলমান থাকতে পারেন না। আর কোনো মুসলমান তার ধর্ম ত্যাগ করলে তাকে খুন করার নির্দেশও আছে কোরানে। একথা বিশেষভাবে সকলের বুঝত হবে যে কোরান জেহাদ Holy War এর মাধ্যমে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। সে যুদ্ধ অমুসলমানদের ও অমুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। তা যেমন এতদিন চলে এসেছে ভবিষ্যতে চলতে থাকবে। যতদিন না পৃথিবীর সমস্ত অমুসলিম মানুষ বা রাষ্ট্র মুসলিম হয়।

এই জেহাদের মাধ্যমে দেশের পরে দেশ জয় করতে হবে। আর সে দেশের অমুসলমানদের মুসলিম ধর্মে দীক্ষা নিতে বাধ্য করাতে হবে। সমস্ত দারুল হার্ব

(অপবিত্রদেশ) জয় করে দারুল ইসলামে (পবিত্র দেশে) রূপান্তরিত করতে হবে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামে যেখানে দেশ ভাগের সময় মাত্র ২ শতাংশ মুসলিম ছিল সেখানে এখন ৪০ শতাংশ মুসলিম হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামকে দারুল হার্ব মনে করেই সব সরকারই সেখানে মুসলমানের সংখ্যা বর্ধিত করেছে। আর মুজিব সরকারি প্রচেষ্টায় সেখানে আরো বেশি সংখ্যায় মুসলমান বসাবার জন্য চেষ্টা করলেই চাকমারা প্রতিবাদে অস্ত্র ধরে। সমস্যা মুজিবেরই সৃষ্টি। কাশ্মীরের যুদ্ধও কোরানের নির্দেশিত পথের যুদ্ধ (জেহাদ)।

দেশে ফেরার কিছুদিনের মধ্যেই মুজিবের রাজনৈতিক আচরণ, স্বজনপ্রীতি, স্বার্থপরতা সহ বিভিন্ন কর্মধারা, বিশেষ করে তার ছেলেদের অশালীন ব্যবহারে আওয়ামি লিগের কিছু সংখ্যক নেতা ও বিশেষ সংখ্যক উল্লেখযোগ্য ছাত্রনেতা মুজিবের তথা আওয়ামি লিগের বিরুদ্ধে চলে যান। তারা এক হয়ে চরমপন্থী বলেই পরিচিতি পায়। তারা মুজিব, আওয়ামি লিগ ও ভারতের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে শুরু করে। একদিন পল্টন ময়দানের সভায় দলের নেতারা মুজিব ও আওয়ামি লিগের বিরুদ্ধে খুব নিন্দামন্দ করেন। আর অন্যতম নেতা সাজাহান সিরাজ ঘোষণা করেন "একদিন ছাত্রদের তরফ থেকে মুজিবকে আমি জনসভায় বঙ্গবন্ধু আখ্যা দিয়েছিলাম। আজ এই জনসভায় সে বঙ্গবন্ধু আখ্যা কেটে দিতেছি। আজ থেকে তিনি আর বঙ্গবন্ধু নন। তিনি বঙ্গশত্রু, কারণ বাংলার জনগণ স্বাধীনতা পায়নি, মুজিবের স্বজনেরাই স্বাধীনতা পেয়েছে।"

গুলজারিলাল নন্দের ঢাকা সফর

১৯৭২ সালের মাঝামাঝি সময় ভারতের অস্থায়ী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী গুলজারি লাল নন্দ খুব আশা ও আনন্দ নিয়ে ঢাকা গিয়েছিলেন। বাংলাদেশ সরকারকে তার সফরের কথা পূর্বে জানালেও সরকারের পক্ষে Protocol সম্মত ভাবে সামান্যতম সম্মানটুকু তাকে দেওয়া হয়নি। তার জন্য বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতা তিনি পাননি। নাথবাবুর সুপারিশে শেষ পর্যন্ত আমাকে তার গাইড হিসাবে নিয়ে তার ইচ্ছামত জায়গায় ঘুরেছিলেন। প্রথমে তিনি যান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি বিভাগের প্রফেসর শহীদ জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতার স্ত্রী বাসন্তি গুহ ঠাকুরতার সঙ্গে দেখা করতে। শ্রীমতি গুহ ঠাকুরতা ছিলেন গ্যান্ডোরিয়া গার্লস হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। তিনি স্কুল কোয়ার্টারে থাকতেন। সেখানেই আমরা যাই। সেখানে তার সঙ্গে সাক্ষাতে শ্রীনন্দ প্রথমে তার আন্তরিক শোক প্রকাশ করেন ও তার সমবেদনা জানান। কিছু প্রাথমিক কথার পরে শ্রীনন্দ তাকে প্রশ্ন করলেন, শেখ মুজিব তার

বাড়িতে গিয়ে তার ব্যক্তিগত বা সরকারের পক্ষ থেকে কোনো শোক প্রকাশ করেছেন কিনা। উত্তর ছিল, না। পরের প্রশ্ন ছিল পত্রের মারফত কোনো বাণী তার কাছে পাঠিয়েছেন কিনা? তারও উত্তর ছিল, না। তার পরের প্রশ্ন ছিল। সরকারের পক্ষ থেকে শোক প্রকাশের কোনো বার্তা তিনি পেয়েছেনকিনা? তারও উত্তর ছিল, না।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে তিনি চলে যান মেডিকেল কলেজ শহীদ মিনারে। সেখান থেকে চলে গেলেন জগন্নাথ হলে। সেখানে গিয়েও শোনেন মুজিব সেখানে গিয়ে কোনো শোক প্রকাশ করেন নি। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য হলগুলি গাড়ির মধ্য থেকে দেখে ঢাকেশ্বরী মায়ের বাড়ি গিয়ে মাকে প্রণাম করার পরে আমরা চলে যাই রমনা মাঠের দিকে। রমনা কালীমন্দির সম্পর্কে আমার জানা ইতিহাস তাকে বলি। এই ২৬ একর জমির উপরে 'কোথায়' মায়ের মন্দির ছিল, কোথায় আনন্দী মায়ের মন্দির ছিল, তা দেখাই। অবশ্য তিনি দেখলেন সমান মাঠ। ২৫ শে মার্চ গভীর রাতে পাক বাহিনী মন্দির দুটি ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেবার সময় মন্দিরের সেবাইত ও মালিক পরমানন্দ গিরি ও তার আত্মীয়স্বজন ভক্ত ও আশ্রিত সহ প্রায় ৪০০ জন হিন্দু মারা যায়। তাও তাকে বলি। রমনা কালী মন্দির ও আনন্দময়ী মায়ের মন্দিরটি সম্বন্ধে সব জেনে তিনি মন্দিরটি আবার গড়তে বলেছিলেন। ভারত থেকে টাকা তুলে দেবার জন্য তার আপ্রাণ প্রচেষ্টার কথাও বলেছিলেন। মন্দির দুটি এভাবে ধ্বংস করার জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, মুঘল যুগের বর্বরতার ইতিহাসই পাক আর্মিরা নতুন ভাবে সৃষ্টি করে গেল।

তারপরে তিনি আরও বেশি দুঃখ প্রকাশ করে বললেন "১৯৬৪ সালে আমার প্রধান মন্ত্রিত্ব কালে আদমজি জুট মিল থেকে দাঙ্গা শুরু হয়। তারপরে তা পূর্ববঙ্গের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তারই প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গে দাঙ্গার পরিবেশ সৃষ্টি হলে আমি তা কঠোর হস্তে থামাতে চেষ্টা করি। কিন্তু পরে লক্ষ লক্ষ রিফিউজি কলকাতায় প্রবেশ করে। সেই আদমজি জুট মিল ও তার পরিবেশ দেখার ইচ্ছে থাকলেও মন আর চাইছে না। এখানে এসে সব দেখে শুনে মনে হচ্ছে হিন্দুদের ভবিষ্যতের আশা কম। আমি খুব আশা নিয়েই ঢাকায় এসেছিলাম আর ফিরে যাচ্ছি বেদনা নিয়ে।"

হিন্দু সংস্কৃতি ও ভারতের প্রতি আচরণ

সেই কালা শত্রু সম্পত্তি আইনটি যা হিন্দুদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে তাদের সর্বস্বান্ত করে পথে বসিয়েছে সে সম্বন্ধে পূর্বে বলা হয়েছে। কাজেই নতুন করে বলার প্রয়োজন মনে করি না। তবে আইনটি চালু করে হিন্দুদের মৌলিক অধিকারে যে আঘাত

দেওয়া হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মুখে অনেক মুসলমানের চাকুরির উন্নতি হয়। তার সঙ্গে কিছু কিছু হিন্দুরও চাকরির উন্নতি হয়। কিন্তু পরে দেখা যায় মুজিব দেশে ফিরে সেই সব হিন্দুদের তাদের পূর্বপদে আবার নামিয়ে দিলেন। আর অবাঙালিরা চলে যাওয়ার জন্য হাজার হাজার পদ খালি হয়ে যায়। সেই সব পদে মুসলমানদেরই চাকরি হয়। কোনো হিন্দুকে সে সব খালি পদে নতুন করে নেওয়া হয় না। যদিও দু একজন চাকুরি পেয়েছে। তাও পিয়ন, খালাসি ছাড়া উপরের চাকরি নয়। জরিপ করলে দেখা যাবে পররাষ্ট্র বিভাগে এক হাজারের মধ্যে এক জনকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সামরিক বাহিনীতে একই অবস্থা। পুলিশ বিভাগেও কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। জরিপ করলে আরও দেখা যাবে জাতীয় পরিষদে সদস্য নির্বাচনের বেলায় ৭০ সালে যেমন তিনি হিন্দুদের প্রাপ্য ৩৬ জনের জায়গায় মাত্র ১ জনকে তাঁর দল থেকে নমিনেশন দিয়েছেন চাকরির বেলায়ও ১ শতাংশের কম হিন্দু তাঁর আমলে চাকরি পেয়েছে। এ হল তাঁর হিন্দু প্রীতি ও ধর্ম নিরপেক্ষতার ইতিহাস।

যুদ্ধের পরে অবাঙালিরা যেমন চাকরি ছেড়ে চলে যায় কোটি কোটি টাকার বাড়ি ঘর শিল্প ও ব্যবসা কেন্দ্র বিভিন্ন সংস্থা তারা ফেলে যায়। সেই সব সম্পত্তির কোনো কিছুই কোনো হিন্দু পায়নি। সবই মুসলমানদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা হয়েছে। এভাবে হিন্দুদের সব সুযোগ থেকে দূরে রেখে বঞ্চিত করে শুরু হলো বঙ্গ বন্ধু শেখ মুজিবের তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষ বাংলাদেশ। সেখানে তন্ন তন্ন করে খুঁজলে দেখা যাবে না বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের ১৭ হাজার জোয়ানের জীবন দানের স্বীকৃতির কোনো ফলক। খুঁজে পাওয়া যাবে না ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধির তথা ভারতের জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনো স্বীকৃতির চিহ্ন। এমনকি, প্রতিবছর বিজয় দিবস ও স্বাধীনতা দিবসে বিভিন্ন নেতা তাদের বক্তব্যে বা লেখায় স্বাধীনতা যুদ্ধে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী, ভারত সরকার ও তার জনগণের নিস্বার্থ অবদানের কথা কেউ উল্লেখ করে না। এমনকি মুজিবের মেয়ে হাসিনাও তার ব্যতিক্রম নন। ভাবধারা এমন বোঝায় যে হিন্দুর কাছে মুসলমানদের পরাজয় কি স্বীকার করা যায়? তবে তারা পাইকারি ভাবে এইটুকু স্বীকার করে যে স্বাধীনতা যুদ্ধে যে সব দেশ সাহায্য করেছে সেই সব দেশের প্রতি বাংলাদেশ কৃতজ্ঞ। ভারত ভাশুর তাই তার নাম উচ্চারণ করা যায় না।

পূর্ব পাকিস্তানে অত্যাচারিত হয়ে বা অত্যাচারের ভয়ে ভারতে চলে এসে স্থায়ী ঘরবাড়ি জমি জমা করে স্থায়ীভাবে বাস করলেও অনেক হিন্দু তাদের জন্ম

মাটিকে ভুলতে পারেনি। তাদের আত্মীয় স্বজনকেও ভুলতে পারেনি। ভারতের সাহায্যে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অনেকেই ভারতের বাড়ি ঘর বিক্রি করে টাকা সংগ্রহের পর তারা মাতৃভূমিতে চিরস্থায়ী ভাবে বাস করার জন্য চলে গেল। তাদের আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে আনন্দে বাস করা শুরু করল। এই খবর মুজিবের কানে গেলেই তিনি পুলিশকে কড়া হুকুম দিলেন তাদের তাড়িয়ে দিতে। তারা নুতন করে আবার সর্বহারা হল। মুজিব ভালোভাবেই বুঝেছিলেন যে পাকিস্তানের রাজশক্তির সব চেষ্টাকে ব্যর্থ করে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ইসলামিক জাতীয়তাবাদকে সাময়িকভাবে পরাজিত করেছিল। তাই বাংলাদেশের ইসলামিক সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখতে হলে ভারতের সংস্কৃতির প্রবল ঢেউ থেকে বাংলাদেশকে দূরে রাখতে হবে। ভারতের উন্নত ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতি বহনকারী বই, পুস্তক, যাত্রা, থিয়েটার, সিনেমা সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার উপরে তিনি কড়া ব্যবস্থা নিলেন যাতে এই সব সহজে সেখানে প্রবেশ করতে না পারে। এমনকি সাপ্তাহিক ও দৈনিক সংবাদ পত্রের প্রবেশেও তিনি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন।

এই হিন্দু তথা ভারতীয় সংস্কৃতির যে তিনি বিরোধী ছিলেন তার প্রথম প্রমাণ রমনা কালী মন্দিরের ২৬ একর জমির জবর দখল। সেখানে ১২০০ বছরের প্রতিষ্ঠিত পাক আর্মি দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরটির পুনর্গঠনের বাধা দেওয়া। পাক আর্মি এই মন্দির ধ্বংস করেছে ইসলামিক জেহাদ ঘোষণা করে। সেই ইসলামিক জেহাদকে স্বীকৃতি জানাতে ও তা চালিয়ে যেতেই তিনি জবর দখল করলেন মন্দিরের এই ২৬ একর জমি। শুধু ২৬ একর জমির কথা বড় নয়। বড় কথা জমিটা কোথায়? জমিটা কার? জমিটা ঢাকার সব থেকে সেরা জায়গা বাংলাদেশের রাজধানী ঐতিহাসিক ঢাকার ঐতিহাসিক রমনা মাঠে। সেই মাঠের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়েছিল ২১১ ফুট উঁচু রমনা কালীমায়ের ১২০০ বছরের ঐতিহাসিক মন্দিরটি। মন্দিরের চূড়াটি বহু দূর থেকে দেখা যেত। হিন্দু সংস্কৃতি তথা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক হয়ে তা দাঁড়িয়েছিল। প্রতি মুহূর্তে তার চূড়ার দিকে তাকালেই অতীত হিন্দু সংস্কৃতির কথা মানুষের মনে পড়ত। তাই পাক সৈন্য হিন্দু সংস্কৃতি তথা হিন্দু ধর্মের ঐতিহাসিক সত্যকে চিরতরে মুছে ফেলতে মন্দিরটি ধ্বংস করেছিল। এইভাবেই ধ্বংস করেছিল অযোধ্যার রামমন্দির, কাশীর শিব মন্দির ও মথুরার শ্রীকৃষ্ণ মন্দির সহ আরো অন্যান্য মন্দির ও ধর্মস্থান। মুজিবও ইসলামিক জেহাদের কাজটিকে শুধু স্বীকৃতি জানালেন না, পড়ে থাকা মন্দিরের সমস্ত জমিটিও তিনি জবর দখল করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তিনিও ইসলামিক জেহাদের একজন খাঁটি সেনা।

শ্রীগুলজারিলাল নন্দের ঢাকা সফরের পর বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার আমরা ৪০/৫০ জন হিন্দু নেতা দল বেঁধে গিয়ে মুজিবের সঙ্গে দেখা করি ও সরকার কর্তৃক জবর দখল করা মায়ের জমি ফেরত দিতে তাকে অনুরোধ করি। তাকে আরো বলি যে হিন্দুরা তাদের নিজ খরচে আবার সেই মন্দিরটি করতে চায়। তাতে সঙ্গে সঙ্গে মুজিব উত্তর দেন যে, ঐ জমি আর ফেরত দেওয়া যাবে না। আর সেখানে মন্দিরও করতে দেওয়া হবে না। তার বদলে তিনি শ্যামপুর শ্মশানের পাশে ১০ কাঠা জমি দেবেন। সেখানে হিন্দুরা মন্দির করতে পারে।

শ্যামপুর হল ঢাকা শহরের কিছু দূরে দক্ষিণ পাশে শহরতলীর একটা গ্রাম। তবে ঢাকা পৌরসভার মধ্যেই। সেখানে ঢাকা পৌরসভার একটি শ্মশান আছে। একথার পরে ঢাকা হাইকোর্টের প্রবীনতম অ্যাডভোকেট শ্রী রমণীমোহন ভট্টাচার্য মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠার নিয়মকানুন ভালোভাবে বোঝালেন ও বললেন যে ঐ মন্দিরের জায়গাটি কালীমায়ের নামে উৎসর্গিত। ঐ মাকে অন্যত্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। আর ঐ মায়ের মন্দির ধ্বংসের সময় মন্দিরের সেবাইত ও মালিক শ্রী পরমানন্দ গিরি ও তার আত্মীয়স্বজন সহ প্রায় ৪০০ জন মারা গিয়াছে। তাদের আত্মার শান্তির জন্য এতদিনের ঐতিহ্যময় মন্দিরের জায়গাটি ছেড়ে দিতে হিন্দুর পক্ষে তিনি আন্তরিক আবেদন করেছিলেন। তার উত্তরে মুজিব খুব জোরের সঙ্গে স্পষ্ট ভাবে বললেন, ওখানে নতুন করে মন্দির প্রতিষ্ঠা মুসলমানেরা আর বরদাস্ত করবে না। তার পরেও হিন্দুরা তাকে অনুরোধ করতে থাকে। অ্যাডভোকেট সুধাংশু হালদার অবশ্য মুজিবের বক্তব্য মেনে নিয়ে শ্যামপুরে বেশি জমি পাওয়ার জন্য মুজিবকে বলেছিলেন এবং হিন্দুদেরকে মুজিবের প্রস্তাব মেনে নিতে বলেন। এই প্রস্তাবের সবাই বিরোধিতা করেন। এই প্রতিনিধি দলে চিত্তবাবু ও মন্ত্রী ফণী মজুমদারও ছিলেন। চিত্তবাবু ও আমার প্রচেষ্টায় এই প্রতিনিধিদল মুজিবের সঙ্গে দেখা করে। সেই জমি আজ পর্যন্ত মা কালি ফেরত পায়নি। শুনতে পাই হিন্দুরা তাদের প্রচেষ্টা ছাড়েনি। কালি পূজার দিনে তারা সেখানে পূজা দিতে যায়। পুলিশের মার খেয়ে আহত হয়। তবু তাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেই।

ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে সংস্কৃতিরও একটি যোগ থাকে। ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে এক অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের মানুষেরা মেলামেশার সুযোগ পায়। আর যাতায়াতের সংখ্যাও বাড়ে। তাতে সংস্কৃতির আদান প্রদানেরও সুযোগ বাড়ে। জন্মলগ্নের পূর্বে বাংলাদেশে পাটশিল্প ও চা শিল্প ছাড়া অন্য শিল্প সেখানে গড়ে ওঠেনি। তখন পূর্ব পাকিস্তান পণ্য সামগ্রী আনত পশ্চিম পাকিস্তান থেকে।

বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরেই বাংলাদেশ স্বাধীন হতে পারল। সে যুদ্ধে সব রকম ত্যাগ কেবল মাত্র ভারতই স্বীকার করে। যার ফলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতে পারল। যুদ্ধের পরেও মুজিব পাকিস্তানের সঙ্গে বানিজ্য চুক্তি ঠিক রাখলেন। কিন্তু ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য বাড়ালেন না। কেননা মুজিব বুঝেছিলেন বাণিজ্যের সামগ্রীর সঙ্গে ভারতের সংস্কৃতিও স্বল্প পরিমাণে বাংলাদেশে প্রবেশ করবে। তাই তার সঙ্গে ভারতের পাকা বাণিজ্য চুক্তি হয়নি। বনগাঁ যশোহর রেল লাইনের বাংলাদেশ অংশটি তুলে দিলেন তিনি।

শুধু বাণিজ্য চুক্তির বিষয় নয়, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অনেক বিষয় নিয়ে সমস্যা ছিল। এখনও আছে। দুটি বন্ধু রাষ্ট্র একত্রে বসে আলোচনার মাধ্যমে তার মিমাংসা করার চেষ্টা মুজিব করেন নি। কারণ আলোচনার মাধ্যমে মিমাংসা হয়ে গেলে তাতে ভারত বিরোধী প্রচার বন্ধ হয়ে যাবে। এই কারণেই ছিটমহল সহ আরও অনেক সমস্যা মিমাংসার জন্য আলোচনার চেষ্টা হয়নি। এমনকি গঙ্গার জল সহ আরও অনেক নদীর জল বন্টন নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে মিমাংসার জন্যও তেমন চেষ্টা হয়নি। মুজিব ইচ্ছা করেই এই সব সমস্যা ঝুলিয়ে রেখেছিলেন।

এভাবে চলতে থাকলেও শ্রীমতি গান্ধির বার বার তাগিদের পর উভয়ের মধ্যে আলোচনার জন্য একটা নির্দিষ্ট তারিখ ঠিক হল। তার পরেই রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত মুজিবের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি মুজিবকে বলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি গান্ধি বিরাট ব্যক্তিত্বশালী মহিলা। তার সঙ্গে দেখা করার আগে মুজিবের উচিৎ রাশিয়ার রাষ্ট্র প্রধান ব্রেজনেভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। সেই সাক্ষাতের পরেই বিশেষ বুদ্ধি ও শক্তি নিয়ে তিনি দিল্লীতে গিয়ে আলোচনা করলে তার পক্ষেই ভালো ফল হবে। তিনি মুজিবকে স্মরণ করিয়ে দেন যে প্রতিবেশী রাষ্ট্র স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেক রাষ্ট্রের শত্রু হয়। কোনো দুর্বলতার সুযোগ পেলেই সে সহজে আঘাত করার সুযোগ পায়। তার জন্য প্রতি রাষ্ট্রের পাশের রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কে বন্ধুভাব দেখিয়েও সব সময় হুঁশিয়ার থাকতে হয়। তাছাড়া শক্তিশালী ভারতের সঙ্গে আলোচনা করার আগে একটা বৃহৎ শক্তিশালী রাষ্ট্রের পরামর্শ নেওয়া মুজিবের একান্ত উচিৎ। আর সেই সঙ্গে ব্রেজনেভও ভারতের সঙ্গে আলোচনায় বসার আগে মুজিবের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চান। সেই সময়ের পরিবেশে মুজিব যে ভারতকে ভালো চোখে দেখেন না তা রাশিয়া অনেক আগেই টের পায়।

পাকিস্তান থেকে মুজিবের দেশে ফেরার পরে রাশিয়া মুজিবের প্রতিটি পদক্ষেপ গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য করছিল। সে দেখেছে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ভাঙা সারাপু

মেরামতির সব টাকা ভারত সরকার দিয়েছে। ভারতের ইঞ্জিনিয়ার ও অভিজ্ঞ উপদেষ্টার চেষ্টায় দিন রাত কাজ করে অল্পদিনের মধ্যে ভারত ব্রীজটি মেরামত করল। আর সেই ব্রীজটি খোলার দিনের অনুষ্ঠানে মুজিবের হেলিকপ্টারে সীট খালি থাকা সত্ত্বেও ভারতের হাই কমিশনারকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এলেন না, সঙ্গে নিয়ে এলন ব্রিটিশ হাই কমিশনারকে। তার পরেও একটা সিট খালি ছিল। শুধু তাই নয় ভারতের রেলমন্ত্রী দিল্লি থেকে গেলে তাকেও তেমন সম্মান দেওয়া হল না। এমনকি সেদিন মুজিব তাঁর বক্তব্যে ভারতের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতার কথাও তেমন ভাবে প্রকাশ করেন নি। পরের দিন ইঞ্জিনিয়ার সহ ভারতের নাগরিকদের বিশেষ অসম্মানের মধ্যে দেশে ফিরে আসতে হয়েছে। কারও কারও উপরে দৈহিক নির্যাতন হয়েছিল। অনেক অকথ্য ভাষা তাদের পরে প্রয়োগ করা হয়েছিল। সে খবর ভারতের সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়েছিল।

বাংলাদেশ সরকারের ঢাকা ফেরার সময় পূর্বের ৭ দফা চুক্তি ছাড়া আরও একটি গোপন বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তি ভরত ও বাংলাদেশের মধ্যে সাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তিতে স্বীকার করা হয় যে, উভয় রাষ্ট্রের অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ গড়ে তুলতে উভয় রাষ্ট্র আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে। ভবিষ্যতে এক রাষ্ট্রের নাগরিক অন্য রাষ্ট্রে গেলে তাকে সে রাষ্ট্রের নাগকিত্ব দেওয়া হবে না। আর যে দেশ থেকে যাবে সে দেশ তাকে বা তাদের ফিরিয়ে নিতে বাধ্য থাকবে। আর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের মধ্যে তেল অনুসন্ধানের জন্য উভয় রাষ্ট্রের একটি যৌথ কমিশন কাজ করবে। তারা জরিপ চালাবে। আর তেলের সন্ধান পেলে যৌথ ভাবে তা তোলার ব্যবস্থা করবে। এই তেল অনুসন্ধানের কাজ চুক্তিমতো না করে প্রথমেই মুজিব তা আমেরিকার হাতে তুল দিলেন। তার ফলে সে ভাবেই তেল অনুসন্ধানের কাজ শুরু হয়।

সমুদ্র উপকূলে জরিপ করতে করতে আমেরিকার জাহাজে বাংলাদেশের নেভিকে সঙ্গে নিয়ে তালপট্টি তথা পূর্বাসা দ্বীপের কাছে এলেই ভারতের নৌবাহিনী তাদের বাধা দেয়। ভারতীয় বাহিনী পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয় যে বাংলাদেশি নৌবাহিনীর জাহাজ সীমান্তে পৌছেছে। তার পরে আর একটুও অগ্রসর হওয়ার সুযোগ তাদের দেওযা হবে না। এই নিষেধ অমান্য করেই তারা সামনের দিকে অগ্রসর হতে চেষ্টা করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল নূতন পূর্বাসা দ্বীপের দখল নেওয়া। ভারতীয় বাহিনী তাদের জাহাজ উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়। তাতে শেষ পর্যন্ত তারা ফিরে যেতে বাধ্য হয়। তার পরেই পূর্বাসা দ্বীপ তাদের বলে চিৎকার শুরু করে।

দুদেশের মধ্যে সম্পর্কের এরূপ ভাবে ফাটলের রূপ নেয়। অনেক খবর জেনেই রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে মুজিবকে রাশিয়া যাওয়ার জন্য ব্রেজনেভের এ আমন্ত্রণ। মুজিবও এই সময়োপযোগী আমন্ত্রণ পেয়ে খুব খুশি হন। রাশিয়া যাওয়ার সম্মতি জানান। অথচ দিল্লি যাওয়ার কর্মসূচি বাতিল করাও তার পক্ষে কঠিন কাজ ছিল। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। তার জন্য দিল্লি বৈঠকের ৪/৫ দিন আগে পেট ব্যাথায় মুজিব ভীষণভাবে কাতর হয়ে পড়েন। ভারত তার চিকিৎসার সব ব্যবস্থার দায়িত্ব নেবার আশ্বাস দিয়ে তাকে দিল্লি আসতে অনুরোধ করল। সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়াও তার চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে চাইল।

এভাবে দিল্লির বৈঠক স্থগিত রেখে ১৯ শে মার্চ '৭৮ তারিখে মুজিব চলে গেলেন মস্কোতে। ভাবটা এমন যে সুচিকিৎসার জন্যই মুজিব রাশিয়া গেলেন। এই ভাবেই পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রের প্রধানের উপদেশ নিতেই তিনি সেখানে গেলেন। আর সেখান থেকে ফিরে এসে ভারতের সঙ্গে বিশেষ আলোচনার জন্য নূতন তারিখ ঠিক করে নির্দিষ্ট আলোচনাও করেন। ১২ই মে '৭৪ তার দিল্লি যাত্রা। সব বিষয়গুলিই ঝুলিয়ে রেখে কোনো কিছু ফয়সালা নাকরে এমন কি গঙ্গ ার জল বন্টন চুক্তি ঝুলিয়ে রেখে তিনি দেশে ফিরে যান। যাতে জল নিয়ে জল ঘোলা করা যায়। আলোচনার পর দুদেশের মধ্যে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ লোক দেখানো চুক্তি সাক্ষরিত হয়। তার গুরুত্ব অবশ্য কাগজে কলমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

কিছু ঘটনা

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের মনোবল শতগুণ বেড়ে যায় বিশেষ করে গোপালগঞ্জ ও তার আশপাশ অঞ্চলের নমঃ সমাজের হিন্দুরা তাদের হারানো অতীতের মনোবল ফিরে পায়। সাময়িক ভাবে তাদের মনে তেজ বীর ফিরে আসে। তাই ভারতের সামরিক বাহিনী বাংলাদেশে ঢোকার পিছনে পিছনে তারাও বাংলাদেশে ঢুকতে শুরু করে। ক্যাম্পের প্রাপ্য টাকা না নিয়ে ক্যাম্প ভাঙার আগেই তারা অনেকে দেশে চলে যায়। বাড়িতে ফিরে গিয়ে তারা দেখতে পায় অনেকের ঘর নেই। আসবাবপত্র, গরুবাছুর, হাঁসমুরগী, ঘাটের নৌকার প্রশ্ন তো আসতেই পারে না। কেননা তা সবই লুঠপাঠ হয়েছে। তাই যেখানে তাদের নৌকা বাড়ির আসবাবপত্র দেখেছে তা তারা কাউকে কোনো প্রশ্ন না করে দল বেঁধে গিয়ে নিয়ে এসছে। এমন কি যে সব মুসলমানদের বাড়িতে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হওয়ার পূর্বে টিনের ঘর ছিল না তাদের বাড়িতে টিনের ঘর দেখলে হিন্দুরা দল বেঁধে গিয়ে সেসব থেকে সব পুরানো টিন খুলে নিয়ে এসেছে। এভাবে ভারতীয় সেনা বাংলাদেশে

থাকা পর্যন্ত কোনো মুসলমানকে তারা ভয় করেনি। আর কোনো মুসলমানও তাদের বাঁধা দিতে সাহস পায়নি। কেননা তাদের বেশিরভাগই ছিল নৃশংস অত্যাচারী ও লুণ্ঠনকারী। কাজেই তাদের পূর্ব অপরাধের জন্য তারা ছিল ভীত ও সন্ত্রস্ত। ভারতের সেনাবাহিনী সেখানে যতদিন ছিল ততদিন হিন্দুরা এভাবে দাপটে চলেছিল।

একদিন হাটের শেষে অন্ধকার রাত্রে কয়েকজন মুসলমান বাড়িতে ফিরছিল। চলার পথে হিন্দুদের ব্যবহারের কথা আলোচনা করতে করতে হাঁটছিল। সেই আলোচনায় একজন বলে, "মশায়রা হিন্দুস্থান থেকে কি শক্তি নিয়ে এসছে? যার জন্য তারা এত সাহস পাচ্ছে।" তাদের কথা শুনতে শুনতে একজন হিন্দু তাদের পিছনে হাঁটছিল। অন্ধকারের মধ্যে মুসলমানরা তাকে দেখতে পায়নি। "মশায়রা কি শক্তি নিয়ে ফিরে এসছে" একথা শুনেই সে দৌড়ে মুসলমানদের সামনে বলে — "শোন মিয়ারা, হিন্দুরা হিন্দুস্থান থেকে যে শক্তি নিয়ে ফিরে এসছে তার আট আনামাত্র তোমরা দেখছ। আর বাকি আট আনা তাদের ট্যাগরে আছে। মনে রেখ এবার নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। প্রাণ বাঁচাতে লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান হয়েছিল। তারা সবাই আবার হিন্দু হয়েছে। পূর্বে এ সুযোগ ছিল না। রুদ্ধদ্বার এবার খুলে গেল।"

তারপর ভারতের সেনারা ভারতে চলে এল। আর গেপালগঞ্জে একটি জনসভায় মুজিবের সামনে মুজিবের একান্ত আপনজন মন্ত্রী মোল্লা জালালুদ্দিন ঘোষণা করলেন "মশায়রা পেয়েছে কি? তারা কি মাগি রাজত্ব পেয়েছে? বেল পাকলে কাকের কি?" সেই ঘোষণার পরেই মুসলমানরা তাদের শক্তি ফিরে পেল। আর ক্রমে ক্রমে তা বাড়তে থাকল। তার সঙ্গে হিন্দুদের উপর নতুন করে অত্যাচারের মত্রা বাড়াল। তার ফলে এই সব অল্প বুদ্ধির হিন্দুরা মুসলমানদের অত্যাচারে দেশ ত্যাগ করে পালিয়ে এসে আবার ভারতে আশ্রয় নিতে শুরু করল।

ভারতের সেনা ভারতে চলে আসার পরে একদিকে মোল্লা জালালের এই ঘোষণা — অন্যদিকে ভাসানীর নেতৃত্বে জেলমুক্ত জেহাদি সেনাদের ভারত ও হিন্দু বিরোধী প্রচার শুনে সাধারণ মুসলমানদের বেশির ভাগের মনে সাম্প্রদায়িক ভাব সাড়া দেয়। সমস্ত দেশ জুড়ে সাম্প্রদায়িকতা ও ভারত বিরোধিতা নতুন করে জেগে ওঠে। তাদরে প্রচার ছিল "ভারত লুঠেপুটে বাংলাদেশ থেকে সব নিয়ে গেল। হিন্দুরা তাতে সব রকমের সাহায্য করছে —" আর গোপনে প্রচার করতে থাকল — "এ কারণেই ভারত পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ করেছে।" এসব প্রচার সেখানের মুসলমানরা বিশ্বাস করতে শুরু করল। তারা এভাবে প্রচারের মাত্রা চরমে

তুলল। তারা এমনও প্রচার করতে শুরু করল যে — হিন্দুস্থান বাংলাদেশ থেকে সব নিচ্ছে। এমনকি বুড়িগঙ্গার পানি জাহাজ ভর্তি করে তারা নিতে শুরু করেছে। হিন্দুস্থান বাংলাদেশকে শুধু ভাতে মারবে না পানিতেও মারবে।" এসব প্রচারে সেখানে এক ভয়ানক পরিস্থিতি দেখা দেয়। তার জন্যই ভারত দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি শ্রীমতি অরুন্ধতী ঘোষ (আই. এ. এস.) কে সেক্রেটারিয়েটের কর্মচারিরা মুজিবের অফিসের সামনে সেক্রেটারিয়েটের মধ্যে আক্রমণ করতে সাহস পায়। ভারতের ইনফরমেশন অফিস আক্রমণ করে ভাঙচুর করে। এ সবের সঙ্গে চলতে থাকে হিন্দুর সুন্দরী মেয়েদের জোর করে ধরে নিয়ে বিয়ে করা। এভাবে একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীর নাতনীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে ধরে নিয়ে এক মন্ত্রীর বাড়িতে আটকে রাখে। তার আত্মীয়স্বজন শত চেষ্টা করেও তাকে উদ্ধার করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত ভারত সরকারের সরাসরি চাপে মুজিবের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় মেয়েটিকে উদ্ধার করা হয়। এরূপ একজন সাব রেজিস্টারের মেয়েকে জোর করে ধরে নেওয়ার পরে হিন্দুদের চরম চাপের মুখে মেয়েটিকে উদ্ধারের হুকুম মুজিব দিলেও সে মেয়েটিকে উদ্ধার করা যায়নি। কারণ কিছুদিন পরে জেলা মেজিস্ট্রেট জানায়, মেয়েটি সাবালিকা, সে ইচ্ছা করে মুসলমান হয়ে একজন মুসলমানকে বিয়ে করেছে। তারা সুখে শান্তিতে ঘর সংসার করছে। সেখানে তার করণীয় কিছুই নেই।

এ সময় আর একটি কাজ তারা পরিকল্পিতভাবে করতে থাকল। ধনী, বর্ধিষ্ণু হিন্দু গ্রামের ও সমাজনেতাদের তারা ঠান্ডা মাথায় খুন করতে থাকল। যাতে হিন্দুরা প্রাণের ভয়ে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়। আর মুসলিম দেশটি কাফের শুন্য হয়। তার জন্যই বাংলাদেশ হওয়ার পরে ১ কোটি [illegible] লক্ষ হিন্দু ভারতে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এমনকি ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীও তা স্বীকার করে পার্লামেন্টে তা ঘোষণা করে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সাংবাদিক, লেখক ও ঐতহাসিকদের মনে তা কিছুতেই নাড়া দিতে পারছে না। তারা তথাকথিত অসাম্প্রদায়িক রোগে ভুগছেন। সত্য কথা বললেই সাম্প্রদায়িকভাবে চিহ্নিত হওয়ার ভয় তাদের মনে আছে। তাই তারা একেবারে নীরব। ভোট ভিখারি রাজনৈতিক দল এবং নেতারাও এ ব্যাপারে নীরব।

এসব খুন জখম গ্রামের দিকে হামেশাই ঘটছিল। তার মধ্যে মাত্র কয়েকটি ঘটনা নমুনাস্বরূপ উল্লেখ করছি। বরিশালের জুশখোলা গ্রামের যজ্ঞেশ্বর মন্ডল ছিলেন একজন ধনী, সমাজসেবী গ্রাম্যনেতা, নাতিসহ তাকে খুন করা হয়। তার ছেলে ডাঃ বি. কে. মন্ডল – এম. আর. সি.পি (লন্ডন)। তিনি লন্ডনের উচ্চতম পদের একজন মেডিকেল অফিসার। এক নাতি ডাঃ কে এন মন্ডল, এম. আব. সি.

পি(লন্ডন) এম. ডি. (ইউ. এস. এ.)। তিনিও আমেরিকার উচ্চতম পদের একজন মেডিকেল অফিসার। খুন করা হয় পশ্চিমবাংলার কংগ্রেস নেতা সৌমেন মিত্রের কাকা বিনয় মিত্রকে। তাঁর বাড়ি ছিল নড়াইলের গোবরা গ্রামে। সাতক্ষীরার ধনী ও সমাজসেবক অনিল স্বর্ণকার, বরিশালের সুখরঞ্জন রায়,সহ অনেককে খুন করা হয়। এসব খুন সেখানের সর্বহারারা করছে বলে, পুলিশ সেসব খুনিদের কাউকেই খুঁজে পায় না। বিচারের প্রশ্ন তো অনেক পরের কথা। এসব খুন পরিকল্পনা মতোই চলছিল।

একদিকে এসব খুন, অন্য দিকে ব্যপক হিন্দু বিরোধী প্রচার দেখে হিন্দুরা ভীত হয়ে পড়ে। সঙ্গে ভারত বিরোধী প্রচারও সমানে চলতে থাকে। এই প্রচার ও সঙ্গে হিন্দু হত্যা দেখে ভীত হিন্দুরা বাঁচার জন্য যেমন মুজিবের কাছে আবেদন জানাতে থাকে; তেমন ভারতের দূতাবাসেও তাদের আবেদন পৌছে যায়। এই প্রচার বন্ধ করার জন্য মুজিব তার দল আওয়ামি লিগ সহ তথাকথিত অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিবাদ ধ্বনি উচ্চারিত হল না। তখন বাধ্য হয়ে ভারতের রাষ্ট্রদূত ঈষৎ প্রতিবাদ জানান। তাতে দলমত নির্বিশেষে বাংলাদেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। তার প্রতিবাদে সবাই বলে যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের রাষ্ট্রদূতের নাক গলাবার কোনো নৈতিক অধিকার নেই। তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলে ভবিষ্যতে এই চর্চা বন্ধ না করলে তার ফল হবে ভয়াবহ।

একটি ঘটনাই মুজিবের মানসিকতার পরিচয় দেবে। চিত্তবাবুর পাশের গ্রামে প্রভাবতী মাঝি নামে একটি মেয়ে কলেজে পড়ত। চিত্তবাবু ও আমি তাকে ভালোভাবে চিনি। কলেজে পড়তে পড়তে সে কোথায় চলে গেল। তার খোঁজ পাওয়া গেল না। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পড়ে সে আওয়ামি লিগ অফিসে যাতায়াত করতে লাগল — তখন তার পরিচয় হল প্রফেসর মিসেস আলি এম. এ.। দেশে ফেরৎ হিন্দু শরণার্থীদের জন্য ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের মধ্যে মুজিব হিন্দু মহলে তাকে পাঠাতে থাকলেন। তাতে হিন্দুরা অখুশি হলেও পেটের দায়ে তার হাত থেকে ত্রাণ সামগ্রী নিতে বাধ্য হত। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল মুজিব তাকে আওয়ামি লিগের নমিনেশন দিয়ে এম. এন. এ. (এম. পি.) করল। তাতে সহজেই হিন্দুরা বুঝতে পারল পাকিস্তানের মতো বাংলাদেশেও কোনো হিন্দু মুসলিম হলে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্মান তার বাড়ে। টাকা পয়সার কোনো অভাব থাকে না। মন্ত্রী বা সাংসদ করে এভাবে উপহার দিয়ে অন্য হিন্দুদের এ পথে টানতে টোপ দেয়। মুজিব নিজেই তার উদ্যোক্তা।

অদৃষ্টের পরিহাস

মুজিবের গ্রামের বাল্যজীবন, গোপালগঞ্জ ও কলকাতার ছাত্রজীবনের কথা দূর থেকে শুনে জেনেছি। আর ঢাকায় কাছ থেকে তার রাজনৈতিক ও ব্যক্তি জীবনের কর্মধারা দেখেছি ও তাকে ভালোভাবে বোঝার সুযোগ পেয়েছি। সেজন্য প্রথম দিকে তার জীবন ও চরিত্রের চুলচেরা বিচার আমরা করেছি হিন্দুদের স্বার্থের জন্যই। তার স্বায়ত্বশাসনের দাবিকে আমরা পূর্ণ সমর্থন করেছি। কিন্তু তারই প্রস্তাবিত স্বাধীন পূর্ববঙ্গ গঠনে সমর্থন দিলেও তাকে আমরা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারিনি। বিশ্বাস করতে পারিনি বলেই স্বাধীনতা সংগ্রামকালে করিম ও আলি আহ্মদকে প্রস্তুতি নিতে উদ্বুদ্ধ করেছি। হিন্দু ছেলেদের গোপনে আলাদাভাবে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করি, শ্রীমতি গান্ধির কাছে স্মারকলিপি পাঠাই। বিশ্বাস করতে পারিনি বলেই দেশে ফিরে না গিয়ে সেখানের হিন্দুদের প্রাণ বাঁচাতে নতুন করে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাতে শপথ নিই। চিত্তবাবুও ব্যক্তিগত ভাবে বিশ্বাস করতে পারেননি বলেই বাংলাদেশের এম. এন. এ. (এম. পি.) হয়েও তার স্ত্রী ও ছেলেকে কোনোদিন বাংলাদেশে যেতে দেননি। অর্থাৎ কোনোদিন বাংলাদেশে তারা যায়নি।

সেদিন ভারতের বিশেষ বিশেষ নেতা, মানবদরদী ও সমাজসেবীদের কাছে এমন কি ভারত সরকারের কাছেও বাংলাদেশের হিন্দুদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার জীবনের কথা বলেছি। সে আবেদনে তারা কেউ সাড়া দেননি। উল্টে অভয় দিয়েছেন। আর দিয়েছেন দেশে ফেরার উপদেশ। তাতে আমরা আশ্বস্ত হইনি। পূর্ব সিদ্ধান্তে আমরা অটল থাকি । তা সত্ত্বেও একদিকে জন্মমাটির টান আর অন্য দিকে এখানে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা না থাকায় বাধ্য হয়ে সাময়িকভাবে ঢাকায় ফিরে যাই।

ঢাকায় ফিরে গিয়ে দেখি বাড়িটি লন্ডভন্ড হয়ে আছে। ঘরের দরজা জানালা সহ সব আসবাবপত্র উধাও। ডিসপেন্সারীর কোনো চিহ্ন নেই। গাড়িটিরও হদিশ নেই। কাছে টাকা পয়সা নেই। আগেই বলেছি ৮৫ হাজার টাকা (৫০০ টাকার নোট) অচল হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও সেখানে অতি কষ্ট করে মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করি। কিছুদিন পরে কলকাতা এসে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য যে বাড়িতে এখন বাস করছি সে বাড়িটি ভাড়া নিতে মালিক লোকনাথ ঘোষালের সঙ্গে দেখা করি। তিনি নামে আমাকে চিনলেন ও আমাকে বললেন, "আপনি আমার রাজনৈতিক গুরু ত্রৈলোক্য মহারাজের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন। মহারাজ কলকাতা এসে মরার আগে আমাকে বলেছিলেন। তাঁর কোনো ছেলেমেয়ে নেই কিন্তু ঘরবাড়ি জমিসহ অনেক সম্পত্তির মালিক তিনি। আপনি বিনা পারিশ্রমিকে গুরুদেবের

চিকিৎসা করেছেন। এমন কি বার বার মৈমনসিংহে তাঁর বাড়ি কাপাসহাটিয়াতেও গিয়েছেন — যাওয়া আসার ভাড়াও আপনি নেননি। তাই যতদিন সক্ষম না হচ্ছেন ততদিন এই বাড়িতে আপনি বিনা ভাড়ায় থাকবেন। তবে আপনি কিনলে আমি খুব কম দামে আপনার কাছে বাড়িটি বিক্রি করব।" শেষ পর্যন্ত তার কথামতো খুব কম দামে ৫ বছর ৫টি কিস্তিতে টাকা দেওয়ার পরে দলিল দেওয়ার স্বীকৃতিতে চুক্তি হয় ও ঐ বাড়িতে বাসের জন্য আমি উঠি। ৫ বছর পরে কবলা দলিলের ভিত্তিতে '৭৬ সালে ও বাড়ির মালিক আমি হই।

এভাবে বাসের বাড়ির ব্যবস্থা হলেও আয়ের জন্য পেশা চালাবার ব্যবস্থা করতে বার বার কলকাতায় আসি। এখানে কিছুদিন বাস করার পরে চলে যাই ঢাকা। কেননা আমার পরিবারের অন্য সবাই তখন ঢাকায় বাস করছে। এখানে আয়ের ব্যবস্থা না করে তাদের কলকাতায় আনা সম্ভব ছিল না। একবার কলকাতা থেকে ঢাকা গিয়ে জানতে পারি মুজিবের আহ্বানে ও চিত্তবাবু ও বীরেনবাবুর প্রচেষ্টায় গণমুক্তি দলের বিশেষ বিশেষ নেতা আওয়ামি লিগের সঙ্গে মিশে যেতে চায়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি তাতে সম্মতি জানাই। রাজার দলে মিশে তারা সেখানে সুখে শান্তিতে বাস করতে চায়। তাতে আমি বাধা দেব কেন? আর আমি তো সেখানে থাকছি না। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও সম্মতি দিলেও আমি ও গণমুক্তি দলের যুগ্ম সম্পাদক মলয় রায় ঢাকায় থেকেও আমরা সেই মিলন সভায় যোগ দিইনি। কেননা গলা টিপে নিজের ছেলেকে মারা যায় না! ঐ সভায় উপস্থিত হয়ে অ্যাডভোকেট শুধাংশু হালদারও গণমুক্তি দলের সঙ্গে আওয়ামি লিগে যোগ দেন।

চিত্তবাবু ও বীরেনবাবু মুজিবকে গণমুক্তি দল দান করলেন। মুজিব প্রতিদানে চিত্তবাবুকে করলেন এম. এন. এ. (এম. পি.) আরো অনেক কিছু দিলেন। বীরেনবাবুকে করলেন রূপালি ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর, গোপালগঞ্জ জিলা বাকশাল কমিটির সেক্রেটারি ও জেলা স্কুল বোর্ডের সদস্য। সাতপাড় কলেজের অনুমোদন দিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন উপেক্ষা করে থার্ডক্লাস এম. এ. হওয়া সত্ত্বেও বীরেন বাবুকে অধ্যক্ষ পদে আসীন রাখলেন। তার স্ত্রী পেলেন এম. পি. পদ আর ভাই পেলেন সারা বাংলাদেশের ভারতীয় ভিসার এজেন্সি। আর তাঁর গ্রামটি মুকসেদপুর থানা থেকে কেটে গোপালগঞ্জ থানায় তিনি আনলেন।

১৯৭৩ সালের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে চিত্তবাবু আওয়ামি লিগের নমিনেশন পান। ঘুমন্ত গণমুক্তি দলের একমাত্র তিনিই নমিনেশন পান। আওয়ামি লিগ বা মুজিবের উপরে কোনো বিশ্বাস না থাকলেও চিত্তবাবুর উপর থেকে তখনও

একেবারে বিশ্বাস আমি হারাইনি। তাই তার পক্ষে প্রচারে নেমে পড়ি ও একটানা একমাস প্রচার চালাই। মনে পড়ে বাটনাতলায় নির্বাচনসভায় আমি তাকে "মুক্তিদূত" আখ্যা দিই। বিপুল ভোটে চিত্তবাবুর জয়ের খবর শুনে ওদিনই কলকাতায় চলে আসি। ইচ্ছা করেই তার বিজয় উৎসবে যোগ দিইনি। কিন্তু তার সঙ্গে যোগাযোগ স্বাভাবিক থাকলো। তার বেশ কিছুদিন পর আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য কলকাতায় ৭৩ সালের শেষের দিকে চলে আসি। তার পরেও বিশেষ কারণে চিত্তবাবু খবর দিলে মাঝে মাঝে আমি ঢাকা যাই। আর সেখানে বাংলাদেশের হিন্দুদের নিরাপদে বাসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করি। সিদ্ধান্তও সেভাবে নেই। এভাবে বাংলাদেশে গেলেই সেখানের হিন্দুদের করুণ দুরবস্থা নিজ চোখে দেখতে ও তাদের বেদনার কথা নিজ কানে শুনতে দক্ষিন বঙ্গের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে আমি যাই। কয়েকবার আমার সফর সঙ্গী হন বাটনাতলার শ্রী নিরঞ্জন মন্ডল (নলিনী) বর্তমানে তিনি বড়িশা বিবেকানন্দ হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক।

বাকশাল

আগেই বলা হয়েছে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সেরে মুজিব দেশে ফিরলেন। পরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি গান্ধির সঙ্গে আলোচনা বৈঠকে বসলেন। বেশিরভাগ সমস্যার সমাধান না করে তা ঝুলিয়ে রেখে কিছু মামুলি সিদ্ধান্ত দুজনে নিলেন — আর লোক দেখানো একটা চুক্তিতেও সই করলেন। কিন্তু উভয় দেশের সাধারণ মানুষ বুঝতে পারল ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখার চেয়েও মুজিব রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধনকে বেশি গুরুত্ব দিতে আগ্রহী। কেননা মুজিব ভালোভাবে বুঝেছিলেন — রাশিয়া বাংলাদেশের অনুকূলে থাকলে ভারতকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

রাশিয়া তখন পৃথিবীর একটা অন্যতম বৃহৎ শক্তি। তাই রাশিয়ার আশ্বাসে ও পরামর্শে রাশিয়ার মতো বাংলাদেশেও মুজিব একদলীয় শাসন ব্যবস্থা চালু করতে সাহস পান। এতদিনের ঘোষিত ও পোষিত গণতন্ত্রের বুকে শাণিত ছোড়া বসিয়ে তাকে হত্যা করতে পারেন। আর তারই আওয়ামি লিগ সহ সমস্ত রাজনৈতিক দলকে হত্যা করার পরে গঠন করতে পারেন বাকশাল (বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক লিগ)।

অনেকের ধারণা ব্রেজনেভকে সন্তুষ্ট করতেই রাশিয়ার মতো বাংলাদেশেও মুজিব একদলীয় শাসন ব্যবস্থা চালু করলেও মুজিবের মনে ছিল ইসলাম তথা

কোরান হাদিসের নির্দেশিত পথে খলিফার একনায়কতান্ত্রিক ক্ষমতা হাতে নেওয়া। তাতে বাংলা ভারতের কমুনিষ্ট পার্টি তাকে সমর্থন দিলেও সেখানের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলি ও গণতান্ত্রিক ব্যক্তিমানুষের দল তাতে সমর্থন দেয়নি। বিশেষ করে বেশির ভাগ ছাত্রযুবকের দল তা মেনে নেয়নি।

এই শাসনব্যবস্থার নতুন রূপ দিতে তিনি দেশের মহাকুমাগুলিকে জেলা ঘোষণা করেন। প্রতিটি জেলার শাসনতান্ত্রিক সব ক্ষমতা দেওয়া হল বাকশাল মনোণিত একজন রাজনৈতিক নেতাকে। তাকে বলা হবে গভর্নর। তাছাড়া রাজনৈতিক কাজ চালাতে প্রতিটি জেলায় বাকশাল কমিটিও থাকবে। সে কমিটির প্রধান হবেন একজন সভাপতি। এভাবে বাংলাদেশের ৬১ টি জেলার গভর্নরের নাম ঘোষিত হল — তাতে একজন হিন্দু স্থান পেল — আর বাকশাল কমিটির সভাপতির নামের মধ্যে কোন হিন্দুর নাম দেখা গেল না।

অন্যদিকে দেখা গেল রাশিয়ার বিমানে চড়ে হাজার হাজার ছাত্র কারিগরী শিক্ষা নিতে রাশিয়ায় যাওয়া শুরু করল। তাদের যাওয়া-আসা, থাকা-খাওয়া, বই পুস্তক সহ সব খরচ রাশিয়া সরকার বহন করবে। কারিগরি শিক্ষার সঙ্গে সমাজতন্ত্রের বাস্তব শিক্ষাও তারা সেখানে নেবে কিন্তু মুজিব ভালোভাবে জানতেন দেশে ফিরে তারা সবাই রাশিয়ার সমাজতন্ত্র ভুলে ইসলামিক সমাজতন্ত্রী হবে। কারণ বাংলাদেশের পরিবেশ তাদের ইসলামিক সমাজতন্ত্রী হতে বাধ্য করবে। মুজিবের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলামিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। তাই রাশিয়ায় যেমন গণতন্ত্র নেই বাংলাদেশেও গণতন্ত্র থাকবে না। তিনি ভালোভাবে জানতেন ইসলাম ও কমুনিষ্ট ধর্মে গণতন্ত্রের কোনো স্থান নেই। গণতন্ত্র ইসলাম ও কমুনিষ্ট ধর্মের শত্রু। তাই পৃথিবীর মুসলিম প্রধান দেশে ও কমুষ্টি শাসিত রাষ্ট্রে কোথাও পূর্ণ গণতন্ত্রের কোনো স্থান নেই। ঘরের পাশের ভারতের গণতন্ত্রকে মুজিব খুব ভয় করতেন। তাই ভারত থেকে দূরে থাকতে মুজিব মনে প্রাণে চান। তিনি ভালোভাবেই বুঝেছিলেন রাশিয়ার সামরিক শক্তি সেখানের শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে। সেখানে প্রোলেটারিয়েট রাজ কায়েমের নামে জনসাধারণকে ধোঁকা দিচ্ছে। তিনিও বাংলাদেশে কোরান হাদিশের নির্দেশিত পথে সামরিক শক্তির সাহায্যে দেশের জনগণকে ও রাশিয়াকে ধোঁকা দিয়ে খলিফার একনায়তন্ত্র চালাতে চান।

ঈশান কোণে কালো মেঘ

অনেকদিন পরে ঢাকা থেকে চিত্তবাবু ফোনে জানালেন, পরের দিন বিশেষ জরুরি কারণে আমাকে অবশ্যই ঢাকায় পৌঁছতে হবে। সে তারিখটি ছিল ১৮ই

জুলাই '৭৫। তখন হাতে টাকা না থাকায় একমাত্র শেষ সম্বল স্ত্রীর হার-বন্ধক রেখে সুদে ৪০০ টাকা নিয়ে পরের দিন খুব ভোরে ঢাকার পথে যাত্রা করি। রাত্রে চিত্তবাবুর বাসস্থান, এম. এন এ হোস্টেলে পৌঁছাই। সেখানে প্রাক্তন গণমুক্তি দলের কয়েকজন নেতা বিশেষ আলোচনায় বসেছিল। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতির বিশ্লেষণ ও তার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুদের করনীয় কি? সমস্ত রাত ধরে সে আলোচনা চলে। বিভিন্ন নেতা তাদের মতামত প্রকাশ করেন। তাতে পরস্পর বিরোধী মত প্রকাশ পায়। তবে শেষ সিদ্ধান্ত হয় — দেশের পরিস্থিতির বাস্তব রূপ জানার জন্য দুটি দল বেরিয়ে পরবে পরের দিনই। তারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে সর্বস্তরের মানুষের মনোভাব জানবে। পরবর্তী ২৮শে জুলাই তাদের রিপোর্ট জানাতে আবার বৈঠকের তারিখ নির্দিষ্ট হয়। সিদ্ধান্ত মতো পরের দিন দুটি দল বেরিয়ে পড়ে। আমার অধীনে একটি দল আর অধ্যক্ষ বীরেন বিশ্বাসের অধীনে ছিল অন্য দলটি। আট নয়দিন ধরে বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে বিভিন্ন কায়দায় দেশের পরিস্থিতির কথা তুলে সাধারণ মানুষের মনোভাব জানতে চেষ্টা করি। পূর্ব সিদ্ধান্ত মতো সবাই ফিরে এসে নির্দিষ্ট দিনে আবার বৈঠকে বসি। সবার মতানুসারে আমি প্রথমে আমার রিপোর্ট পেশ করে বলি — দেশের অবস্থা খুব খারাপ। বেশির ভাগ বললে ভুল হবে প্রায় সব মানুষই মুজিবের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছে, তার কর্মধারা, স্বজনপ্রীতি, বিশেষ করে একদলীয় শাসন চালু করায় প্রায় সব মানুষই তার বিরুদ্ধে চলে গিয়েছে। ছাত্র যুবকের দলই তার উপর বেশি চটেছে। আর মৌলবাদীরা প্রথমে মুজিবের মদতে ভারত বিরোধী বক্তব্য বলার সুযোগ পেলেও শেষ পর্যন্ত তারা মুজিবকে ভারতের দালাল বলছে। তারা গোপনে জোরালোভাবে প্রচার করছে ভারতের চক্রান্তের শিকার হয়ে মুজিব পাকিস্তানকে ভেঙ্গেছে। যার ফলে সাধারণ মানুষ পথে বসেছে (তখন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল চরম অবনতির পথে)। তাদের প্রচার এভাবে চলছিল। আর সাধারণ মানুষও দেখল বাংলাদেশ হওয়ার পরে তাদের রুজিরোজগারের উন্নতির বদলে অবনতির দিকে চলছে। তারাও মুজিবের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছে। তার উপরে সমস্ত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, ব্যক্তি মানুষও তার উপরে চটেছে। এমনকি আওয়ামি লিগের তাজুদ্দিন, নজরুল ইসলাম সহ অনেক নেতা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে গোপনে প্রস্তুতি নিচ্ছে। সুবিধাবাদী দালালের দল মুজিববাদ জিন্দাবাদ বলে রাস্তায় চিৎকার করে চলেছে। এই দালালদের ভয়ে কেউ মুখ খুলতে সাহস না পেলেও অদূর ভবিষ্যতে তারা বিদ্রোহ করবে। '৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, '৫৪ সালের ভোট বিপ্লব, '৬২ সালেব ও '৬৩ সালের আয়ুব

বিরোধী আন্দোলন, '৭৯ সালের আয়ুব খাঁর বিতাড়ন, '৭০ সালে আবার ভোট বিপ্লব আর '৭১ সালে অস্ত্র হাতে নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে নেমে ছাত্র যুবকের দলই সবক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। তা আমি স্ব চোখে দেখেছি আর বুঝেছি। সেই ছাত্র যুবকের দল যখন চটেছে তখন আবার একটা ঝড় আসবেই। আর দেশের পরিবেশও সম্পূর্ণ অনুকূলে। সে ঝড় তাণ্ডবের রূপ নিতে পারে। ফলে মুজিবের গদি উড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এই বক্তব্যে অধ্যক্ষ বীরেন বিশ্বাস একমত হতে পারেননি। তিনি বলেন অত সহজে মুজিবকে কেউ তাড়াতে পারবে না। বীরেনবাবুর মুজিবপ্রীতি দেখে আমি তাকে বলি, দেশের যে পরিস্থিতি তাতে মুজিবের গদি ছাড়তেই হবে। কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। তার দিন ফুরিয়ে আসছে। তার উত্তরে বীরেনবাবু অস্বাভাবিকভাবে চিৎকার করে বলেন — মুজিবকে তাড়াবার শক্তি বাংলাদেশে কারও নেই। যারা সেরূপ চেষ্টা করবে রক্ষীবাহিনী তাদের ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করে দেবে। ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করার কথা বীরেনবাবু বলায় আমি কিছুটা চটে যাই। কিন্তু খুব ধীর স্থির ভাবে বলতে শুরু করি — ৩০ লক্ষ হিন্দুর সঙ্গে ১৭ হাজার ভারতীয় সেনার জীবনবলির ফলে স্বাধীন হল ধর্ম নিরপেক্ষ বাংলাদেশ। সেই বাংলাদেশ সরকারকে পাকিস্তানের সাকেসেসর সরকার রূপে ঘোষণা করে মুজিব স্বাধীনতার যুদ্ধকে অস্বীকার করেছেন। সেই যুদ্ধের শহীদদের প্রতি তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। ইসলামি জাতীয়বাদকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বাংলাদেশ স্বাধীন হল। ছিঁড়ে গেল পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের ইসলামিক বন্ধন। সেই ছেঁড়া ইসলামিক বন্ধনকে জোড়া দিতে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তে রঞ্জিত লাল মাটি মাড়িয়ে মুজিব গেলেন ইসলামাবাদে। সেই ছেঁড়া ইসলামিক জাতীয়তাবাদকে নতুন করে জোড়া দিতে সে বন্ধনকে দৃঢ় করতে। ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মার অভিশাপে তাকে গদি ছাড়তে হবেই। আর স্বেচ্ছায় না ছাড়লে তাকে সবংশে মরতে হবে। তা কেউ ঠেকাতে পারবে না। সেদিনের আলোচনা উত্তপ্ত হলেও শেষ পর্যন্ত চিত্তবাবু সহ আমরা সবাই একমত হই যে বাঙালিরা মুজিবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে আন্দোলনে নামবে। তাতে বাধা পেয়ে শেষ পর্যন্ত তা বিদ্রোহের রূপ নেবে। তার জন্য হিন্দুদের চোখ খোলা রেখে সব দেখতে হবে, আর কান খোলা রেখে সব শুনতে হবে। বাঁচার জন্য পথের কথাও চিন্তা করতে হবে। সেদিন সবার সামনে চিত্তবাবুকে আমি বলি সবার চেয়ে বেশি হুঁসিয়ার থাকতে হবে আমাদের দুজনকে। কেননা মৌলবাদীরা জানছে পাকিস্তান ভাঙার মূলে ছিলাম আমরা দুজনে। কাজেই তাদের সমস্ত রাগ আমাদের উপরে। সুযোগ পেলেই তারা ছাড়বে না। আমি কলকাতায় চলে যাওয়ায় সহজে তারা আমাকে পাবে না। কিন্তু

পার্লামেন্টের অধিবেশনে মাঝে মাঝে চিত্তবাবুর ঢাকায় থাকতে হবে। তাই তাকে বেশি হুঁশিয়ার হতে হবে। আর সুযোগ পেলে মুজিবও তাকে ছাড়বে না। স্বাধীনতা সংগ্রামের সত্য তত্ত্ব চাপা দিতে তা সে করতে পারে। কেননা তাঁর নাটকের সব সত্য ঘটনা আমরা দুজনেই মাত্র জানি সে ভয় তার মনে আছে।

এভাবে ওদিনের আলোচনা শেষ করে পরের দিন ২৯ শে জুলাই শেষবারের মতো চিত্তবাবু প্লেনে কলকাতায় চলে আসেন। আর স্থলপথে বাড়ি হয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের গণমুক্তি দলের বিশেষ বিশেষ কর্মী নেতা ও বিশেষ বিশেষ হিন্দুদের হুঁশিয়ারি দিতে দিতে আমিও পরের দিন কলকাতার পথে যাত্রা করি। ঢাকা থেকে কলকাতা যাওয়ার পথে প্রথমে যাই বরিশালের ন্যাপ নেতা নীরোদ নাগের বাড়িতে। তাকে আমাদের বক্তব্য বলি। এইভাবে কাউখালির ডাঃ ধীরেন সিকদার, বাটনাতলার নগেন মন্ডল, (বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক) বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শৈলেন হালদার, শিক্ষক জ্ঞান মন্ডল সহ অনেকের সাথে দেখা করি ও আমাদের বক্তব্য সবাইকে জানাই।

গ্রামের বাড়িতে পৌঁছে বরইবুনিয়া স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হাজী আব্দুল গনীর সঙ্গে দেখা করি। তিনি ছিলেন আমার বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। নিজের ছেলের মতোই তিনি আমাকে স্নেহ করতেন। তিনি আমাকে দেখে তার স্নেহের দাবি নিয়েই প্রশ্ন করলেন — "কালিদাস, কোন অপরাধে অপরাধী করে, সমস্ত মায়ামমতার বন্ধন কেটে আমাদের ছেড়ে তুমি কলকাতায় চলে গেছ।" উত্তরে তাকে আমি বলি "আপনাদের স্নেহ-মমতা-মায়ার বন্ধন কেটে স্থায়ীভাবে বা চিরতরে বাস করার জন্য আমি চলে যাইনি। আপনাদের ঋণের কথা আমি ভুলতে পারব না। এখানের জলবায়ু, আকাশ বাতাস মাটির কথা আমি ভুলতে পারব না—এখানের নদী মানুষ পশুপাখির কাছে আমি চিরঋণী। সে ঋণ শোধ করার সাধ্য আমার নেই তা আমি ভালোভাবেই জানি। তবে ঋণ স্বীকার করার জন্যই আমি আবার ফিরে আসব। যেদিন স্বাধীনভাবে কথাবলা, চলাফেরা, আয় উন্নতি ও সম্পদ রক্ষার নিশ্চয়তা পাব। তার সঙ্গে থাকবে স্বাভাবিক মৃত্যুর নিশ্চয়তা। সেই পরিবেশ হলে বা তা গড়েই আমি আমার জন্মভূমিতে ফিরে আসব।" তাকে আমি আরও বলি —"আপনি ভালোভাবেই জানেন সমূহ মৃত্যুর মুখে পড়েও আমি আমার মাতৃভূমি ছেড়ে অন্যান্য অনেকের মতো ভারতে যাইনি। এবার বিশেষ কারণে সাময়িকভাবে দেশ ছেড়ে কলকাতা গিয়েছি। কারণটি লুপ্ত হলেই আমি আবার চলে আসব। আপনারা ভালোভাবেই জানেন বাংলাদেশ গড়ার ব্যাপারে চিত্তবাবু ও আমি চিহ্নিত হয়েছি। মৌলবাদীরা সুযোগ পেলেই আমাকে খতম করে দেবে। আর দেশের যে

অবস্থা তাতে গণআন্দোলনের মাধ্যমে মুজিবের গদিচ্যুতি হতে পারে। মুজিবকে তাড়ানোর গণআন্দোলনের সময় মৌলবাদীরা সে সুযোগ পাবে। আর মুজিবের পদচ্যুতির সময় দেশে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। সে পরিস্থিতির মোকাবিলা করে জীবনের ঝুঁকি আবার নিতে চাই না।" এই আলোচনার সময় গণি সাহেবের বাড়িতে অনেক মানুষ উপস্থিত ছিল। মুজিবের গদিচ্যুতির কথা শুনে অনেকেই বিশ্বাস করতে পারে নি। অসম্ভব বলে অনেকে উড়িয়ে দেয়। আর বেশির ভাগই আমার কথায় সায় দেয়। এ আলোচনা হয় ৮ই আগষ্ট। পরের দিন আমি খুলনা যাই। সেখানে অ্যাডভোকেট প্রফুল্ল মন্ডল, কিরণ বিশ্বাস, ডাঃ জ্ঞানবালা অ্যাডভোকেট হরিপদ বিশ্বাস সহ অনকের সঙ্গে আলোচনা হয়।

খুলনা শহরে আলোচনার পর গ্রামের দিকে আলোচনা করতে প্রথমে যাই রংপুর শাপুর ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান গুরুদাস সরকারের বাড়িতে। তাদের কাছে ভাবী বিপদের কথা বলায় ডাঃ সন্ন্যাসী ঢালী বলেন–"এবার যত বিপদই আসুক না কেন বাড়িতে বসেই লড়াই করব–পশ্চিম দিকে আর যাব না। তার কথায় গুরুদাসও সাড়া দেন। পরে চরমভাবে মার খাওয়ার পরে গুরুদাস প্রাণের ভয়ে ভারতে চলে আসেন। এখন হাবরার একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তারপর যাই সুন্দরবনের কাছে বাজুয়া ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ধীরেন গাইনের বাড়িতে। সেখানের আলোচনা সেড়ে পরের দিন খুলনা যাওয়ার কথা, কিন্তু ওদিন রাতেই বাত রোগে আক্রান্ত হয়ে আমি হাঁটাচলার শক্তি হারিয়ে ফেলি। তবুও অধ্যক্ষ নিশিকান্ত রায়ের কোলে বসে আমি লঞ্চঘাটে যাই। লঞ্চে খুলনায় পৌঁছেই প্রথমে বাসে ও পরে নৌকায় ডুমুরিয়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক দেবদাসের বাড়ি ডুমুরিয়া যাই। সেখান থেকে প্রথমে নড়াইলের রাসকোট্রা ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সুরেন টিকাদারের বাড়ি, তারপর যাই রামনগর গ্রামের শিক্ষক গোপাল বিশ্বাসের বাড়ি। সর্বত্রই একই বক্তব্য রাখি ও সবাইকে হুঁশিয়ার থাকতে বলি। আর ১৪ই আগষ্ট সীমান্ত পেরিয়ে সন্ধ্যায় আমার কলকাতার বাড়িতে পৌঁছাই। বিভিন্ন জায়গায় এই সফরকালে আমার সাথি প্রথম দিকে ছিল বরিশালের চিত্ত হালদার। সে এখন বারাসাতের একজন ব্যবসায়ী। থাকে বারাসাতে। আর শেষের দিকে ছিলেন অধ্যক্ষ নিশিকান্ত রায়। এখন তিনি উত্তর ২৪ পরগণার রামচন্দ্রপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। থাকেন ঠাকুর নগর। বাংলাদেশের বাড়ি নড়াইলের লোহাগাড়ায়।

মুসলিম মানসিকতা

অনেক দিন ধরে মুসলমানদের সঙ্গে বাস করে দেখেছি ও বুঝেছি। বেশির

ভাগ মুসলমানই কিছু করার চিন্তা-করলে তাড়াতাড়ি তার সিদ্ধান্ত নেয়। আর সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে বেশী তাড়াতাড়ি তা কার্যকরী করে। তাদের ব্যাক্তি বা রাষ্ট্রীয় জীবনের দিকে তাকালে দেখা যায় একই ধারায় সে ইতিহাস চলছে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের ইতিহাস তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

তাদের আন্দোলনগুলি তাৎক্ষণিক ও বৈপ্লবিক ধারায় চলে আসছে। '৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, '৫৪ সালের ভোট বিপ্লব, '৬২ সালের আয়ুব বিরোধী বিদ্রোহ, '৬৯ সালের আয়ুব বিতাড়ন, '৭০ সালে আবার ভোট বিপ্লব, '৭১ সালে অস্ত্র ধরে স্বাধীনতা সংগ্রাম। এসবই তাৎক্ষণিক ঘটনা। দেখা গেল ভোট বিপ্লবের দুমাস পরে বাংলার গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী হক সাহেবকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। আর '৫৮ সালের পাকিস্তানের গণতন্ত্রকে হত্যা করে দেশে মার্শাল ল জারি হল। '৬৯ সালে আয়ুবকে তাড়িয়ে দিয়ে ইয়াহিয়া খান এসে আয়ুবের আধাগণতন্ত্রকে হত্যা করে দেশে আবার পূর্ণ মার্শাল ল জারি করল। কিন্তু কোনো সময় তেমন কোনো প্রতিবাদের ধ্বনি শোনা গেল না। পাকিস্তানের ইসলামিক জাতীয়তাবাদকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গড়া বাংলাদেশ সরকারকে পাকিস্তানের উত্তরাধিকার সরকার রূপে (সাকসেসর) ঘোষণা করে মুজিব মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করার পরেও বাঙালিরা রুখে দাঁড়ায়নি। এভাবে মুজিবের নৃশংসভাবে হত্যা তারপর বাঙালি জাতীয়তাবাদী ▮ জন নেতা ও মন্ত্রীকে হত্যার পরেও তারা রুখে দাঁড়াতে পারেনি।

বিচার করলেই দেখা যায় ভারত উপমহাদেশে তথা পাক-ভারত-বাংলাদেশের মুসলমানদের রক্তধারায় অতীত ভারতের ঐতিহ্যময় গণতন্ত্র ফল্গুনদীর জলধারার মতো বয়ে চলেছে। উপরে তা দেখা না গেলেও মাঝে মাঝে তা দেখা যায়। তাই পাকিস্তান বা বাংলাদেশের গণতন্ত্রী বানরটি এক লাফে ▮ ফুট উঁচুতে উঠতে পারলেও ২০ ফুট উঁচু বাঁশটিতে সে উঠতে পারে না। কেননা প্রথম লাফে ৫ ফুট উঁচুতে উঠে পরের লাফ দেবার আগেই পিছলে ৫ ফুট নীচে নেমে যায়। লুডো খেলার সাপের মাথায় গেলেই নিচে লেজে নামতে হয়। এভাবে সেখানে গণতন্ত্রের ধারা চলছে ও চলতে থাকবে। ইসলামিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের কোনো স্থান নেই। গণতন্ত্রের ধোঁকা দিতে সেখানে ইসলামিক গণতন্ত্র, বুনিয়াদি গণতন্ত্র বা মুজিবের বাকশালের মতো একদলীয় গণতন্ত্র চলবে। সেখানে খাঁটি গণতন্ত্র চলতে পারে না। তার জন্য সেখানে পূর্বের মতো বারবার ফিরে আসবে সামরিক শাসন তথা খলিফার একনায়কতন্ত্র। কোরান হাদিসের নির্দেশিত পথে দেশ চলবে আর তার কথাই শেষ কথা। বর্তমান

যুগে খলিফার নাম অচল। তাই দেশের সামরিক অধিকর্তা দরকার মতো শাসন ক্ষমতা হাতে নিয়ে দেশ চালাবে। আর আরবের মতো কাফের শূন্য দেশ করতে অমুসলিমদের উপরে জেহাদি অত্যাচার চালাবে। তার ফলে তারাও বাঁচার জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ নয়তো দেশত্যাগ করতে বাধ্য হবে।

বেশির ভাগ মুসলমানই বুদ্ধিতে তীক্ষ্ণ, ব্যবহারে উগ্র আর মানবিকতায় সাহসী ও বিপ্লবী। আর হিংস্রতা তাদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। সে তুলনায় হিন্দুরা বৌদ্ধিক প্রভাবে নরমপন্থী, দুর্বল, রক্ষণশীল ও বিবর্তনবাদী। তাদের সাহসও কম। সেজন্যই তারা বারবার মুসলমানদের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে। তার ফলে মুসলমানরা বাইরের থেকে এসে ভারত জয় করে প্রায় ৮০০ বছর রাজত্ব করেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সময়ও তাদের তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় তারা দিয়েছে। তারা ভারত সরকার ও হিন্দুদের ধোঁকা দিয়ে তাদের দেশকে স্বাধীন করে নিল। তাতে কোনো ঝুঁকি তাদের নিতে হয়নি, ঝুঁকি নিয়েছে ভারত সরকার আর রক্ত দিয়েছে হিন্দুরা। খুব কম রক্তই সেদিন মুসলমানদের দিতে হয়েছে। তাদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় প্রমাণ হলো ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করল — পূর্ববঙ্গ পেল তথাকথিত স্বাধীনতা। কিন্তু বাংলাদেশ নাম দিয়ে তারা পশ্চিমবাংলাকেও কাগজে কলমে গ্রাস করল। আর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাভাষার অধিকারী হল তারাই। অর্থাৎ বাংলাভাষারও জবরদখল তারা নিল।

বাংলাদেশের জন্মলগ্নে মুজিব বুঝতে পারেন বা পাকিস্তান তাকে বোঝায় যে বাঙালি সংস্কৃতি একটি পূর্ণ সংস্কৃতি নয়। একটি উপসংস্কৃতি মাত্র। তাও আবার ভারতীয় সংস্কৃতির উপসংস্কৃতি। তাই ভারতীয় সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে তাকে চিরদিন চলতে হবে। কালে কালে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সে মিশে যাবে। তখন আলাদা জাতিসত্তা আর থাকবে না। আলাদা জাতিসত্তা নিয়ে বাংলাদেশকে থাকতে হলে একমাত্র ইসলামিক আন্তর্জাতিক সত্তার আশ্রয় নিতে হবে। তাহলে পাকিস্তানের মতো বাংলাদেশ টিকে থাকতে পারবে। শুধু পাকিস্তান নয় বিশ্বের ইসলামিক আলমেরা মুজিবকে বুঝায় যে ভারত ভাগ হয়েছে ইসলামিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে। এ সীমারেখা ইসলামিক সীমারেখা। এ সীমারেখার পাহারাদার হলো বিশ্বের সমস্ত মুসলিম রাজ্যের ঐক্যবদ্ধ শক্তি। ভারত কেন পৃথিবীর কোনো একক রাজশক্তির সাধ্য নেই কোনো ইসলামিক রাষ্ট্রকে আঘাত করে — তা বাংলাদেশ যতই ছোট রাষ্ট্র হোক। তারপরেও যদি ইসলাম বিরোধী দালালেরা বাংলাদেশের ভিতরে বাঙালি জাতীয়তাবাদী প্রচারে শক্তিশালী হয় তখন দরকারমতো পাকিস্তান

বাংলাদেশ একই কাঠামোর মধ্যে এসে ইসলামকে বাঁচাতে হবে। মুজিব ছিলেন ইসলামিক জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। বাঙালি জাতীয়তাবাদকে হত্যা করতে ইসলামিক জাতীয়তাবাদকে প্রচারে প্রথম দিক থেকেই মুজিব নজর দিতে থাকেন। তাই সহজে বলা যায় বাংলাদেশে ইসলামের পরিবেশ সৃষ্টি করতে সব রকমের প্রচেষ্টা চালান মুজিব নিজেই।

ঝড় আসছে প্রবল বেগে, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার

পাকিস্তান ভালোভাবেই জানত বাঙালি জাতীয়তাবাদের জননেতাদের মধ্যে মুজিব অন্যতম নেতা। প্রথম দিকে ইয়াহিয়া এই আন্দোলনকে তেমন গুরুত্ব দেননি। কিন্তু নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয় লাভের পর মুজিবের গুরুত্ব ভীষণভাবে বেড়ে গেল। অধিক ভোটে জয়লাভ করার পরও তার হাতে সামরিক অধিকর্তা ক্ষমতা দিল না। তাতে বাঙালি আবেগে ধাক্কা লাগে। ফলে স্বাধীন বাংলাদেশ করার জন্য তারা চিৎকার করতে থাকে। তাতে মুজিবের সম্মতি না থাকলেও বাধা দেওয়ার ক্ষমতা তখন তার হাতে ছিল না। শেষ পর্যন্ত সেই আন্দোলনের ভয়াবহ রূপ দেখে বাধ্য হয়ে পাকিস্তানকে অখণ্ড রাখার জন্য তারা মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী করার আশ্বাস দেন। সে ঝড়ের মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা না করে যদি মুজিব অখণ্ড পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন তবে মুজিবকে বাঙালীরা উড়িয়ে দেবে। তাই মুজিব ও ইয়াহিয়ার যৌথ সিদ্ধান্ত মতো বাঙালির হাত থেকে রক্ষা পেতে তিনি স্বেচ্ছায় গ্রেফতার বরণ করেন। নিরাপদে সময় কাটাতে ইসলামাবাদে চলে যান। কিন্তু তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেল। তারা (পাকশক্তি) দেখল মুজিব এই স্বাধীনতা সংগ্রামে কোনো অংশ নেয়নি। বরং তা বানচাল করতেই তাদের কথামতো তিনি স্বেচ্ছায় গ্রেফতার বরণ করেন ও পাকিস্তানে চলে যান। পাকিস্তান ভাঙায় মুজিব ভীষণ ভাবে আহতও হয়েছেন। তাও তারা দেখেন। তার জন্য বাংলাদেশে ফিরে আসার সময় মুজিব হয়তো তাদের আশ্বাস দেন যে, তারা আবার একই পাকিস্তানে একত্রভাবে বাস করবেন। তার জন্য যা যা করা দরকার সবই তিনি করবেন। তাই পূর্বের রাগ থাকলেও সেদিন মুজিবের উপরে তাদের কোনো রাগ থাকতে পারে না।

পাকিস্তান ভালোভাবেই জানে মুজিবের একান্ত ইচ্ছা থাকলেও তখন পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশকে মিশিয়ে নেওয়া সহজ নয়। তাই তারা বাংলাদেশকে ইসলামিক রাষ্ট্র ঘোষণা করতে বারবার চাপ দিতে থাকে। কিন্তু পাশের রাষ্ট্র ভারত ও বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শক্তি রাশিয়ার ভয়ে ইচ্ছা থাকলেও ইসলামিক রাষ্ট্র ঘোষণা

করতে মুজিব সাহস পায় না। তারপরেও দেশের ভিতরে আছে বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা।

মুজিব তখন বেকায়দায় পড়েন। আর সেই চরম মুহূর্তে রাশিয়া তাকে জানায় যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় রাশিয়া সাহায্য করেছিল। তাদের কথায় ভারতের কমুনিষ্ট পার্টি পাকিস্তানের সমর্থন করেছিল। বাংলাদেশ হওয়ার সময়ও যেমন তারা সমর্থন জানায় আর অন্য দিকে কমুনিষ্ট পার্টিকে (পাক ভারত) স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিতে নির্দেশ দেয়। তাই রাশিয়ার পূর্ব ঘোষিত নীতি অনুসারে রাশিয়ার স্বার্থে তারা বাংলাদেশকে টিকিয়ে রাখার জন্য সব রকমের সাহায্য করবে। তাতে বাংলাদেশের ক্ষতি করার কোনো সাহস বা সুযোগ ভারত পাবে না। এই আশ্বাস পেয়েই মুজিব রাশিয়ায় যান। রাশিয়ার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ তাদের আওতায় থাকলে ভারতও কোনোদিন রাশিয়ার আওতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না। তখন রাশিয়ার কথা হবে শেষ কথা। যা ভারত মানতে বাধ্য থাকবে।

ভারতের ভয় ও পাকিস্তানের চাপ থেকে মুক্তি পেতেই মুজিব রাশিয়ায় যান। পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ শক্তি জেনেই রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাতে পাকিস্তান তাকে ভুল বুঝে মনে করল মুজিব ইসলামিক সংস্কৃতি ত্যাগ করে কম্যুনিষ্ট সংস্কৃতি গ্রহণ করেছেন। তাদের কাছে পূর্বে মুজিবের দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা তিনি খেলাপ করেছেন। তাই পাকিস্তান ভাঙার ও ইসলামিক সংস্কৃতিকে আঘাত দেওয়ার অপরাধে মুজিবকে তারা অপরাধী করেন। সেই অপরাধের চরম শাস্তি দিতে তাকে হত্যা করার চূড়ান্ত পরিকল্পনা তারা নেন। এ খবর শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধি তার গোয়েন্দা মারফৎ যথাসময় জানতে পারেন এবং সেভাবে পূর্ব প্রস্তুতি নিতে মুজিবকে হুঁশিয়ার করেন। কিন্তু মুজিব শ্রীমতি গান্ধির প্রাক হুঁশিয়ারির প্রতি কোনো গুরুত্ব দিলেন না। কেননা শ্রীমতি গান্ধির চেয়েও মুজিবের বেশি বিশ্বাস ছিল তার সেনাদের প্রতি। মুজিবের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তার সেনারা কখনও তার বিরুদ্ধে যেতে পারে না। তাই শ্রীমতি গান্ধির সময়োপযোগী উপদেশ তার কাছে মূল্যহীন হয়ে গেল।

তাণ্ডবে ডুবে গেল মুজিবসহ তার নৌকা

মুজিব হত্যার পরিকল্পনা কার্যকরী করতে গিয়ে প্রাথমিক বিশ্লেষণে পাকিস্তান দেখল কম্যুনিষ্ট নীতি গ্রহণ করার পরে বিশ্বের বিশেষ করে মধ্য এশিয়া ও আফ্রিকার মুসলিম রাষ্ট্রগুলি মুজিবের উপর চটে গিয়েছে। গণতন্ত্রকে হত্যা করে রাশিয়ার মতো এক দলীয় শাসন চালাতে বাকশাল গঠনের পরে ভারতসহ পৃথিবীর সমস্ত

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিও বিশেষভাবে বিরূপ হয়েছে। বাংলাদেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক ব্যক্তি মানুষ, গণতান্ত্রিক দল ও সংস্থাগুলি দেশের মধ্যেও তলে তলে প্রতিবাদের ঝড় তুলতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। যে কোনো মুহূর্তে তা বিদ্রোহের রূপ নিতে পারে। আর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেও কোনো বিশেষ সম্মান না পাওয়ার ফলে তিনিও রাগে ফুলছিলেন।

এই সুযোগে বাংলাদেশের পাকপন্থী মৌলবাদী দল পাকপন্থী বাংলাদেশী সেনারা পাকিস্তান সরকারের মদতে, মুস্তাকের নেতৃত্বে এক হয়ে পর্দার আড়ালে মুজিব হত্যার ষড়যন্ত্রে সামিল হয়। মুস্তাকও পাকিস্তানকে বারবার আশ্বাস দেন— পাকিস্তানের মদতে তিনি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হতে পারলে বাংলাদেশকে তিনি ইসলামিক রাষ্ট্র করবেন ও ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে বাংলাদেশকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে আবার নিয়ে আসতে প্রচেষ্টা চালাবেন।

আইন শৃঙ্খলাসহ দেশের অর্থনৈতিক চরম অবনতি দেখেও মুজিবের স্বজনপ্রীতি বিশেষ করে তার ছেলে ও আত্মীয়স্বজনের উদ্ধত ব্যবহারে দেশের সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তার ছেলে কামালের উদ্দত ব্যবহারে একদল সেনা অফিসার চরমভাবে চটে যায়। তারা দেখে মুজিবের ছেলে হলেও যখন তখন ঐ সেনারা তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পারে। কিন্তু পরে মুজিবের হাত থেকে তারা রক্ষা পাবে না। তাই কামালের বিচারের জন্য মুজিবের কাছে তারা আবেদন জানায়। তাতে মুজিব কোনো সাড়া না দেওয়ায় তারা মুজিবকেই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

এই সব ঘটনা পর্যালোচনার পরে পাকিস্তান ভালোভাবে বুঝতে পারে সেই পরিবেশে মুজিবকে হত্যা করলে জোরালো আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে না। বাংলাদেশের ভিতর থেকেও জোরালো প্রতিবাদের ধ্বনি শোনা যাবে না। আর প্রতিশোধ নিতে সাধারণ মানুষ রুখে দাঁড়াবে না। তাই গণবিপ্লবের আগেই সেনাবিপ্লব ঘটিয়ে মুজিবকে হত্যা করতে পাকিস্তান সরকার পাকপন্থী বাংলাদেশি সেনাদের নির্দেশ দেয়। কেননা পাকিস্তানের ভয় ছিল গণবিপ্লবের মাধ্যমে মুজিব গদিচ্যুত হলে বাংলাদেশ বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের হাতে আবার চলে যাবে। আর সেনা বিপ্লবের মাধ্যমে মুজিব হত্যার পরে বাংলাদেশ পাকিস্তানের আওতায় ইসলামপন্থীদের হাতেই থাকবে। তাই গণবিপ্লবের আগেই তারা সেনাবিপ্লবের সিদ্ধান্ত নেয়।

ঢাকার এম. এন. এ. হোস্টেলে বসে গণ আন্দোলনের মাধ্যমে মুজিবের গদিচ্যুতির আশঙ্কার পরিণতি নিয়ে আমরা যখন আলোচনায় ব্যস্ত ছিলাম তখন

কুর্মিটোল্যার সেনা কেল্লার মধ্যে হয়তো মুজিব হত্যার নীল নকশা তৈরি হচ্ছিল। মুজিব ডিক্টেটর হয়ে টিকে থাকবেন কোন শক্তির বলে বলিয়ান হয়ে? সেনারা সে সুযোগ তাকে দেবে কেন? প্রায় সব সেনাই তো ছিল শত্রুসেনা। বিশেষ করে উচ্চপদস্থ সব সেনাই পাকিস্থানী নিযুক্ত সেনা। স্বাধীনতা সংগ্রামকালে তারা ভারত তথা বাংলাদেশ সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। সারা জীবন ধরে তারা ইসলামিক ধারায় শিক্ষা পেয়েছে, উদ্বুদ্ধ হয়েছিল পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদে। ইসলামিক প্রেমে মুজিব সেই শত্রু সেনাদের মিত্র করেছিলেন। তাদের জাতীয় বাহিনীতে নিয়োগ করে প্রত্যেককে দিয়েছিলেন ইসলামিক উপহার। সঙ্গে শত্রু করলেন ভারতকে। যে ভারত বিশ্বযুদ্ধের হুমকি মাথায় নিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে আর ১৭ হাজার সেনার জীবন দিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিল। এতভাবে সাহায্য করার পরেও মুজিব যেমন সেই ভারতের কাছে কৃতজ্ঞ থাকেননি তেমন শত্রুবাহিনীর সেনাদের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতার আশা মুজিব কিভাবে করতে পারেন?

পর্দার আড়ালে বসে মুস্তাক সবই দেখলেন — মুজিব বাঙালিদের ধোঁকা দিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে কিভাবে গ্রেপ্তার বরণ করে পাকিস্তানে চলে গেলেন? কিভাবে পাকিস্তানের মদতে বাংলাদেশের জাতির পিতা হলেন! আর সমস্ত ক্ষমতা নিজ হাতে কুক্ষিগত করলেন। সব দেখার পরে অভিজ্ঞতা অর্জন করেই তিনি ক্ষমতা কেড়ে নিতে প্রস্তুতি নিতে থাকলেন। তার জন্য সেনাদের লেলিয়ে দিলেন।

এই সেনারা ৩০ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা করেছিল। লক্ষ লক্ষ বাড়ি লুঠ করে তা জ্বালিয়ে দিয়েছিল। ইসলামিক প্রেমে মুজিব সব জেনেও বিচারের ব্যবস্থা করে তাকে শাস্তি দিলেন না। মানুষের রক্ত খেয়ে বাঘ যেমন মানুষের আরও রক্ত খেতে হিংস্র হয়ে ওঠে--এসব সেনারাও মানুষ খুন করে আরও বেশি খুনের জন্য হিংস্র হয়ে উঠল আর গণবিপ্লবের আগেই পাকিস্তানের মদতে মুস্তাকের নির্দেশে ১৫ই আগষ্ট '৭৫, এর গভীর রাতে মুজিবের বাড়ি আক্রমণ করে। আর হত্যা করে তার আত্মীয়স্বজনসহ তার পরিবারের সবাইকে। অতি সহজে সফল হল একটি সেনা বিপ্লব।

ইসলাম বিরোধী মনে করেই সপরিবারে মুজিবকে হত্যা করে তারা মুজিবকে নির্বংশ করল। ইসলাম বিরোধী মনে করেই এই নরপশুরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মুখে হত্যা করেছিল তারা ঢাকার বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের। পরে বাঙালি

জাতীয়তাবাদকে সমূলে ধ্বংস করতে তারা ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ঢুকে খুন করল — বাংলাদেশের বিপ্লবী সরকারের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহম্মদ, মন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলি, মন্ত্রী কামারুজ্জামানকে। মুস্তাক ও সামাদ ছাড়া গোটা বিপ্লবী বাংলাদেশ সরকারের সদস্যদের তারা পরিকল্পনামতো হত্যা করল। যাতে বাঙালি জাতীয়তাবাদ কোনোদিন আর বাংলার মাটিতে জেগে উঠতে না পারে। তাই বাংলার মাটিতে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ঘুমিয়ে পড়ল।

আগেই বলেছি বাংলাদেশ থেকে কলকাতায় আমার বাড়িতে আমি পৌঁছাই ১৪ই আগস্ট সন্ধ্যায়। আর ভোরের রেডিওর খবরে জানতে পারি ঐদিন গভীর রাতে মুজিবের সেনারাই স্বজনসহ সপরিবারে মুজিবকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। এত তাড়াতাড়ি এরূপ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটবে তা আমি বা আমরা কখনো চিন্তা করতে পারিনি। ঢাকা থেকে ফেরার পথে বাড়িতে আব্দুল গনির বাড়িতে ও অন্যান্য জায়গায় গিয়ে মুজিবের গদিচ্যুতির আশঙ্কার কথা প্রকাশ করেছি। আমি যত জায়গায় গিয়েছি সব জায়গাতে ঐ একই আশঙ্কার কথা প্রকাশ করেছি কিন্তু তা যে সেনা বিপ্লবের মাধ্যমে এত ভয়াবহ হবে তা কখনও চিন্তা করতে পারিনি।

এই হত্যার আগেই হাজী আব্দুল গনির বাড়িতে বসে গণ বিপ্লবের মাধ্যমে মুজিবের গদিচ্যুতির আশঙ্কার কথা বলেছিলাম এবং বাড়ি থেকে চলে আসার ২ দিন পরেই মুজিবের মৃত্যু হল। সে কথা স্মরণ করে অনেকেই চিৎকার করে বলতে শুরু করল — "এই হত্যার চক্রান্তে ভারত জড়িত আছে এবং কালিদাস সবই জানত।" সঙ্গে সঙ্গে কিছু সংখ্যক মানুষ আমার বাড়ি আক্রমণ করার কথাও প্রকাশ করল। বাড়িতে আমার ভাইয়েরা বাস করত আর এখনও বাস করছে। কিন্তু বেশির ভাগ মুসলমান বাধা দেওয়ায় তারা সফল হতে পারেনি সত্য। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে সর্বত্র তারা প্রচার করতে থাকল। ফলে আমার ভাইয়েরা ভয়ে গ্রাম ছেড়ে বাইরে যেত না। এমন কি হাটেবাজারেও যেতে তারা সাহস পেত না। কিছুদিন পরে মানুষ জানতে পারল ভারত সে ষড়যন্ত্রে জড়িত নয়। তার পরেই আমার ভাইয়েরা নির্ভয়ে হাটে বাজারে যেতে শুরু করে।

মুজিবের এভাবে নৃশংসভাবে হত্যার পরে দেখা গেল আমাদের পূর্ব আলোচনা মতো বাংলাদেশের ভিতরে প্রতিবাদের কোনো ধ্বনি উচ্চারিত হল না। বহির্বিশ্বেও তেমন জোরালো কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। আগের দিন সন্ধ্যায় রাস্তায় টহল দিয়ে মুজিব বাহিনীর সেনারা চিৎকার করে বলেছে "মুজিববাদ জিন্দাবাদ"। তাদেরও খুঁজে পাওয়া গেল না। আওয়ামি লিগের শতশত নেতা, ছাত্র

লিগের শতশত ছাত্রনেতা, শ্রমিক লিগের শতশত শ্রমিক নেতা, শতশত কমরেড সব হারিয়ে গেল। আর হারিয়ে গেল হাজার হাজার মুক্তিসেনা যারা যুদ্ধক্ষেত্রে না গিয়ে বাংলাদেশ দখল করল। ভারতের সেনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে মুজিব এতদিন ধরে সভায় চিৎকার করে বলেছেন "আমার মুক্তিসেনারা রক্ত দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছে।" তারাও কোথায় হারিয়ে গেল. ঢাকা থাকল শান্ত। সঙ্গে দেশের সব অঞ্চলই ছিল শান্ত।

ঢাকার রাজকীয় সম্মানিত মাটিতে রাজকীয় সম্মানে মুজিবের কবর হল না। টুঙ্গিপাড়ায় তার জন্মভিটায় গভীর রাতে সবার অগোচরে সেনাদের পাহারায় তার মৃতদেহ কবর দেওয়া হল। গ্রামের মানুষ গ্রামের মাটিতে মিশে গেল। সাধারণ মানুষের চেয়েও নিম্নস্তরের মানুষের মত তাকে চিরবিদায় নিতে হল। মৃত্যুর আগের দিনও তার চারিপাশের হাজার হাজার আমলা, হাজার হাজার সমর্থক ও দালালের মুখের জয়গান তিনি শুনেছেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তারা কেউ কেঁদে ওঠেনি। রাস্তায় নেমে কেউ কোনো প্রতিবাদও করল না। অথচ তার স্বেচ্ছায় গ্রেপ্তার বরণের দিন ঢাকা সহ সমস্ত বাংলার মাটিতে প্রচন্ড ভূকম্পন দেখা দিয়েছিল। পৃথিবীর সব দেশের সরকার ও তার জনগণের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল।

ভারত সব রকমের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিল। অথচ মর্মান্তিক এই ঘটনার পরে কোনো আওয়ামি লিগ নেতা সাহায্যের জন্য ভারতে এলেন না। এমনকি তাজুদ্দিনও নয়। এ না আসার বিশেষ কারণ আছে। মুজিব তাদের বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলতেন "ভারতকে কখনও বিশ্বাস করবে না। সুযোগ পেলেই ভারত বাংলাদেশকে গ্রাস করবে। শত বিপদে পড়েও তোমরা কখনও রাজনৈতিক সাহায্যের জন্য ভারতমুখি হবে না। অনেক কষ্টে আমি ভারতীয় সেনাদের ভারতে পাঠিয়েছি। ভারতীয় সেনারা বাংলাদেশে আসার আবার সুযোগ পেলে এবার তারা আর ফিরে যাবে না। তবে তাদের সাথে উপরে ব্যবহার ভালো করবে। আর ধোকা দিয়ে কাজ আদায় করার সুযোগ ছাড়বে না।"

মুজিবের এই উপদেশ আওয়ামি লিগ নেতারা মনে প্রাণে গ্রহণ করেন। ফলে তার মৃত্যুর পরে সাহায্যের জন্য কোনো নেতা ভারতে ছুটে এলেন না। আর জেলে ৪ নেতার হত্যার পরেও কোনো নেতা ভারতে ছুটে না এলেও বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কেবল মাত্র কাদের সিদ্দিকি (বাঘা সিদ্দিকি) ভারতে ছুটে আসেন। তার উদ্দেশ্য ভারতের সাহায্যে দ্বিতীয় মুজিব হয়ে তিনি বাংলাদেশের গদিটি দখল করবেন। প্রথম মুজিবকে হাড়ে হাড়ে চিনে ভারত দ্বিতীয় মুজিবকে সাহায্য করতে

এগিয়ে এল না। বড় করুণ ও বেদনাদায়ক হলেও একথা একান্তভাবে সত্য। কোরানের প্রতি গভীর বিশ্বাস রেখে সারাজীবন ধরে মুজিব জেহাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত কোরানের নির্দেশিত পথেই সপরিবারে তাকে মরতে হল। আর শেষ হল ইতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায়। আর ভারতে জন্ম নিয়ে প্রথমে ভারতবাসী ছিলাম, পরে পাকিস্তানী হই। আর তথাকথিত বাংলাদেশ স্বাধীন করেও বাঙালি হতে পারিনি। হলাম বাংলাদেশী। দেশান্তরী বাংলাদেশীরা অস্ত্র ধরে যুদ্ধ করল। ৩০ লক্ষ মানুষ জীবন বলি দিয়েও তারা ঘরে ফিরতে পারল না। ইসলামিক সীমারেখার মধ্যেই দেশান্তরিত হয়েই তারা রয়ে গেল। প্রকৃতির প্রতিকূলে দেশান্তরিত হয়ে তারা চিরকাল থাকতে পারবে না। তারা ঘরে একদিন ফিরবেই।

পরিশিষ্ট

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নিকট শরণার্থী কল্যান সমিতি কর্তৃক প্রেরিত আবেদন পত্র :—

Shrimati Indira Gandhi, Prime Minister of India, New Delhi

Revered Madam,

The dream of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman for free and sovoreign Bangladesh is now a concrete reality. The forces of democracy, progress and freedom have won a major victory. The seventy-five million people of Bangladesh are full of loving and regardful gratitude to the people of India, her Government and armed forces and her great Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi.

The evacuees in India have started returning home. Ninety percent of such evacuees who are members of the non-muslim communities of Bangladesh demonstrate their mood of hasitancy in the midst of jubilation in the light of their sad plight and bitter experience of suffering and deprivation of security and other incidents devoid of a full and dignified life for the long 24 years of living in a Muslim-dominated state. To crown all, the cold-blooded genocide and the reign of terror unleashed by the military junta and their ghastly acts of barbarous butality have given a rude shock, causing major cracks, to the flickering flame of hope, confidence and morals, what, they, therefore urgently need on the eve of their home-ward journey, is, in addition to all other measures, a thorough rehabilitation of their shaken faith and shattered psychology by means of an adequate and appropriate guarantees, commitments and assurance from the authorities of India and Bangladesh. Such guarantees and assurances are of vital and paramount importance in view of the following factors :-

1. They have diabolical secnes of mass murder, large scale loot and arson and destruction of their properties, inhuman killing of children and molestation and rape of their women-

folk eventually compelled to lead a life of shame in the houses of Muslims, in cantonments and military barracks. Truly speaking Muslim neighbours of all political parties including Awami league are active participants in these atrocious and nefarious operations.

2. There have been massive abduction and forcible marriages of Hindu girls with muslims and large-scale forcible conversion of Hindus by local Muslims,

3. Hindu temples, maths and other religious institutions have been totally demolished, some of them being converted in to mosque by local Muslims.

4. Recovery of immovable properties would be difficult in view of all records having been destroyed or made untraceable by setting fire to the Record Rooms and Registration Offices.

5. There has been complete break-down of the socio-economic structure along with deprivation of future means of income elaborately plauned ad and executed.

6. Mere membership of the Awami League cannot overnight transform the deep-seated tradition of communal outlook and to truly plant with deeper roots the principles and practices of secularism in the life and character of the peopleis graduated process and involves time-lag. Consequently during the long transition period of the evacuees on return home they have to begin their life in hostile environment while coming in to possession of their properties occupied by their more powerful neighbours.

7. None of the political parties forming the Govt, and represented in the Consultative Committee incorporated in their manifesto the ideal of secularism, though they have accepted it after the 25th March 1971. There is no doubt, a re-assuring sign and a positive triumph of the forces of progress. But in order to translate this lofty ideal into a concrete fact it is imperative and obligatory that the state administrative machinery at various levels is re-adjusted and re-oriented

to secularist ideology. In that event alone it will contribute substantially to promote a sense of security and re-settle faith and confidence in the minds of the weaker sections of the people.

8. The vast majority of the minorities being Awami Leaguers and enlisting their massive support in favour of the 'Sixpoint' programme, have only one seat in the National Assembly and six seats in the Procincial Assembly as against 36 and 60 seats respectively they are entitled to on population basis. This is the key-factor of national life and calls for installation of equity and justice in order to radiate a spark of hope and confidence and dispel the darkness of gloom, fear-complex and pessimism.

9. We are particularly pained at the policy of discrimination pursued by the Bangladesh Govt. functioning on Indian soil and with Indian money in having abserbed most of the displeced Govt. employees as against a very few of them belonging to the minority communities.

10. No person belonging to the minority communities were at the helm of the affairs in any department of the Govt. of Bangladesh. All the Officers-in-Charge of Youth Camps and Reception Camps were Muslims and discriminatory treatment was meted out to the Hindu boys in such camps.

11. Bangladesh Volunteer Corps were organised by the Bangladesh Govt. with foreign money. But all the Volunteers-in-charge of the camps were Muslims, though the inmates of such camps were non-Muslims.

12. Awami League Leaders including ministers, M.N.A.'s and M.P. As with a few honourable excoptions seldom visited the evacuee camps with a word of sympathy.

13. East Pakistan Rifle, Police, Ansars and the Mujahids originally trained along communal lines and subsequently joining the struggle for liberation, will now be at the top level of the military and police administration. How can the mi-

norities expect at the hands of such wrongly oriented authorities, fair deal in the matter of their re-habilitation?

14. The Pakistani regime set up a communal administrative machinery which, unless altered lock, stock and barrel, will only serve to put the ideology of secularism in cold storage and at the execution level reduce it to a mere mockery of secularism as a state policy.

15. The returning migrants are painfully conscious of the deliberate plan hatched even after the Nehru-Liaquat Pact to squeeze out the Hindus from East Pakistan. The Govt. of the day issued what came to be widely known as the 'Aziz Ahmed Circular (secret and confidential)' through the then Chief Secretary Mr. Aziz Ahmed directing the officers to manage not to return the properties to the returning migrants.

16. We can hardly ignore the notorious world-wide trend for capture of power by the military, manifested in Muslim countries. Secondly, Pakistan enjoyed a prolonged spell of military rule. So it is not unlikely that the military in Bangladesh might develop an uncontrollable ambition to get in to power. All the officers except a few newly trained persons of the Bengali officers of the Pak Army are communal and they will take every chance to capture power. The present attitude of the Officers of the Makti Fauz, as far as known to us, justifies our above assessment. In the event of their capture of power the military will undoubtedly capitalise, as before, anti-Hindu and anti-Indian slogans for retaining power.

17. Hindu boys, inspite of their eager and ardent desire, did not get adequate chance to join the Mukti Fouz. Only a few of them were taken in, and they received, by and large, stepmotherly treatment and were not always given arms. On the contrary, Muslim boys who came over to India, were taken in indiscriminately, and therefore, the Rajakars and other antisocial elements also got the chance of being

trained and getting arms. The Pakistani Army also distributed arms to the Rajakars and Al-Badar Bahini. So all these arms went only to the Muslims with the result that the unarmed minorities will have to take delivery of possession of their properties in occupation of the miscreants and interested persons equipped with modern arms. This will definitely pose a positive threat to their life and security.

This is the formidable context in which the evacuees of Bangladesh are returning to their sacred land of birth. It is palpably clear that a favourable climate together with an appropriate moral and material environment has to be created for installing the evacuees in fuller, freer and worthier life. The instalation of Bangabandhu Seikh Mujib in power is decidedly the major step in this direction, while other suggested remedial measures are listed below ;—

i) The Indian Military should not be withdraw from Bangladesh till and until ;—
   (a) Rehabilitation of evacuees is complete in all respects;
   (b) The minorities can lead a normal life as they used to do before August 14, 1947.
   (c) Their religious institutions are re-established;
   (d) All their properties are returned to them;
   (e) They are settled in a life of dignity and honour.
   (f) They feel that they have had their just and adequate share of rights, privileges and participation at all levels and in various spheres of individual, national and public life.

ii) Human Rights Commission of U.N.O. should extend its jurisdiction to see that the declarations of Human Rights are not violated in respect of the minorities of Bangladesh.

iii) There should be a more effective pact between the In-

dian Govt. and the Bangladesh Govt. then the Nehru-Liaquat Pact regarding the life of the minorities of Bangladesh.

iv) Members of the Mukti Fouz, desirous of joining the army should be drafted to the barracks and cantonments and the rest disarmed. Huge quantity of arms and ammunitions now in the hands of different kinds of people, particularly the miscreants should be seized with the help of the Indian Army for the safety of the common people, particularly the minorities.

v) An effective organisation sponsored by the Bangladesh Govt. should be charged with the special task of rescuing the abducted girls an women, reconverting the converted persons and taking them back in to the society with their full dignity.

vi) There should be an agreement with the Government of Bangladesh to introduce free travel, free trade and liberal cultural exchange between India and Bangladesh.

vii) The minorities of East Pakistan were segregated from the main stream of national life through communal policy pursued by the Pakistani ruling cliques and had no effective role in the social, economical, political, judicial and administrative fields of notional activity. It is, therefore, suggested that until the lost ground of minorities as a result of discriminatory treatment is regained, they should be given the benefit of constitutional safeguards and guarantees by way of reservation on population basis of seats in National and Provincial Assemblies, in public and private services, in Public Service Commission and other Selection Boards, in trade and commerce etc.

viii) Properties of the Hindus who had to leave East Bengal prior to 25th March, 1971 by the force of circumstances have bean forcibly occupied by Muslims

through various evil devices including the discriminatory ordinances like the 'Enemy Property Act', the 'Declaration Suit', the 'Disturbed Persons Rehabilitation Ordinance' etc. These properties should be returned to the respective owners or their nearest relations.

ix) Adequate grants should be sanctioned for reconstruction of the ruined temples and maths and for proper functioning of the religious institutions of Bangladesh. All helps and facilites should be affored to the renowned Indian religious organisations like Ram Krishna Mission, Bharat Sevashrem Sangha, Pabna Satsangha for the religious rehabilitation of the Hindus of Bangladesh. New religious organisations should also be set up in Bangladesh with adequate financial backing to establish and manage all religious institutions.

x) Adequate representation of the minorities in the relevant bodies at different stages of constitution-making should be guaranted.

FOR REHABILITATION:

The following steps and measures are suggested ;—

1. Distribution of compulsory ration for all the evacuees till they get hold on their feet.
2. Distribution of clothing for all of them.
3. Return of both movable and immovable properties looted or occupied by others.
4. Agricultural grants for purchase of cattle, agricultural implements and instruments, seeds etc.
5. Grants to the businessmen for their rehabilitation in business, keeping in view the quantum of their loss by way of loot and destruction.
6. Grants to educational institutions for reconstruction of buildings, purchase of equipments and furniture etc.

7. Grant of suitable stipends for, at least, 2 years to students towards all educational expenses including tuition fee , purchase of books and instruments etc.
8. Carpenters, potters, fishermen, blackmisths and all other professionals and artisans should be given suitable grants for resettlement in their respective professions and trades.
9. Committees of the bonafide evacuees should be organised at village levels for assisting the Govt. in the distribution of ration and grants for rehabilitation purposes, ensuring there-by that all such rehabilitation benefits go into correct hands.
10. The cancelled Pakistani one-hundred and five-hundred rupee notes in possession of the evacuee should be exchanged in consid ration of those being actually earned by them.
11. Being victims of the atrecities and communal riots, those who have taken refuge in India from Bangladesh in 1970, just before the general election should be rehabilitated in Bangladesh providing them similar facilities of the evacuees of 1971 as they were driven out on the plea of their being supporters of Bengali Nationalism and 'SIX POINT' programme of Awami League.
12. All other refugees in India, who had to migrate from East Bengal prior to 1970 and are willing to return to Bangladesh, should also be allowed to do so with necessary help for their resettlement there and for recovering properties as a result of communal partition of India.

Lastly, we respectfully submit in connection this representation that we shall feel deeply grateful if your gracious self finds it convenient to receive a deputation on behalf of the evacuees of Bangladesh for knowing at first hand the problems, doubts and fears of the returning evacuees and re-assuring them with appropriate safeguards, remedies and solution,

Place : Calcutta - 3rd Jan 1972 Yours faithfully